দশম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথের পত্র।

হঠাৎ দেখা গেল, পঞ্চাশ বছরের ভারতী পঁচিশ বছরের প্রবাসীর সঙ্গে কলহ উপলক্ষ্যে শ্লেষ-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সমব্যবসায়ীরা যখন নিজের মর্য্যাদা ভোলে, তখন এরকম অশোভন ব্যাপার ঘটে থাকে। তাই ভেবেছিলেম এ সম্বন্ধে সম্পাদিকাকে আড়ালে আমার মন্তব্য জানাব। কিন্তু আমার কথাটা তেমন করে চাপা দিলে আত্মীয়তা করা হবে, কর্ত্তব্য করা হবে না।

ভারতীর গৌরবের তালিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে সম্পাদিকা বল্‌ছেন:—

"আর একটি রীতিও ভারতীর সনাতনী। অনেক সম্পাদক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু কেহই অর্থলিপ্সায় ভারতীর সেবা করেন নাই। * * ভারতীর সেবা জীবিকার অবলম্বন করেন নাই।"

এর মধ্যে তিনটি কথা বলবার আছে। প্রথম, ভারতীর যতগুলি সম্পাদক আসরে নেমেছেন, লক্ষ্মীর কোনো না কোনো মহল তাঁদের আশ্রয় ছিল। ক্ষুধিত পরিবারকে অন্ন থেকে বঞ্চিত করে' সরস্বতীর নৈবেদ্য তাঁদের রচনা করতে হয় নি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নিস্পৃহতার বড়াই শুনে লোকে যে ভক্তিবিহ্বল হয়ে উঠ্‌বে, এমন আশা করা যায় না।

দ্বিতীয়, তৎসত্ত্বেও ভারতীর উপস্বত্ব থেকে যদি কিঞ্চিৎ আয় করতে পারতেন, তবে তাঁদের কেউ যে লজ্জিত হতেন—এ কথা আমি

স্বীকার করতে পারিনে। অক্ষমতার পিতলকে গিল্টি করে' সোনার গহনা ব'লে চালানো ও প্রতিবেশীর উপরে টেক্কা দিতে যাওয়া গর্ব্বের কথা, কিন্তু গৌরবের কথা নয়।

যদি প্রশ্ন ওঠে—আমার এ কথার প্রমাণ কি? তাহলে আমি দেখাতে পারি যে, ভারতীর সম্পাদক-পরম্পরা সকলেই গ্রন্থকার। তাঁদের গ্রন্থ তাঁরা লক্ষ্মীর হাটেই বেচে থাকেন। তাঁদের কেউই সরস্বতীর পদ্মবনের ধারে দাঁড়িয়ে বিনা পয়সায় ভাবের হরির লুঠ দিতে চেষ্টা করেন নি। অন্তত আমি নিজের কথা বল্‌তে পারি। বই ছাপিয়ে হয়ত কখনো যথেষ্ট লাভ হয় নি, বা লোক্‌সানও হয়ে থাক্‌বে; কিন্তু সেটা নিস্পৃহতার ফলে নয়, ভাগ্যের নিষ্করুণতারই ফলে। এখনো বল্‌তে পারি আমার বই বিক্রির লাভের অঙ্ক যদি বহুগুণিত হবার লক্ষণ দেখায়, তবে হাত জোড় করে লক্ষ্মীকে টোড়ি রাগিণীতে বল্‌ব না—

"যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়।"

তৃতীয় কথা হচ্চে এই, প্রাণধারণে আমাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। যাঁরা পৈতৃক বা পরোপার্জ্জিত সম্পত্তির অধিকারী নন, বাধ্য হয়ে তাঁদের উপার্জ্জনের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। মানুষের পাকযন্ত্র আছে বলে যদি সেটা লজ্জার বিষয় হয়, তবে সে লজ্জা সৃষ্টিকর্ত্তার। এ স্থলে মানুষকে কেবল এই কথাই ভাবতে হবে যে, উপজীবিকা যাতে অপজীবিকা না হয়। জ্ঞানতঃ সত্যের অপলাপ, অন্যায়ের সমর্থন বা মানুষের কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনের দ্বারা যদি আয়ের পথ প্রশস্ত করবার চেষ্টা কোনো সম্পাদকের মধ্যে দেখা যায়, তাহলেই বল্‌তে পারব কর্ত্তব্যবুদ্ধির চেয়ে বিষয়বুদ্ধিই তাঁর প্রবল।

বারবার দেখেছি প্রবাসী-সম্পাদক সাধারণের অথবা কোনো কোনো ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের অপ্রিয়তা করে নিজের ক্ষতির কারণই ঘটিয়েছেন। সকল সময়ে তাঁর উত্তেজনা আমার ভালো লাগে নি, অনেক সময়ে মনে হয়েছে অক্ষুব্ধ বিচারবুদ্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা হচ্চে না; কিন্তু বরাবর দেখেছি, ঠিক করেই হোক্ ভুল করেই হোক্, সম্পাদক যা সত্য বলে মনে করেছেন, ভয়ে বা লোভে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন নি।

একটা কথা মনে রাখা উচিত। স্পৃহার কেবল একটিমাত্র রূপ নয়। ব্যক্তিগত খ্যাতি বা কীর্ত্তিগত প্রতিপত্তির স্পৃহাও, প্রবলতায় আর অনেক সময়ে আবিলতায়, অর্থস্পৃহার চেয়ে কম নয়। সে ক্ষেত্রেও কর্ত্তব্যের সীমা লঙ্ঘন করলে সেটাকে রিপু বলে ধিক্কার দিতে হবে। সেই সীমার মধ্যেও বাড়াবাড়ি করা চলে, তখন সেটা কখনো কৌতুকের, কখনো বিরক্তির বিষয় হয়।

প্রবাসী-সম্পাদক মাঝে মাঝে কোনো কোনো লেখার পরে ঘোষণাবাক্যে বলে থাকেন যে, সেটা প্রবাসীরই জন্যে বিশেষভাবে লিখিত, সেটা সম্পূর্ণ অনুলিখিত নয়। লেখার এই নেপথ্যবিধানের ইতিহাসটুকু প্রবাসীর প্রতিপত্তি রক্ষার জন্যে করা হয়ে থাকে। লেখাটা ভালো হলে, বা তার অন্য কোনো উচ্চাঙ্গীন উপযোগিতা থাকলে, সেই প্রতিপত্তিই যথার্থ প্রতিপত্তি—তার কোনো বাহ্যস্বরূপের প্রতিপত্তি আমার নিজের কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনেই হয় না। যখন আমরা কোনো ভদ্রসভায় যাই, তখন গায়ে একখানা চাদর আছে, বা সেটা ময়লা নয়, এইটুকুই ভদ্রতারক্ষার পক্ষে দেখবার বিষয়। সেটা মুখে বলবার দরকারও হয় না। কিন্তু লোকের পাশে

বসে তাকে যদি বলি যে, এ চাদর আমি প্রতিবেশীর আলনা থেকে তুলে নিয়ে গায়ে দিয়ে আসিনি, তাহলে সেটা নিরতিশয় বাহুল্য কথা হয় সন্দেহ নেই। প্রবন্ধ সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। এইরূপ ব্যাপারে আমি অনেকসময়ে হেসেছি, সে কথা স্বীকার করি।

কিন্তু কৌতুকের সীমা অতিক্রম করবার হেতু কোথায় ঘটে, তার একটা উদাহরণ দিই।—

শ্রীমান প্রমথ "রায়তের কথা" বলে তাঁর একটি প্রবন্ধ সবুজপত্র থেকে উদ্ধৃত করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেচেন। সেই পুস্তিকা সম্বন্ধে আমার অভিমত তাঁকে সম্বোধন করে পত্র আকারে লিখেছিলেম। সম্পাদকীয় নির্ব্বন্ধবশত সবুজপত্রে না দিয়ে সেটা ভারতীতে পাঠানো হয়। আজ সেটা পড়তে গিয়ে দেখলেম, ছাপার ভুলে আপাদমস্তক শরশয্যাগত সেই প্রবন্ধে প্রমথর নাম আছে বটে কিন্তু কোথাও সম্বন্ধকারকের কোনো সম্বন্ধই নেই।

এটা হল প্রতিপত্তির লোভ। অর্থাৎ এই অতি অকিঞ্চিৎকর গর্ব্ব যে, ওটা প্রমথকে লেখা পত্র নয়, কিন্তু ভারতীর জন্যেই বিশেষ করে লেখা প্রবন্ধ। এটা হল সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া—একদিক থেকে অন্য দিকে প্রবন্ধের মুখ ফিরিয়ে দেওয়া। লেখার উপলক্ষ্য পরিবর্ত্তন করা কেবল নয়, নিজের হাতে তার কারক পরিবর্ত্তন করার ন্যায্য অধিকার সম্পাদকের আছে বলে আমি মনে করিনে। এতে কেবল আমি নই, আমার প্রবন্ধও পীড়িত হয়েছে। তাই এই উপলক্ষ্যে সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, সরবে বা নীরবে পত্রিকার প্রতিপত্তি ঘোষণাকে তাঁরা যেন অগৌরবের বিষয় বলেই মনে করেন। এইরকম বাহ্য ঘোষণা থেকেই ঘোষণার

প্রতিযোগিতা প্রবল হয়ে ওঠে;—নিজের দিকে সেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশের উত্তেজনা সাহিত্যক্ষেত্রে কখনোই সুদৃশ্য নয়।

সব শেষে আমার নিজের একটা কৈফিয়ৎ আছে। ভারতী-সম্পাদিকার টিপ্পনীর মধ্যে এক জায়গায় লিখ্‌ছেনঃ—"(প্রবাসী-সম্পাদক) বাল্মীকিপ্রতিভার কবিকেও সরস্বতীর বিনাপণের মহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্যশালায় বন্দী করিয়াছেন।"

পূর্ব্বেই বলেছি লক্ষ্মী আমার লেখনীর উপর স্বর্ণবৃষ্টি করলে দুঃখিত হব, এত বড় উদাসীন কোনোকালেই আমি নই। এই ঔদাসীন্য যদিবা লেশমাত্রও আমার থাক্‌ত, স্বয়ং সরস্বতীই আজ তাকে দেশছাড়া করেছেন। তিনিই স্বয়ং তাঁর কবির হাতে ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে লক্ষ্মীর দ্বারে অবমানিত করতে ত্রুটি করেন নি। অন্য অনেক হতভাগ্য ভিক্ষুর মত লক্ষ্মীমন্তের মুষ্টিআঘাত পাইনে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মুষ্টিভিক্ষাও জোটে না। পাই প্রচুর পরিমাণে হাত-তালি; কারণ দানের হাতে তেমন তালি বাজে না, যেমন বাজে রিক্ত হাতে। এই ব্যাপারে যে পরিমাণে শরীরটাকে জীর্ণ করে ফেলেছি, তার সিকি পরিমাণেও ঝুলিটাকে পূর্ণ করতে পারিনি। কত শত বুভুক্ষিত দিনে পরিশ্রান্ত চিত্তে মনে মনে মালব্যজীর পুণ্য নাম জপ করেচি। কিন্তু অভাগ্যের অদৃষ্টে সেই নামমন্ত্রগুণও ফলে নি। এমন অবস্থায় ভারতী-সম্পাদিকার সঙ্গে প্রবাসী-সম্পাদকের প্রভেদ এই যে, পরম দুঃখের দিনে তিনি আমার প্রবন্ধকে অর্থমূল্য দিয়েছেন—এমন সময়ে দিয়েছেন, যখন দাবী করলে বিনামূল্যেই পেতেন।

সে কথা আজ মনে আছে। তখন আমার বিদ্যানিকেতনের ক্ষুধা

মেটাবার জন্যে হিতবাদীর তৎকালীন ধনশালী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমার চার পাঁচটা বইয়ের স্বত্ব বন্ধক রেখে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলেম। প্রায় পনেরো বৎসরেও তা শোধ হয় নি। আমার অন্য বইয়ের আয়ও তখন বাধাগ্রস্ত ছিল। অর্থাৎ সেদিন দান পাওয়ার পথে দয়া ছিল না, উপার্জ্জনের পথে বুদ্ধির অভাব, সম্পত্তির উপর শনির দৃষ্টি। অথচ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে সরস্বতীর দাবী উত্তরোত্তর বেড়েই চলেচে।

এমন সময় প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার। তার পরে এই ইতিহাসের ধারা আর অধিক বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই।

প্রবাসী-সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পেরে থাকেন, তবে তার কারণ এ নয় যে, তিনি ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কারণ এই যে, ন্যায্য উপায়ে পত্রিকা থেকে লাভ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে; এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি।

কিন্তু অর্থই ত একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সর্ব্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্ব-ভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্ত্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান, প্রীতিদান অনেক

সময়ে বেশি মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম; ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয় দান করেছেন। সেই আমার স্বল্পসংখ্যক কর্ম্মসুহৃদের মধ্যে প্রবাসী-সম্পাদক অন্যতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

Hotel Bristol
Wien.
২০শে জুলাই, ১৯২৬।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা।

——❋❋❋——

(১)

কোন পুস্তকের ভূমিকা লেখার অর্থ তার দোষগুণ বিচার করা নয়, তার পরিচয় দেওয়া। এ সত্য কিন্তু অনেকে ভুলে যান। বিলেতী বইয়েও দেখতে পাই, ভূমিকালেখক যে সমালোচক নন—এ ধারণা সকলের নেই। ফলে অনেক গ্রন্থের ভূমিকা তার সমালোচনা-চ্ছলে বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই নয়। এর কারণ বোধহয়, ও-জাতীয় ভূমিকা গ্রন্থলেখকের নয়, গ্রন্থ প্রকাশকের অনুরোধেই লেখা হয়।

শ্রীমান দিলীপকুমারের ভ্রমণবৃত্তান্তের ভূমিকা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই লিখতে বসেছি, সুতরাং এ ভূমিকা উক্ত গ্রন্থের প্রশংসাপত্র হবে না, হবে তার পরিচয়পত্র মাত্র।

শ্রীমান দিলীপকুমার গুণী হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিচিত, এবং লেখক হিসেবেও বাঙলায় সুপরিচিত। অতএব কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁকে আবার পাঠকসমাজের নিকট পরিচিত করে দেবার সার্থকতা কি? সে প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি লেখককে পরিচিত করে দিতে চাই নে, আমি পরিচয় দিতে চাই সুধু তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর।

"ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা" বাঙলাভাষায় যথার্থ একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইতিপূর্ব্বে এ ধরণের বই কেউ কখনো লেখেন নি।

প্রথমতঃ আমাদের সাহিত্যে ভ্রমণবৃত্তান্তই একান্ত দুর্লভ। প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে শত শত বাঙ্গালী বিলাতে প্রবাসী হয়েছেন, ও প্রবাসান্তে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন বিলেত দেশটা মাটির। কথাটা খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু সেই মাটির উপর সে দেশে যা আছে, তা এ দেশের মাটির উপর যা আছে, তার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন কি সে দেশের সূর্য্যের আলোও এ দেশের সূর্য্যের আলোর সবর্ণ নয়। সে দেশের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে পূর্ব্বপরিচিত নয়, সুতরাং এ সবের সঙ্গে নব পরিচয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম সজাগ হয়ে ওঠবার কথা। কিন্তু শতকরা নিরনব্বই জন বিলেত-ফেরত যে এ বিষয়ে মূক, তার কারণ তাঁরা পৃথিবী পর্য্যটন করেছেন চোখ কান বুজে।

(২)

শ্রীমান দিলীপকুমার বলেছেন—"প্রায় সকলেই ভ্রমণ কত্তে বাহির হন কোনও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।" অবশ্য তাই। কিন্তু কে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে যান, তারই উপর নির্ভর করে, তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত অপরকে শোনাবার মত কি না, আর অপরে তা ধৈর্য্য ধরে শুনতে পারে কি না।

আমাদের দেশে যাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন, তাঁরা প্রায় সকলেই বিদেশে যান হয় অর্থ উপার্জ্জন করতে, নাহয় অর্থকরী বিদ্যাঅর্জ্জন করতে। এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে যিনি বিদেশে যান, তিনি প্রায়ই একলক্ষ্যে কোনও একটি বিশেষ স্থানে উত্তীর্ণ হন। অর্থাৎ তিনি ডাকের পার্সেলের মত বাঁধা পথ ধরে এক জায়গা থেকে অন্য

জায়গায় স্থানান্তরিত হন, এবং ঠিক সেই বাঁধা পথ দিয়ে একই উপায়ে বিদেশ থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন। এ হচ্ছে একরকম এক ঘর থেকে অপর ঘরে যাবার মত। তফাতের মধ্যে এই যে, এ ক্ষেত্রে ঘর দুটির মধ্যে অনেকখানি মাটির অথবা জলের ব্যবধান থাকে এবং এই ব্যবধানটাও বহুলোকের পক্ষে দেশের ব্যবধান নয়—কালের ব্যবধান মাত্র। কলকাতা হতে লণ্ডন যেতে কতদিন লাগল, তার হিসেব থেকেই আমরা কতটা পথ উত্তীর্ণ হলুম তার হিসেব পাই। কাল পদার্থটি মনোগ্রাহ্য, আর দেশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কাজেই এ জাতীয় যাত্রার সঙ্গে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। এ শ্রেণীর ভ্রমণকারীরা নিজের চোখে কিছু দেখে না বলে অন্যকে কিছু দেখাতে পারে না, নিজের কানে কিছু শোনে না বলে অন্যকে কিছু শোনাতে পারে না। ত্রেতাযুগে ভগবান পবননন্দন এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হয়েছিলেন, কলিযুগে আমরাও এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করে ইংলণ্ডদ্বীপে উপস্থিত হই। ফলে ভগবান পবননন্দন সমুদ্রযাত্রার কোনও বর্ণনা লিখতে পারেন নি, আমরাও পারি নে।

(৩)

শ্রীমান দিলীপকুমার যে উদ্দেশ্য নিয়ে সারা ভারতবর্ষ পর্য্যটন করেছেন, সেটি হচ্ছে অর্থ উপার্জ্জন নয়, একটি বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন। এ-জাতীয় জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়াস ইতিপূর্ব্বে কেউ কখন পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। তাঁর নিজের কথায়—"সেটি হচ্ছে ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের গান শোনা—অবশ্য গানের মধ্যে বাজনাও বুঝে নিতে হবে।" এক হিসেবে তাঁর এ ভ্রমণ হচ্ছে একরকম

তীর্থভ্রমণ। কারণ সঙ্গীত তাঁর কাছে ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। সঙ্গীতের সাধনা যে একরকম ধর্ম্মের সাধনা, এ বিশ্বাস এ দেশে সনাতন। এমন কি, যদি কেউ বলেন যে একাগ্রভাবে সঙ্গীতের সাধনা করা মোক্ষলাভের অন্যতম উপায়, তাহলে সে কথায় কোনও সেকেলে হিন্দু আপত্তি করবে না। ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে অবশ্য সঙ্গীতের প্রতি এতাদৃশ শ্রদ্ধা নেই।

শ্রীমান দিলীপকুমার আমাদের আর পাঁচজনের মত, ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙালী। সুতরাং তাঁর পক্ষে এরূপ সঙ্গীতভক্তি বাস্তবিকই অসাধারণ। সঙ্গীত সম্বন্ধে ইংরাজীপড়া লোক, শিক্ষার গুণে বা দোষে, অধিকাংশই উদাসীন। আর যে অল্পসংখ্যক লোকের এ বিষয়ে প্রীতি আছে, তাদেরও সে প্রীতি ভক্তি অর্থাৎ পরাপ্রীতিতে গিয়ে পৌঁছয় নি।

শাস্ত্রে বলে সাধনের উপায় তিনটি—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রবণ যে সাধনের একটি অঙ্গ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্ভবত এক পলিটিকাল সাধন সম্বন্ধে এ শাস্ত্রমত খাটে না। ও ক্ষেত্রে সাধনার একাগ্র উপায় হচ্ছে বাচন—শ্রবণ নয়। সে যাই হোক, সঙ্গীতের সাধনা করতে হলে, সে বস্তু যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর করতে হয়, সে বিষয়ে আশা করি জ্ঞানী ও গুণীসমাজে মতভেদ নেই। সুতরাং শ্রীমান দিলীপ যে "গান শুনতে" বেরিয়েছিলেন, তার মূলে আছে বিদ্যা অর্জ্জন করবার অদম্য প্রবৃত্তি। ইংরাজীতে যাকে বলে নিরর্থক কৌতূহল (idle curiosity), সে সৌখীন মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়ে তিনি ভ্রাম্যমান হন নি।

(৪)

শ্রীমান দিলীপকে এ উদ্দেশ্যে যে কত দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, তা যিনি "ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা" আদ্যোপান্ত পাঠ করবেন, তিনিই তার পরিচয় পাবেন। শ্রীমান দিলীপ সত্যসত্যই ভ্রাম্যমান হয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণের পথ বৃত্ত, সরল রেখা নয়। তিনি কম্পাসের কাঁটার সাহায্যে তাঁর ভ্রমণের দিকনির্ণয় করেন নি, তাঁর গতিও নিয়ন্ত্রিত করেন নি। আজ বেরিলি, কাল সাগর, পরশু বম্বে, তার পরদিন মহিশূর; পাঠকের নেত্রপথে বায়স্কোপের ছবির মত ভারতবর্ষের নানা নগরী এই উদয় হচ্ছে, এই অন্তর্হিত হচ্ছে। অপর কোনও পর্য্যটক এ বইকে guide-book হিসেবে কাজে লাগাতে পারবেন না। লেখক নিজ মুখেই বলেছেন যে,—"আমার ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে একদিকে যেমন কোনও ধারাবাহিকতা বা পর্য্যায় খুঁজে পাবার সম্ভাবনা নেই, তেমনি অপরদিকে ভ্রমণসংক্রান্ত নানান অত্যাবশ্যক detail-এর আশাও যেন কেউ রাখেন না"। ফলে তিনি ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির তাস আমাদের চোখের সুমুখে সাজিয়ে ধরে দেন নি।

শ্রীমান দিলীপ দেশ দেখতে যান নি, গিয়েছিলেন শুধু গান শুনতে। তাহলেও তিনি ধ্যানস্তিমিত-লোচনে ঘুরে বেড়ান নি। এই ভেস্তানো তাসের মধ্যেও অনেক ছবির সাক্ষাত পাওয়া যায়। এ সব ছবি প্রায়ই স্ত্রীপুরুষের—অর্থাৎ গায়ক-গায়িকার। ভারতবর্ষের গায়ক-গায়িকার দল ইংরাজ কবিবর্ণিত Cuckooর মত অশরীরী ধ্বনিমাত্র নয়। এঁদের সকলেরই দেহ আছে, এবং কারও বা সে দেহ বিপুল। জনৈক বাইজির দেহে নাকি একখানি গরুর

গাড়ী বোঝাই করবার মত মেদ মাংস ও বসা বিরাজ করে। আশা করি শ্রীমতী চন্দ্রপ্রভা নর্ত্তকী নন। এ গ্রন্থে চিত্রের অভাব নেই, portrait-এর নয়, landscape-এরও নয়; তবে তার সংখ্যা বেশি নয়, আর সে সব চিত্র তেমন জীবন্তও নয়। মনে রাখবেন শ্রীমান দিলীপ-কুমারের সাধনার ধন ছবি নয়—গান।

(৫)

এই অনন্যসাধারণ দেশহিণ্ডনের ফলে শ্রীমান দিলীপকুমার কি সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? তিনি যা আবিষ্কার করেছেন তা অতি স্পষ্ট করেই বলেছেন। তাঁর কথা এই—"আমি প্রায় সারা ভারত খুঁজে এত কম ভাল গায়কের গান শুনেছি যে, ভাবলে মনটা বিস্ময়ে ও আক্ষেপে অভিভূত না হয়ে পড়েই পারে না।"

এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন। কেননা অনেকের বিশ্বাস যে, সঙ্গীতবিদ্যা ভারতবর্ষের একটা প্রধান গৌরবের বস্তু, এবং সে মহাবস্তু আজও কালাওয়াতদের কণ্ঠস্থ আছে। সুতরাং শ্রীমান দিলীপের মুখে এ অপ্রিয় সত্য শুনে, অনেকের জাতীয় অহঙ্কারে আঘাত লাগবে। ব্যাপারটা যে আক্ষেপের বিষয়, সে কথা শ্রীমান দিলীপও স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন, এবং এ সত্যের সাক্ষাৎ পেয়ে তিনিও বিস্মিত হয়েছেন; কারণ তিনিও এই আশায় ভর করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে এ মহাবিদ্যার জীবন্ত মূর্ত্তির দর্শনলাভ করবেন।

যে-সকল কারণে ওস্তাদজিদের গান তাঁর মনস্তুষ্টি সাধন করতে পারে নি, সে সব কারণে শতকরা নিরনব্বই জন বাঙালীর কাছে সে সঙ্গীত একেবারে অসহ্য হত। বিকৃত মুখভঙ্গী, কর্কশকণ্ঠ, বিকট

চীৎকার, সুরের ডন বৈঠক, তালের দৌড়ঝাঁপ, আমাদের অনেকেরই পক্ষে যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি শ্রুতিকটু। বাঙলাভাষার "কালোয়াতী" কথাটা কি হীনার্থে ব্যবহৃত হয় না? কালোয়াতীর যে নমুনা শুনে সাধারণ বাঙালীরা উচ্চাঙ্গের হিন্দু সঙ্গীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন, শ্রীমান দিলীপ নানা দেশে গিয়ে সেই বস্তুর বহু লম্বাচৌড়া নমুনার পরিচয় পেয়েছেন। এর ফলে তিনি যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন যে, অধিকাংশ ওস্তাদের কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শুধু কসরৎ মাত্র, তাতে আর যারই হোক আমাদের অবাক হবার কোনও কারণ নেই।

(৬)

ভারতবর্ষের অধিকাংশ নামজাদা গায়কের গান শ্রীমান দিলীপের ভাল লাগে নি, এবং কেন যে ভাল লাগেনি সে কথাও তিনি খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন। তাঁর বক্তব্য এই:—"সমগ্র ভারত ঘুরে আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে, আমাদের সঙ্গীতের অবস্থা আজ মুমূর্ষু—অর্থাৎ সঙ্গীতের মধ্যে সত্যকার শিল্পের অবস্থা। অশিক্ষিত পেশাদারের হাতে সঙ্গীতের সহস্রদল যে প্রস্ফুটিত হতে পারে না, এ সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই।" এ কথা শুনে অনেকে ক্ষুব্ধ, এমন কি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমাদের সঙ্গীতের অবস্থা যে মুমূর্ষু, এ সংবাদে আমরা দুঃখিত হতে পারি, কিন্তু সংবাদদাতার উপর ক্রুদ্ধ হবার কোনও কারণ নেই। তিনি যে বলেছেন যে "এ সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই"—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আর যিনি এ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিয়ে দেন, তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়াই

কর্ত্তব্য। তবে দিলীপকুমারের এই মত সত্য কি না, তাই হচ্ছে বিচার্য্য।

দিলীপকুমার দেদার ওস্তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, কিন্তু দুটি চারটি ছাড়া আর্টিষ্টের সাক্ষাৎ পান নি। ওস্তাদে ও আর্টিষ্টে প্রভেদ কোথায়? ওস্তাদ হচ্ছেন তিনি, যিনি সঙ্গীতের একমাত্র technique-এর চর্চ্চা করেন, কিন্তু তার রসের সন্ধান জানেন না। এ কথা শুনলেই তাঁদের অহমিকায় আঘাত লাগে, যাঁরা মনে করেন যে তাঁরা ওস্তাদ। Technique হচ্ছে সঙ্গীতের দেহ—তার প্রাণ নয়। প্রাণহীন দেহ যে থাক্‌তে পারে, সে ত প্রত্যক্ষ সত্য। অপরপক্ষে দেহই যে প্রাণ, এ ধারণাও বহু লোকের আছে। আর্টের জগতেও দেহাত্মবাদীর সংখ্যা কম নয়। ব্যাকরণের বন্ধন ব্যতীত ভাষা সাকার হয় না। কিন্তু ব্যাকরণ ও ভাষা যে এক জিনিষ নয়, এ কথা আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে যাদের বলে ব্যাকরণাভ্যাসাৎ জড়বুদ্ধি, তাদের বোঝানো অসম্ভব। শাস্ত্রে বলে রস জিনিষটে হচ্ছে সহৃদয় হৃদয়-বেদ্য। এই হচ্ছে সত্য কথা। অবশ্য সংস্কৃত হৃদয়ের সঙ্গে বাঙ্গলা হৃদয়ের নাড়ীর যোগ নেই। আমরা ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালীরা হৃদয় বলতে বুঝি sentiment; কিন্তু sentimentalism আর্টের নিকট অস্পৃশ্য। এ জ্ঞান শ্রীমান দিলীপের আছে। তিনি বলেছেন যে—"গানের মধ্যে intellectual আবেদন না থাক্‌লে সে গান উচ্চ সঙ্গীত হয় না।" এই সূত্র ধরেই সঙ্গীত নামক আর্টের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করবার অধিকার আমরা পাই।

(৭)

শ্রীমান দিলীপের এ ভ্রমণ কিন্তু সম্পূর্ণ বৃথা হয় নি। তিনি

ভারতবর্ষে এমন জনকতক গুণীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যারা যথার্থ আর্টিস্ট। এ বিষয়ে তাঁর কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন যে :—

"শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কি তা বুঝতে হলে, আলাউদ্দিন, আবদুল করিম, চন্দন চৌবে, ফৈয়াস খাঁ, মন্মোহনলাল, ফিদা হোসেন, শেষণ, উজীর খাঁ, জয়পুরের গহর বাই, মম্মন খাঁ প্রমুখ জনকয়েক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর স্থষ্টিকেই কষ্টিপাথর হিসেবে ধরে নিলে বোঝা সহজ যে, কোন্‌টা সত্য আর্ট আর কোন্‌টা লম্ফঝম্প।

এ কথা শুনে আমি আস্বস্ত হয়েছি। কারণ আমার বিশ্বাস যে, কোনও দেশে কোনও যুগে যথার্থ আর্টিস্টের সংখ্যা অসংখ্য ছিলও না, এখনও নেই। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যদি এতগুলি যথার্থ আর্টিষ্ট বিদ্যমান থাকেন, তাহলে স্বীকার করতে হবে এ দেশে আজও সঙ্গীত-কলার মৃত্যু হয় নি। অপর একটি আর্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই আমার কথার সার্থকতা সবাই উপলব্ধি করবেন। বাঙলায় আর যে জিনিষেরই অভাব থাক্—লেখকের অভাব নেই। কিন্তু কাব্য নামক আর্টের শুধু একজন আর্টিষ্ট আছেন, এবং তাঁর নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর ওই এক কবিই সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

(৮)

শ্রীমান দিলীপ যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন যন্ত্র-সঙ্গীতের সাধক। কণ্ঠের অনেক দোষ যন্ত্রে বর্ত্তায় না। যন্ত্রের ধ্বনী কর্কশ হয় না, যন্ত্রের মুদ্রাদোষ নেই। তারপর সুরকে ব্যস্ত-সমস্ত করবার, তার কানে ইচ্ছামত মোচড় দেবার, সংক্ষেপে রাগবিস্তার

করবার যতটা অবসর যন্ত্রে আছে, কণ্ঠে ততটা নেই। যন্ত্রের হুবহু অনুকরণ করতে গেলেই, কণ্ঠ স্বধর্ম্ম হারিয়ে বসে, এবং সেই সঙ্গে তার মাত্রা-জ্ঞানও লুপ্ত হয়। যন্ত্র অবশ্য কণ্ঠকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু কণ্ঠের পক্ষে যন্ত্রকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করা অসাধ্য। ইউরোপে কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ বিচ্ছেদের প্রসাদে উভয়েই মুক্তি লাভ করেছে। প্রথমটি এখন Melody-র অধিকারে, দ্বিতীয়টি Harmony-র। সুতরাং সে দেশের গায়কদের স্বাধিকারপ্রমত্ততার পরিচয় দেবার সুযোগ নেই। এ দুটি যে সঙ্গীত হিসেবে বিভিন্ন আর্ট, আমাদের দেশের লোকের আজও সে ধারণা নেই; এবং আমার বিশ্বাস যে, আমাদের কণ্ঠ-সঙ্গীতের অনেক বিকারের মূলকারণ এই।

শ্রীমান দিলীপের বই পড়ে আর একটি কথা আমার মনে উদয় হয়েছে। তিনি যে-সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় বেশির ভাগ গুণীই Native States অর্থাৎ সেকেলে ভারত-বর্ষের অধিবাসী। সঙ্গীত-কলা মুমূর্ষু-দশা প্রাপ্ত হয়েছে—শুধু ইংরাজ-শাসিত ও ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবর্ষে। ভক্ত শ্রোতার অভাবে সঙ্গীত প্রাণধারণ করতে পারে না—যেমন সহৃদয় পাঠকের অভাবে কাব্য থাকতে পারে না। বাণী কিছুকাল ধরে অরণ্যে রোদন করে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ে।

ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সকল প্রকার আর্টের প্রতি অল্পবিস্তর অবজ্ঞা আছে। যাকে আমরা নবসভ্য মনোভাব বলি, তা ষোলো আনা Materialistic—অপর পক্ষে আর্ট জিনিষটি Spirit-এর বস্তু। এ দেশের মুমূর্ষু-সঙ্গীতকলাকে যদি আবার সঞ্জীবিত করতে
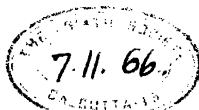
হয়, তাহলে তার উপায় Reformation নয়—Renaissance; technique-এর বাহ্যসংস্কার নয়—আমাদের অন্তরাত্মার নব উদ্বোধন। শ্রীমান দিলীপের গ্রন্থ আশা করি বহু পাঠকের এ বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দেবে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

এইবার অতি সংক্ষেপে বাঙালী জা'তের আর সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে গোটাকতক কথা ব'লে আমার প্রবন্ধ শেষ ক'র্‌বো। নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চ'ল্‌ছে। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ্যা যে যুগের কথা নিয়ে' আলোচনা ক'রছে, সেটা হ'চ্ছে প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা। বাঙালী জা'তের সৃষ্টিতে এই কয়টী বিভিন্ন মূল জা'তের উপাদান নাকি এসেছে:—[১] লম্বা আর উঁচু-মাথা-ওয়ালা একটী জা'ত, North Indian 'Aryan' Longheads—এই জা'তটীই হ'চ্ছে আর্য্য-ভাষী জাতি এই রকমটী প্রায় সমস্ত নৃতত্ত্ববিদের মত—পাঞ্জাবে, রাজপুতানায়, উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এই শ্রেণীর শারীরিক সংস্থানটী খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়; বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এইরূপ লম্বা-মাথা-ওয়ালা লোক বেশী মেলে না, অতি অল্প-স্বল্প যা কিছু পাওয়া যায়। [২] লম্বা আর নীচু-মাথা-ওয়ালা একটী জাতি—South Indian or Dravido-Munda Longheads: আধুনিক দক্ষিণ-ভারতের (তামিল দেশের) দ্রাবিড়-ভাষীরা, আর কোল জাতীয় লোকেরা এই শ্রেণীতে পড়ে। বাঙলা দেশের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এই জাতীয় মস্তকাকৃতি বিশুদ্ধভাবে কিছু কিছু পাওয়া যায়। [৩] গোল-মাথা-ওয়ালা একটী

জাতি—Alpine Shortheads—এদের সরল নাক, মুখে দাড়ী গোঁফের প্রাচুর্য্য: সিন্ধুদেশে, গুজরাটে, মধ্য ভারতে, কর্ণাটকে, অন্ধ্রেও এদের বাস ছিল, এইরূপ মস্তকাকৃতির লোক ওই সব দেশে এখনও বেশী ক'রে দেখা যায়; বাঙলা দেশে এইরূপ লোকেরই প্রাচুর্য্য বেশী, বিশেষ ক'রে ভদ্রজাতির মধ্যে;—সাধারণ বাঙালী পাঞ্জাবীদের মতন লম্বা-মাথা-ওয়ালা নয়, গোল-মাথা-ওয়ালা; এই গোল-মাথা-ওয়ালা জাতি আদিম অবস্থায়, বৈদিক যুগের পূর্ব্বে, ভাষায় আর সভ্যতায় কি ছিল তা এখনও জানা যায় নি,—আর এরা কবে কোথা থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল তাও জানা যায় নি—তবে এদের অনুরূপ গোল-মাথা-ওয়ালা জাতি ভারতের বাইরে বহুদেশে পাওয়া যায়। [৪] গোল-মাথা-ওয়ালা আর একটী জাতি—Mongolian Short-heads—এরা মোঙ্গোল জাতীয় লোক, নাক চেপটা, গালের হাড় উঁচু, গোঁফদাড়ী কম; উত্তর আর পূর্ব্ব-বঙ্গের বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে এই উপাদান বেশী ক'রে পাওয়া যায়। এই চারপ্রকার জাতের মিশ্রণে আধুনিক বাঙালী। এই চার জা'ত ছাড়া, দক্ষিণ ভারতের আর এশিয়ার অন্যান্য ভূভাগের মতন বাঙলা-দেশে Negroid নিগ্রোবটু বা Negrillo নিগ্রিল পর্য্যায়ের জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ মেলে না; বাঙালী জাতিতে এই উপাদান খুব সম্ভব নেই। রিজ্‌লী প্রমুখ দুই একজন নৃতত্ত্ববিৎ মনে ক'রতেন যে প্রধানতো [২] আর [৪]-এর সংমিশ্রণ হওয়ায় গোল-মাথা-ওয়ালা বাঙালী জাতির উৎপত্তি। কিন্তু এই মত এখন সকলে মানেন না। যাই হোক্, উপরে নির্দ্দিষ্ট এই চার মৌলিক জাতির সংযোগে বা সংমিশ্রণে আধুনিক বাঙলা-ভাষী জন-সমষ্টির উদ্ভব—এটা হ'চ্ছে

মোটমুটীভাবে নৃতত্ত্ববিদ্যার আবিষ্কার। এতে ভাষা বা সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা হ'ল না—খালি মানুষের দেহের সমাবেশ নিয়ে তার মৌলিক জা'ত স্থির কর্‌বার প্রয়াসের উপর এই আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত। [১] শ্রেণীর লোকেরাই যে বৈদিক আর্য্যভাষী, উত্তর ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান, যুক্ত-প্রদেশের আধুনিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতিদের পূর্ব্বপুরুষ, এটা এখন এক রকম সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'য়েছে। কিন্তু বাঙালীর মধ্যে, এমন কি উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যেও, এই শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাকৃত অনেক কম—এটা একটা প্রণিধানযোগ্য বিষয়। [২] শ্রেণীর লোকেরা যে তামিল আর কোলভাষী জাতিদের পূর্ব্বপুরুষ, এটাও মানা হয়। বাঙলা দেশে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে এইরূপ আকৃতি পাওয়া যায়, একথা আগেই ব'লেছি। [৪] শ্রেণীর লোকেরা, বাঙলা-ভাষী হ'য়ে বাঙালী জাতির অঙ্গীভূত হবার পূর্ব্বে, অন্ততো বেশীর ভাগ যে ভোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষা ব'লৃত সে বিষয়ে সন্দেহ কর্‌বার বিশেষ কিছু নেই। খালি গোল হ'চ্ছে [৩] শ্রেণীর Alpine Shortheads-দের নিয়ে। এদের ভাষা কি ছিল? দ্রাবিড়, না কোল, না আর্য্য, না ভোট-চীনা—না অধুনা-লুপ্ত আর কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা? ভারতে অধুনা বিদ্যমান এই চারটী ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে খুব সম্ভব কোল ভাষা সব চেয়ে আগেকার কাল থেকে ভারতবর্ষে বলা হ'ত, অনুমান হয়; দ্রাবিড় ভাষা তার পরে আসে, আর তার পরে আর্য্য আর ভোট-চীন। এই চারটী গোষ্ঠী ব্যতিরেকে পঞ্চম কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ কিছু এখনও পাওয়া যায় নি। হয়তো পরে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু [৩] শ্রেণীর Alpine Shortheads-দের ভাষা সম্বন্ধে এখন

কি অনুমান করা যেতে পারে? শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁর Indo-Aryan Race নামক অতি মৌলিক তথ্যপূর্ণ নৃতত্ত্ব-বিদ্যা বিষয়ক বইয়ে অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন যে, আমাদের [৩] শ্রেণীর এই Alpine Shortheads-রা, [১] শ্রেণীর লোকেদের মত আর্য্যভাষীই ছিল; আর তাঁর এই মত বিদেশেরও নৃতত্ত্ববিৎ কেউ কেউ গ্রহণও ক'রেছেন। কিন্তু এই মত সকলের মনঃপূত হয় না। আমার মনে হয়—আর এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কারো কারো মতও আমার অনুকূল—যে এই [৩] শ্রেণীর লোকেরা নবাগত আর্য্য বা মোঙ্গোলদের ভাষা ব'লত না—সম্ভবতো তারা দ্রাবিড় বা কোল ব'লত, কিংবা তারা অধুনা-লুপ্ত অন্য কোনও অনার্য্য ভাষা ব'লত। গঙ্গা ব'য়ে আর্য্যভাষা আর গাঙ্গেয় সভ্যতা ঐতিহাসিক যুগে, অর্থাৎ যে যুগের খবর মানুষের লেখা বইয়ে আমরা পাই সেই যুগে ঘ'টে-ছিল;—আর্য্যভাষা উত্তর ভারত থেকে আগত বিশুদ্ধ বা মিশ্র [১] শ্রেণীর ঔপনিবেশিকের মুখে আসবার পূর্ব্বে বাঙলা দেশে, [২], [৩] আর [৪] শ্রেণীর যে অধিবাসীরা বাস ক'রত, তারা যে আর্য্য-ভাষী ছিল না, এ কথা ব'ল্লে অযৌক্তিক কথা বলা হয় না। বাঙলার অধিবাসীদের মূল উৎপত্তি যে ভিন্ন-ভিন্ন জা'ত থেকেই হোক্, যতটুকু খবর আমাদের জানা গিয়েছে তা থেকে তারা (আর্য্যভাষার আগমনের পূর্ব্বে) অনার্য্যভাষী ছিল ব'লেই অনুমান হয়। যে সব আর্য্যভাষী উত্তর ভারত আর বিহার থেকে বাঙলায় আসে তারা সকলেই বিশুদ্ধ [১] শ্রেণীর লোক ছিল না—কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ বা ছত্রী বা পাঞ্জাবীদের মতন তারা সকলেই লম্বা-মাথা-ওয়ালা লোক ছিল না, একথাও ব'ল্তে হয়। সে যাই হোক্—বাঙলা দেশে আর্য্যভাষার আগমনের

পূর্ব্বে কোল আর দ্রাবিড় আর উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে ভোট-চীন এই তিন ভাষারই অস্তিত্বের প্রমাণ পাই,—গোল-মাথা Alpine Shorthead-দের মধ্যে অন্য কোনও ভাষা ছিল কিনা জান্‌বার পথ নেই। এটা অসম্ভব নয় যে তারা [১] শ্রেণীর আর্য্যদের আস্‌বার আগে, [২] শ্রেণীর ভাষা কোল আর দ্রাবিড় গ্রহণ ক'রেছিল; আর বাঙলা দেশের প্রচলিত ভাষাগুলির সমাবেশ, আর কোল, দ্রাবিড়, ভোট-চীন ছাড়া অন্য ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণের অভাবে, [২] শ্রেণীর লোকেরা আর্য্য আগমনের কালে যে ভাষায় দ্রাবিড় আর কোলই ছিল এই অনুমান মেনে নিতে প্রবৃত্তি হয়—এর বিরুদ্ধে অন্য কোনও যুক্তি মনে লাগে না। সমস্ত উত্তর ভারতময়—বাঙলা দেশকেও ধ'রে,—দ্রাবিড় আর কোলভাষী লোকদের অবস্থানের পক্ষে প্রমাণ আর যুক্তি বিস্তর আছে, কিন্তু কোল-দ্রাবিড়ের বাইরে, আর ভোট-চীনা ছাড়া, অন্য কোনও অনার্য্য ভাষার বিদ্যমানতা সম্বন্ধে প্রমাণের আর যুক্তির একান্ত অভাব।

এখন এ বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্য, ভাষা-তত্ত্ব আর ইতিহাস আমাদের কতটা সাহায্য করে দেখা যাক্।

আমাদের প্রাচীনতম বই বেদ থেকে আর্য্য আর অনার্য্য এই দুই বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকের কথা জান্‌তে পারি। আধুনিক ভারতেও এই পার্থক্যটুকু প্রচ্ছন্ন বা প্রকট অবস্থায় এখনও বিদ্যমান আছে—দৈহিক গঠনে, বর্ণে, মানসিক প্রবণতাতে, রীতি-নীতিতে, আর ক্বচিৎ ভাষায়; বহু শতাব্দী ধ'রে এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা আর ভাবের আদানপ্রদানের ফলে মূল পার্থক্যটুকু অনেকটা চ'লে গিয়ে দুটী প্রকৃতি মিশে নোতুন একটী প্রকৃতির সৃষ্টি হ'য়েছে, তা'তে দুই মূল উপাদানের পার্থক্য সহজে ধ'রতে পারা যায়

না। আর্য্য আর অনার্য্য হ'চ্ছে টানা আর প'ড়েনের সূতো, এই দুইয়ের যোগে তৈরী হ'য়েছে আমাদের হিন্দু জাতি ধর্ম্ম আর সমাজের ধূপছায়া বস্ত্র। আর্য্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন, এ কথা যাঁরা ধর্ম্মের সঙ্গে ইতিহাসকে মিশিয়ে' ফেলেন তাঁরা ছাড়া আর সকলেই এখন মানেন। ভারতে আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে দুটী বড়ো অনার্য্য জা'ত বাস ক'রত—দ্রাবিড় আর কোল। আর্য্যেরা এল পূর্ব্ব-পারস্য হ'য়ে ভারতবর্ষে—কোন্ দেশ থেকে তারা এল, তা আমরা জানি না। তবে অন্ততো ভাষায় আর সভ্যতায় যারা তাদের জ্ঞাতি, এমন সব জা'ত পাওয়া যায় পারস্যে, আর্ম্মেনিয়ায় আর ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র। কেউ কেউ অনুমান করেন আদি আর্য্যদের বাস ছিল দক্ষিণ রুষিয়ায়; কারো মতে জার্ম্মানীতে; কেউ বা বলেন লিথুআনিয়ায়; কেউ বা বলেন হঙ্গেরীতে—আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুলের ইতিহাসে পড়া মধ্য-এশিয়াকে এখন অনেকেই মানেন না। সে যা হোক্, আর্য্যরা ভারতে এল, তাদের বৈদিক ভাষা, তাদের বেদের কবিতা, তাদের ধর্ম্ম, তাদের সামাজিক বিধি-নিয়ম, আর তাদের প্রচণ্ড সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে'। তাদের কতক অংশ পারস্যেই র'য়ে গেল। ভারতে এসে প্রথমটা পাঞ্জাবে তাদের বাস হ'ল। দেশটা কিন্তু খালি ছিল না; এখানে সুসভ্য দাস বা দ্রাবিড় জা'ত বাস ক'রত; আর তাদের তুলনায় বোধ হয় কিছু কম সভ্য কোলেরাও ছিল,—সমস্ত দেশটা জুড়েই ছিল। আর্য্যরা আস্তে তারা সসম্ভ্রমে দেশ ছেড়ে দিয়ে' চ'লে গেল না, মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে দাঁড়াল। প্রথমটা আর্য্য-অনার্য্যের সংঘাত ঘ'টল, আর এই সংঘাতে পাঞ্জাবে আর্য্যরাই জয়ী হ'ল, কিন্তু সিন্ধুদেশের সুসভ্য অনার্য্যের (ভাষায় এরা

কি ছিল এখনও তা জানা যায় নি) কাছ থেকে আর্য্যরা এমনি বাধা পেলে যে, তারা বহু শতাব্দী ধ'রে ওদিকে আর এগোলো না, পূব দিকে গঙ্গা-যমুনার দেশের দিকেই ছড়িয়ে' পড়্বার চেষ্টা ক'র্লে। আর্য্যরা তো অনার্য্যদের দেশ দখল ক'রে তাদের উপর রাজা হ'য়ে ব'স্ল। যদিও অনার্য্যরা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ হ'ল না, তবু আর্য্যের তীব্র আক্রমণে তাদের জাতীয় সংহতিশক্তির নাশ হ'ল। তারা সব বিষয়ে আর্য্যদের প্রভু ব'লে মেনে নিলে, তাদের ভাষা, তাদের ধর্ম্ম নিলে। কিন্তু আর্য্যরা ছিল সংখ্যায় কম, তারা অনার্য্যের প্রতিবেশ-প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পার্লে না। অনার্য্যের ধর্ম্মের আর মনোভাবের প্রভাব ক্রমে আর্য্যদের মধ্যেও এল। অনার্য্যদের ভাষার অনেক শব্দ আর্য্যরা গোড়া থেকেই নিতে আরম্ভ ক'রেছিল। অনার্য্যেরা যখন দলে দলে আর্য্যের ভাষা গ্রহণ ক'র্তে লাগ্ল, তখন তাদের মুখে আর্য্যভাষা স্বভাবতোই ব'দ্লে গেল; বিশুদ্ধ 'জা'ত'-আর্য্যদের ব্যবহৃত আর্য্যভাষাও অনার্য্যের বিকৃত আর্য্যভাষার ছোঁয়াচে প'ড়ে তার বিশুদ্ধি রাখ্তে পার্লে না।

ঋগ্বেদের যুগের পর আর্য্যেরা তাদের ভাষা নিয়ে উত্তর ভারতে বিহার পর্য্যন্ত ছড়িয়ে' প'ড়্ল। এই সময়ে বেদের মন্ত্ররচনার যুগের অবসান হ'ল, ব্রাহ্মণ গ্রন্থের যুগ এল। বেদের মন্ত্র আলোচনা, যজ্ঞ সংক্রান্ত সব খুঁটিনাটি আর দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা, আর প্রাচীন কিংবদন্তী নিয়ে এই-সব ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ। পূর্ব্ব-আফ্গানিস্থান থেকে বিহার পর্য্যন্ত, এই বিশাল ভূখণ্ডে যে সব দ্রাবিড় আর কোল লোক বাস ক'র্ত, তারা আর্য্যভাষা নিয়ে', আর্য্যদের পুরোহিত আর আর্য্যধর্ম্ম মেনে নিয়ে, আর্য্য বা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়।

এই অনার্য্যদের রাজারা অনেক সময় ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী ক'র্‌ত, আর সে দাবীও প্রায় গ্রাহ্য হ'ত,—ভাষা-সঙ্কট আর ধর্ম্ম-সঙ্কট যখন নেই, তখন আর কোনও বাধা ছিল না; আর এদের আগেকার ধর্ম্মের পুরোহিত বংশের লোকেরাও অনেক সময় ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে ব'স্‌ত। পূর্ব্বদিকে আর্য্যভাষা এগোতে লাগ্‌ল। কিন্তু খাঁটি আর্য্যদের সংখ্যা পূর্ব্বদেশে কখনই প্রবল ছিল না—আর্য্যীকৃত অনার্য্যের দ্বারা এই আর্য্য-ভাষা-প্রচারের কাজের খুব সাহায্য হ'য়েছে। খাঁটি আর্য্য তার গান্ধার বা কেকয়া বা মদ্র বা কুরু-পঞ্চালের ঘরবাড়ী ছেড়ে,বিশেষ আবশ্যক না হ'লে পূব-দেশে আস্‌ত না। ব্রাহ্মণ-যুগের শেষ ভাগ নিয়ে' হ'চ্ছে আরণ্যক আর উপনিষদের যুগ, তার পরই বুদ্ধদেব আর মহাবীর স্বামীর সময়। আরণ্যক আর উপনিষদের সময়ে বাঙলা দেশে আর্য্যদের আগমন হয়-নি, আর বুদ্ধদেবের সময়েও নয়। বিহার-অঞ্চলে যে সব আর্য্যরা প্রথম এসে বসবাস করে, তারা ছিল যাযাবর। তারা তাদের ঘোড়া, গোরু, ছাগল, ভেড়া নিয়ে ঘুরে' ঘুরে' বেড়াত; পশ্চিমা চাষী আর্য্যরা তাদের নাম দিয়েছিল 'ব্রাত্য'। তারা অবশ্য আর্য্যভাষা ব'ল্‌ত, কিন্তু তাদের আর্য্যভাষা পাঞ্জাব আর কুরু-পঞ্চাল অঞ্চলের আর্য্যদের ভাষা থেকে উচ্চারণে কতকটা আলাদা হ'য়ে গিয়েছিল, আর তাদের ধর্ম্মও ছিল বৈদিক ধর্ম্ম থেকে আলাদা; খুব সম্ভব তারা শিবের উপাসনা ক'র্‌ত, তারা বৈদিক যাগযজ্ঞ, হোম, অগ্নিপূজা ইত্যাদি ক'র্‌ত না, আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতও মান্‌ত না। বেদমার্গী পশ্চিমা আর্য্যরা এই সব কারণে তাদের ঘৃণা ক'র্‌ত, আর ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তাদের সম্বন্ধে নানান্ নিন্দার কথা লিখে' গিয়েছে। কিন্তু এরা যে আর্য্য ছিল, আর আর্য্যভাষা ব'ল্‌ত (যদিও

এদের উচ্চারণ ঠিক ছিল না), ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করা হ'য়েছে; আর বৈদিক আর্য্যরা এদের শুদ্ধি ক'রে বেদমার্গী ক'রে নিতেন খুব;—যে অনুষ্ঠানের দ্বারা এরা বৈদিক দীক্ষা নিত, সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ব্রাত্যস্তোম'। খুব সম্ভব এই ব্রাত্যরা অনার্য্য দ্রাবিড় লোকদের সঙ্গে কতকটা মিশে' গিয়েছিল। সে যুগে জাতিভেদের এত কড়াকড়ি ছিল না, আর ব্রাত্য আর্য্যরা মধ্যদেশীয় আর্য্যদের দ্বারা স্বীকৃত বর্ণভেদ মানতই না। এই ব্রাত্য আর্য্যরা বেদমার্গী আর্য্যদের আগে মগধ অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়, আর এটা খুবই সম্ভব যে তারা বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌লেও সে ধর্ম্ম তাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় হ'তে পারে-নি। তাই বৈদিক ধর্ম্মের যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে দুটী বড় ধর্ম্ম-মত প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হ'য়েছিল,—বৌদ্ধ-মত আর জৈন মত,—সেই দুটী মত এই মগধ অঞ্চলেই উদিত হয়, আর প্রথমে এখানকার লোকেদের মধ্যেই প্রসার লাভ করে।

(৭)

বুদ্ধদেবের সময়ের ভারতবর্ষের আর্য্য জনপদ বা রাজ্যের নামের একটা তালিকায় বাঙলার স্থান নেই। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেকার ঐতরেয় আরণ্যকের এক জায়গায় এ সম্বন্ধে এই ইঙ্গিত আছে যে বঙ্গ, বগধ আর চেরপাদ-জাতীয় লোকেরা মানুষ নয়, তারা পক্ষী বা পক্ষিকল্প। এই থেকে মনে ক'র্‌তে পারা যায় যে, বাঙলার মতনই বগধ বা মগধও উক্ত আরণ্যক লেখার সময়ে আর্য্যদের দ্বারা অধ্যুষিত হয় নি; এই জাতীয় লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রেই এদের 'বয়াংসি' বা পাখী বলা হ'য়েছে। বুদ্ধদেবের পরেকার বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে স্পষ্ট বলা হ'য়েছে

যে, উত্তর ভারতের আর্য্য ব্রাহ্মণ বাঙলা দেশে এলে পরে তাঁকে স্বদেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হবে; অনার্য্য দেশ ব'লে বাঙলার প্রতি উত্তর ভারতের আর্য্যরা এমনিই বিরূপ ছিল। এ দেশের সম্বন্ধে, বিশেষ পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে, আর একটী বদ্‌নাম এই ছিল যে, এখানকার লোকেরা ভারি রূঢ় আর অভদ্র। জৈনদের প্রাচীন বইয়ে মহাবীর স্বামীর সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে, তিনি 'লাঢ়' আর 'সুব্‌ভ' দেশে, অর্থাৎ রাঢ় ও সুহ্ম দেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার লোকে তাঁর উপর কুকুর লেলিয়ে' দিয়েছিল। আমার মনে হয় মৌর্য্যেরাই সব প্রথম বাঙলা জয় ক'রে আর্য্যাবর্ত্তের সঙ্গে বাঙলার সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করেন। মৌর্য্য যুগ থেকেই মগধের রাজকর্ম্মচারী, সৈনিক, বেণে, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ আর সাধারণ ঔপনিবেশিকেরা বাঙলা দেশে বসবাস ক'র্‌তে থাকে, আর তাঁদের দ্বারাই মগধের আর্য্যভাষা বাঙলা দেশে আনীত আর স্থাপিত হয়। তার আগে হয়তো দু' চার জন ব্যবসায়ী বা বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক বা অন্য শ্রেণীর লোক, আর্য্য পশ্চিম থেকে অনার্য্য বাঙলায় যাওয়া আসা ক'র্‌ত; কিন্তু মৌর্য্যদের বিজয়ের ফলে রাজশক্তির প্রভাব দ্বারাই আর্য্যভাষা বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়—তার আগে বাঙলা দেশে কেউ আর্য্যভাষা ব'ল্‌ত ব'লে বোধ হয় না। দেশে নানা দ্রাবিড় আর কোলজাতীয় লোকের বাস ছিল, তাদের নিজ নিজ ভাষা, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা, রীতি-নীতি, সবই ছিল। অবশ্য মৌর্য্যবিজয়ের আগে থেকেই আর্য্যভাষী সমৃদ্ধ, সুসভ্য প্রতিবেশী মগধের আর্য্যভাষার প্রভাব বাঙলার অনার্য্যদের উপর অল্পস্বল্প এসে থাক্‌তে পারে; কিন্তু দেশের জনসাধারণের কথা দূরে থাক্, অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও আর্য্যভাষা অত আগে, অর্থাৎ

মৌর্য্যদের আগে, গৃহীত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। এখানে আপত্তি উঠ্‌তে পারে যে, তাহ'লে বাঙলা দেশের সিংহবাহু রাজার ছেলে বিজয়সিংহ "হেলায় লঙ্কা করিল জয়" কি ক'রে? বিজয়-সিংহের সাথীদের বংশধরেরাই তো সিংহলীভাষা বলে, আর সিংহলী হ'চ্ছে আর্য্যভাষা; তাহ'লে বিজয়সিংহ সদল বলে বাঙলা থেকে গিয়ে থাক্‌লে তারা বাঙলা দেশ থেকেই তো সেই ভাষা নিয়ে গিয়েছিল? বিজয়সিংহ বাঙলা দেশ থেকে গিয়ে থাক্‌লে মৌর্য্য যুগের আগে থেকেই এ দেশে আর্য্যভাষার অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'য়ে যায় বটে। কিন্তু বিজয়-সিংহ বাঙলার লোক ছিলেন না; এ কথা শুনে' অনেক বাঙালী চ'টে যাবেন বা দুঃখিত হবেন। কিন্তু 'দীপবংস' আর 'মহাবংস' ব'লে পালি ভাষায় লেখা সিংহলের যে দুই প্রাচীন ইতিহাসে আমরা বিজয়সিংহের কথা পড়ি, তা আলোচনা ক'র্‌লে, বিজয়সিংহ যে গুজরাটের লোক ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। পালি বই অনুসারে বিজয়সিংহ হচ্ছেন 'লাল' বা 'লাড়' দেশের রাজার ছেলে; এই 'লাল' বাঙলার 'রাঢ়' বা 'লাঢ়' নয়, কিন্তু গুজরাট, যার এক প্রাচীন নাম ছিল 'লাট' বা 'লাড়'। বিজয়সিংহ লঙ্কায় যাবার সময় 'ভরুকচ্ছ' বা 'সুপ্পারক' বন্দর দুটী ছুঁয়ে যাচ্ছেন; এই দুই বন্দর এখনও গুজরাট অঞ্চলে বিদ্যমান, এদের এখনকার নাম হ'চ্ছে 'ভরোচ' আর 'সোপারা'। আর সিংহলীভাষা অনুশীলন ক'রে Geiger গাইগার সাহেব দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম ভারতের প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে এর যোগ আছে, মাগধী ভাষার সঙ্গে নয়। সিংহলীর সঙ্গে গুজরাট আর মহারাষ্ট্র অঞ্চলের ভাষার যে রকম যোগ আছে, সে রকম যোগ বাঙলার সঙ্গে নেই, সে সম্বন্ধে আমি একটী প্রমাণ পেয়েছি। আধুনিক ভারতীয় আর্য্য আর দ্রাবিড়

ভাষাগুলিতে 'প্রতিধ্বনি' বা 'অনুকার' শব্দের রীতি আছে। কোনও শব্দের দ্বারা প্রকাশিত ভাবের অনুরূপ বা সংশ্লিষ্ট ভাব প্রকাশ ক'র্‌তে হ'লে, আধুনিক আর্য্য আর দ্রাবিড় ভাষায় সেই শব্দটীকে আংশিক ভাবে দ্বিত্ব ক'রে বলা হয়; তার আদ্য ধ্বনিটীর বদলে অন্য একটী ধ্বনি বসিয়ে' বলা হয়। যেমন—বাঙলায় 'ঘোড়া-টোড়া', মৈথিলীতে 'ঘোরা-তোরা', হিন্দিতে 'ঘোড়া-উড়া', গুজরাটীতে 'ঘোড়ো-বোড়ো', মারহাট্টীতে 'ঘোড়া-বিড়া', তামিলে 'কুতিরৈ-কিতিরৈ', ইত্যাদি। দেখা যায় যে বাঙলা ভাষায় মূল ধ্বনিটীর স্থানে ব্যবহৃত নোতুন ধ্বনিটী হ'চ্ছে 'ট', মৈথিলীতে 'ত', হিন্দীতে 'উ', গুজরাটীতে 'ব', মারহাট্টীতে 'বি', আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে 'কি', বা 'ক' বা 'গ'; আর সিংহলীতে দেখা যায় যে 'ব' ব্যবহার হয়, গুজরাটী-মারহাট্টীর মতন—বাঙলার মতন 'ট' বা মৈথিলের মতন 'ত' বা হিন্দীর মতন 'উ' নয়: যেমন সিংহলী 'অশ্বয়-বশ্বয়'—বাঙলা 'অশ্ব-টশ্ব', সিংহলী 'দৎ-বৎ'—বাঙলা 'দাঁত-টাঁত', কিন্তু গুজরাটী 'দাঁত-বাঁত', মারহাট্টী 'দাঁত-বিত'। এই বিষয়ে সিংহলীর সঙ্গে পশ্চিম-ভারতের ভাষার আশ্চর্য্য মিল দেখা যাচ্ছে; এই মিল হ'চ্ছে এদের মৌলিক যোগের ফল—এইরূপ অনুকার শব্দ ব্যবহারে অন্য ভাষার প্রভাবের কথা আমরা কল্পনা ক'র্‌তে পারি না। বিজয়সিংহের দল, অর্থাৎ সিংহলের প্রথম আর্য্যভাষী উপনিবেশিকেরা, লাড়, লাট বা গুজরাট থেকেই গিয়েছিল, বাঙলা থেকে নয়;—'ব' অনুকার ধ্বনি ব্যবহার করে এমন পশ্চিম-ভারতের প্রাকৃত ভাষাই তারা মাতৃভাষা হিসেবে সঙ্গে নিয়ে' গিয়েছিল। এ ছাড়া, সপ্তম শতকের প্রথমে হিউএন্‌ থ্‌সাঙ তাঁর প্রমাণ বৃত্তান্তে আর্য্যদের সিংহল জয়ের কথা ব'লে গিয়েছেন;

তাঁর শোনা কিংবদন্তী কিন্তু পালি বইয়ের কিংবদন্তীর সঙ্গে মেলে না—তাঁর শোনা কথায় প্রথম ভারতীয় উপনিবেশিকেরা দক্ষিণ-ভারতের কোনও স্থানের লোক। কাজেই বিজয় যখন বাঙলারই লোক ন'ন, তখন তাঁর কাহিনী থেকে বাঙলার সম্বন্ধে কিছু অনুমান করবার অধিকার আমাদের নেই।

(৮)

বাঙলা দেশে যে অনার্য্যের বসতি ছিল, তা আমরা এ দেশের প্রত্যন্তভাগে এখনও অনার্য্য জা'তের বাস দেখে অনুমান ক'রতে পারি। বাঙলা দেশের আদিম অধিবাসীদের অনার্য্য-ভাষিতার আর একটী প্রমাণ আমরা পাই বাঙলার গ্রাম আর পল্লীর নাম থেকে—পুরানো বাঙলার তাম্রশাসনে প্রাপ্ত নামের কথা বল্‌বার সময় এ বিষয়ের উল্লেখ ক'রেছি। পশ্চিম-বাঙলায় ভূমিজ, সাঁওতাল, ওরাওঁ, মালপাহাড়ীরা এখনও বিদ্যমান; উত্তর-বাঙলায় আর পূর্ব্ব-বাঙলায় ভোট-ব্রহ্ম বা মোঙ্গোল জাতীয় অনার্য্য এখনও র'য়েছে, চোখের সাম্‌নে এরা বাঙালী হ'চ্ছে,—হিন্দু হ'চ্ছে, মুসলমানও হ'চ্ছে। মৌর্য্য-যুগের সময় থেকে, বা তার আগে থেকে, প্রায় আড়াই হাজার বছর ধ'রে এইরকমটা হ'য়ে আস্‌ছে। বিহার আর উত্তর ভারতের আর্য্যভাষী হিন্দু আর বৌদ্ধ, প্রতিষ্ঠাপন্ন মগধ দেশের প্রতিনিধি হ'য়ে বাঙলায় এল। রাজার ভাষা, ধর্ম্মের ভাষা, সভ্যতার ভাষা-হিসেবে এদের ভাষা অনার্য্যভাষী বাঙালীদের মধ্যে প্রচারিত হ'তে লাগ্‌ল। অনুমান করা যেতে পারে, দেশের অনার্য্য অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল, কারণ এ দেশে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন অনার্য্য-ভাষী জা'ত (এদের মৌলিক

উৎপত্তি যাই হোক্) তাদের নিজ নিজ ভাষা নিয়ে, রীতিনীতি নিয়ে বাস ক'রৃত—কোল, দ্রাবিড় আর মোঙ্গোল। কোথাও কোথাও বা Dravidian Longheads, Alpine Shortheads আর Mongol Shortheads, বা দ্রাবিড়ভাষী, কোলভাষী, মোঙ্গোলভাষী, এই তিন জা'তের মধ্যে দুটিতে বা তিনটিতে মিলে-মিশে আর্য্যভাষীদের আস্‌বার আগেই খিচুড়ী জা'তের সৃষ্টি হ'য়েছিল, আর সেই সব খিচুড়ী-জা'তের মধ্যে এই তিনটী ভাষার একটীই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের ঠিক খবরটী জান্‌বার উপায় নেই। বাঙলাদেশে দ্রাবিড়, কোল আর মোঙ্গোল-ভাষীদের সমাবেশ কিরকম ভাবে ছিল, তার একরকম মোটামুটী ধারণা ক'রৃতে পারি বটে—কোলেরা প্রায় সমস্ত দেশটী জুড়ে' ছিল, দ্রাবিড়েরা ছিল বেশীর ভাগ পশ্চিম-বঙ্গে, আর মোঙ্গোলরা ছিল পূর্ব্ব-বঙ্গে আর উত্তর-বঙ্গে, এইরূপ ই অনুমান হয়—কিন্তু এদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল, ভাবের, ভাষার, সভ্যতার আদানপ্রদানই বা কিরকম হ'ত, তাদের মধ্যে মিশ্রণ কি ভাবে হ'ত,—দেশের প্রকৃত অবস্থা অনার্য্যযুগে কিরকম ছিল;—এ সব জানবার কোনও পথ নেই। আর্য্য-ভাষার উপর দ্রাবিড় প্রভাব নিয়ে' আলোচনা কিছু কিছু হ'য়ে গিয়েছে। সম্প্রতি Jean Przyluski ঝাঁ প্‌শিলুস্‌কি নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত আর্য্য-ভাষার উপর কোল-ভাষার প্রভাব নিয়ে' অনুসন্ধান ক'রৃছেন, তাঁর অনুসন্ধানের ফলে বাঙলাদেশের আর বাঙলার বাইরের কোলদের ভাষা থেকে সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে কি রকমের শব্দ নেওয়া হ'য়েছিল, তার খবর আমরা পাচ্ছি; আর তার দ্বারা কোলদের সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু কিছু ছায়াপাতও হ'চ্ছে। এইরূপ টুকি-টাকি খবরে মনটা খুশী হয় না—কিন্তু নাচার; আমাদের

পূরো অবস্থাটী জান্‌বার পথ নেই। কারণ, দেড় হাজার বছর হ'য়ে গেল বাঙলার এই সব অনার্য্যভাষী লোক আর্য্যভাষা গ্রহণ ক'রে হিঁদু হ'য়ে গিয়েছে; তাদের প্রাচীন চাল-চলন একেবারে ভুলে' গিয়েছে, বা বহু স্থলে আর্য্যত্বের আবরণে ঢেকে ফেলেছে, তারা আচরণীয় অনাচরণীয় আধুনিক কালের নানা জা'তে পরিণত হ'য়েছে। কিছু কিছু পরিমাণে তারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও হ'য়েছে; আবার আজকাল Neo-Hinduism আর ইউরোপীয়দের দ্বারা পুনর্গঠিত আর্য্য-শ্রেষ্ঠতাত্মক ইতিহাস চর্চ্চার ফলে নোতুন ক'রে এই সব জা'ত দ্বিজ বা আর্য্য জাতির সামিল হবার চেষ্টা ক'র্‌ছে; আর এইভাবে, রহস্যটি না বুঝেও, উত্তর-ভারতের আর্য্যদের সৃষ্ট জাতিভেদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ ঘোষণা ক'র্‌ছে। চীনা পরিব্রাজক হিউএন্‌-থ্‌সাঙ্‌ যখন সপ্তম শতকের প্রথমে ভারতে আসেন, তখন তিনি বাঙলা দেশটীও ঘুরে যান, তিনি এই দেশের সভ্যতা, বিদ্যা আর ভাষা সম্বন্ধে যা ব'লে গিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় যে, তখন সারা বাঙলা দেশটা মোটামুটী আর্য্যভাষী হ'য়ে গিয়েছিল, আর সংস্কৃত বা অন্য বিদ্যার আলোচনা ব্রাহ্মণ্য, জৈন আর বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছিল। কিন্তু তখন উড়িষ্যা আর্য্যভাষী হয় নি—হিউএন্‌থ্‌সাঙ্‌ স্পষ্ট ব'লে গিয়েছেন যে, উড়িষ্যা অঞ্চলের ওড্র আর অন্য অন্য জাতি অনার্য্য-ভাষা ব'ল্‌ত। মৌর্য্যযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে হিউএন্‌-থ্‌সাঙের সময়—খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ থেকে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক—এই কয় শ' বছরের মধ্যে বাঙালী ব'লে একটী বিশিষ্ট জাতির সৃষ্টি হয়—অনার্য্য কোল, দ্রাবিড়, মোঙ্গোল আর হয়তো কোনও অজ্ঞাতভাষী Longhead, Alpine আর Mongol-দের যেন এক কড়ায় ফেলে

গলিয়ে' নিয়ে', আর্য্যভাষা, আর্য্য-সভ্যতা, আর ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম্মের ছাঁচে ঢেলে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ এই আদি বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়। এই জা'তের সৃষ্টিতে পশ্চিম থেকে আগত ব্রাহ্মণ আর অন্য উচ্চ বর্ণকেও কিছু কিছু পরিমাণে গ্রহণ করা হ'য়েছে। বাঙলায় আর্য্য প্রসারের সময় থেকেই, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের সময় থেকে, উত্তর-ভারতের (মধ্যদেশের বা আর্য্যাবর্ত্তের) ব্রাহ্মণদের এ দেশে এনে' ভূমি দিয়ে', বৃত্তি দিয়ে' বসানো হ'ত—যাতে তাঁরা এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে বৈদিক আর পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্ম আর সংস্কৃত সাহিত্যকে স্থাপিত ক'রতে পারেন। এটি খুবই সম্ভব যে, এই সব আর্য্যাবর্ত্তীয় ব্রাহ্মণ বাঙলায় এসে উত্তর-ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে' ফেলেন, আর অতীতের অন্ধকারময় কালে—যার কোনও ইতিহাস আমাদের নেই—স্থানীয় বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে, বা ব্রাহ্মণেতর অন্য জা'তের সঙ্গে, বৈবাহিক সূত্রে মিশে গিয়েছিলেন। নৃতত্ত্ববিদ্যা একটি জিনিষ আমাদের ব'লছে এই যে, দৈহিক গঠনে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাঙলার ব্রাহ্মণেতর জাতি, কায়স্থ, নবশাখ, নমঃশূদ্র প্রভৃতির যতটা মিল দেখা যায়, আর্য্যাবর্ত্তের কনৌজিয়া প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণদের এ বিষয়ে ততটা মিল নেই। এই কথাটী চিন্তার যোগ্য।

(৯)

কোনও দেশে তার নিজের ভাষাকে মেরে ফেলে একটী বিজাতীয় বা বিদেশীয় ভাষার প্রসার সাধারণতো এই ভাবেই হ'য়ে থাকে :— প্রথমতো, ঐ দেশ অন্য জা'তের দ্বারা জিত হয়, আর বিদেশীয় ভাষা

আসে রাজার জাতির ভাষা হ'য়ে। যদি সভ্যতায়, সঙ্ঘশক্তিতে আর মানসিক উৎকর্ষে বিদেশীয় জেতারা বিজিতদের চেয়ে উন্নত না হয়, তাহ'লে বিদেশীয় ভাষার পরাভব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি বিদেশীয়রা এই সব গুণে বিজিতদের চেয়ে উন্নত, অন্ততো বিজিতদের সমকক্ষ হয়, তাহ'লে বিজিতদের মধ্যে জেতার ভাষার প্রচার সহজে হয়। যেখানেই বিদেশীয় ভাষা এসে স্থানীয় ভাষাকে গ্রাস ক'র্‌ছে, সেইখানেই দেখা যায় যে, সঙ্ঘশক্তির অভাবে আত্মবিশ্বাস আর নিজের জা'তের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে, বিজিতদের মধ্যে যারা লোকনেতা তারা বিদেশীয় ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে; দেশের অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা বিদেশীয় ভাষা এইরূপ একবার স্বীকৃত হ'য়ে গেলে সেটা একটা অনুকরণীয় বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়, সাধারণ লোকের মধ্যে বিদেশীয় ভাষাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া আর নিজের ভাষা ত্যাগ করা আভিজাত্যের বা উৎকর্ষের প্রমাণ ব'লে গণ্য হয়; তখন দ্রুতগতিতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিদেশীয় ভাষাই প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙলাদেশে আর্য্য-ভাষা এইরূপেই প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, এই অনুমান যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয়। রাজপুরুষ, ব্যবসায়ী, ধর্ম্মগুরু, সাধারণ ঔপনিবেশিক—সব দিক থেকেই প্রভাব আসে। আর বাঙলার অনার্য্য, সঙ্ঘশক্তির অভাবে, ঐক্যের অভাবে, বোধ হয় জাতীয়তা-বোধের অভাবে, আর উত্তর ভারতে তাদের জ্ঞাতিদের ইতিমধ্যে আর্য্য-ভাষা গ্রহণের দৃষ্টান্তে, সহজ-ভাবেই আর্য্য-ভাষা আর গাঙ্গেয় সভ্যতা নিয়েছিল।

বাঙলাদেশ মুখ্যতো প্রাচীনকাল থেকেই এই কয়টা বিভাগে বিভক্ত :—রাঢ়, সুহ্ম, বরেন্দ্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন, বঙ্গ, কামরূপ। *এই নামগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই হ'চ্ছে জা'তের নাম—জা'তের নাম থেকে

দেশের নামকরণ খুবই সাধারণ প্রথা। রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, পুণ্ড্র, আর কামরূপ, কম্বোজ, কামতা, কমিল্লা প্রভৃতি নামের কাম বা কম শব্দ—এগুলি আর্য্য ভাষার পদ নয়। এগুলি হ'চ্ছে অনার্য্য জাতির নাম, তাদের নাম থেকে তাদের অধ্যুষিত প্রদেশের নামকরণ হ'য়েছে। তুলনীয়—আসাম = অসম বা অহম জাতি। রাঢ় যে এক দুর্দ্ধর্ষ অনার্য্য জাতির নাম ছিল, তার ইঙ্গিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও পাই। রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গের মত অন্য অন্য অনেক অনার্য্য জাতি বাঙলায় বাস ক'রত—তাদের নাম থেকে বাঙলার কোনও অঞ্চল নিজ নাম পায়নি বটে, তবুও তারা সুপরিচিত প্রতিষ্ঠাপন্ন জাতি। এখন এই সব জাতি নিজেদের আর্য্য, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব'লে পরিচয় দিচ্ছে; এই সকল জা'তের শূদ্র আখ্যা ত্যাগ ক'রে ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বের বা বৈশ্যত্বের দাবী হ'চ্ছে মূলতো উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের আর বৈশ্যের তথা-কথিত আর্য্যত্বের বিরুদ্ধে একরকম প্রতিবাদ মাত্র—"আমরাও তোমাদের চেয়ে কম নই, তোমাদের মতন আমরাও আর্য্য, দ্বিজ"। আমি এই প্রতিবাদের অন্তর্নিহিত ভাবটী বুঝি, আর তার সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে। সকলেই আর্য্য হোক্, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হোক, আর এই-সব উন্নত জাতের আখ্যা পেয়েও স্বধর্ম্ম আর স্ববৃত্তি সম্বন্ধে আত্মসম্মানযুক্ত হ'য়ে শক্তিশালী হোক্,—এটী আমার দেশের জন্য, আমার বাঙালী জা'তের হিতের জন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে, ঐ ব্যাপারটী দেখ্‌লে স্বীকার ক'র্‌তেই হবে যে, বাঙলার আদি অনার্য্য কোল বা দ্রাবিড়-ভাষী Dravidian Longhead, Alpine আর Mongoloid শ্রেণীর মানবগণ থেকে উৎপন্ন এই সব জা'তের কেবলমাত্র উত্তর ভারতের

North Indian Longhead আর্য্য পূর্ব্বপুরুষ কল্পনা করা চলে না—বাঙালীর মধ্যে যে ধরণের দৈহিক সমাবেশের প্রাধান্য দেখা যায় (আগে যাকে [২] শ্রেণীর ব'লে ধরা হ'য়েছে) সেটা উত্তর-ভারতের 'আর্য্য' থেকে একেবারে আলাদা। লম্বা-মাথা আর গোল-মাথা শ্রেণীর কোল, দ্রাবিড়, মোঙ্গোলভাষী (আর কিছু-পরিমাণে উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য্য আর আর্য্যভাষী)—এই সব নানা রকমারি মাল-মশলা নিয়ে', আর্য্যাবর্ত্তের বিশুদ্ধ বা মিশ্র ব্রাহ্মণের সামাজিক নেতৃত্বে, এক হিন্দুধর্ম্ম আর বর্ণ-সমাজের সূত্রে এদের গেঁথে নিয়ে', আধুনিক হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে এদের ফেলে, এদের দ্বারা আর্য্যভাষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, বাঙালী হিন্দু-সমাজের পত্তন হয়। এই সমাজকে সুদৃঢ় ক'রতে ৫।৭ শ' বছর বা তার বেশী লেগেছিল; সমাজে ব্রাহ্মণ্য* জাতিভেদ স্বীকৃত হওয়ায় সব উপাদান পূরোপূরি মিশে chemical combination হ'তে পারে নি, এ একটা mechanical mixture হ'য়ে র'য়েছে। এই জা'তে এখন কোন্ শ্রেণীর লোকের কি স্থান, তাও পূরোভাবে তাদের মনঃপূত ক'রে নির্দ্ধারিত হয়-নি। সুদূর স্মরণাতীত যুগের পার্থক্য এই পূর্ণ মিশ্রণের অন্তরায় হ'য়ে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান আছে কিনা কে জানে। এটাও অনুমান হয় যে, বাঙালী আর্য্য-ভাষী হ'লে পরও, বাঙলাদেশে বহু স্থলে অনেক জন-সমষ্টি ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দু-সমাজের জাতিভেদের শৃঙ্খল বা বিধি-নিয়ম মানতে চায়-নি; তারা বৌদ্ধ হ'য়ে ব্রাহ্মণকে মানত না। পূর্ব্ব-বঙ্গে হয়তো এইরূপ বৌদ্ধ-সমাজই বেশী ছিল; অনুমান হয় মুসলমান বিজয়ের পরে। রাঢ় আর বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণ গিয়ে' বসবাস করবার পরে ও-দেশে ব্রাহ্মণদের প্রভাব হয়,—'বজ্র'

কায়স্থ আছে, বৈদ্য আছে, কিন্তু বঙ্গজ ব্রাহ্মণ নেই। বৌদ্ধ বাঙালী-দের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়ে ভালো বা শুদ্ধ হ'লেও, হিন্দু-সমাজে দেরীতে প্রবেশ করার জন্য সমাজে নিম্ন বা অনাচরণীয় স্তরেই গৃহীত হ'য়েছিল। ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ আবার অনেকের কখনও যায় নি; তুর্কীরা বাঙলা জয় করবার কিছু পরেই অনেকে নবাগত ব্রাহ্মণবিদ্বেষী বৌদ্ধ, জেতাদের ধর্ম্মকে অন্ততো নামেমাত্র স্বীকার ক'রে, বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ থেকে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে।

(১০)

এম্নি ক'রেই আর্য্য-ভাষা গ্রহণ ক'রে বাঙালী জা'তের সৃষ্টি হ'ল। খ্রীষ্টাব্দ ৭০০ আন্দাজ এই জা'ত দাঁড়িয়ে গেল—ভারতের মধ্য আর আধুনিক যুগের বিশিষ্ট জাতিদের মধ্যে অন্যতম হ'য়ে। আনুমানিক ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলায় পাল বংশের অভ্যুদয় হ'ল। পালবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর এঁরা রাজত্ব করেন। শেষটা বাঙলাদেশ এঁদের অধিকারে আর ছিল না, এঁরা খালি বিহারে রাজত্ব ক'রতেন। এঁদের সময়ে গৌড়-বঙ্গ বা বাঙলাদেশ, মগধ দেশের সঙ্গে মিলে' ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বড় জা'ত ব'লে আসন পায়। বাঙালীর সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ মুসলমান তুর্কীর আস্‌বার পূর্ব্বে যেটুকু হ'য়েছিল, সেটুকু এই পাল রাজাদেরই আমলে। সেটুকু নেহাৎ কম নয়—কি বিদ্যায়, কাব্যে, ব্যাকরণে, সাহিত্যে, দর্শনে, স্মৃতিতে; কি শিল্পে, রূপকর্ম্মে, ভাস্কর্য্যে, আর কি শৌর্য্যে, সব্ বিষয়ে হিন্দুযুগের বাঙলার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই পাল রাজাদের সময়ে। গৌড়-মাগধ ভাস্কর্য্য-রীতি ভারতের শিল্পের মধ্যে এক অপরূপ সৃষ্টি,—তা এই পালরাজাদের

সময়েই হয়। ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধ পণ্ডিতে মিলে এক বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য বাঙলায় গ'ড়ে তোলেন; দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতন বৌদ্ধ প্রচারকেরা বাঙলার বাইরে ভগবান বুদ্ধের বাণী আর তখনকার দিনের নবীন বাঙলার চিন্তা প্রচার ক'রতে বা'র হন। এই পালেদের সময়ে বাঙলা ভাষায় বোধ-হয় প্রথম কবিতা লেখা হয় পণ্ডিতের দ্বারা; আর বাঙলা ভাষার সাহিত্যের পত্তন এই সময়েই হয়। একাদশ শতকের শেষের দিকে পাল রাজারা রাঢ়ের সেনবংশীয় রাজাদের দ্বারা বাঙলা থেকে বিতাড়িত হন। সেনবংশীয় রাজারা—হেমন্ত সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন—দ্বাদশ শতকে রাজত্ব করেন; তাঁদের সময়ে বাঙলায় বিরাট এক হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, বৈষ্ণব ধর্ম্ম তার মধুর ভাব নিয়ে নোতুন ক'রে প্রকট হয়। সেন রাজাদের সময়ে হিন্দু বাঙালীর সমাজেরই প্রতিমা একরকম তার পূর্ণরূপ পেলে; তার কাঠামো গড়া হ'য়েছিল পালবংশের পূর্ব্বে, এক-মেটে আর দো-মেটে হয় পাল-বংশের অধীনে; আর তার রঙচঙ করা, চোখ চান্‌কানো সাজানো হ'ল সেনবংশের সময়ে। তারপর তুর্কী আক্রমণ আর বিজয়ের ঝড় ব'য়ে গেল, বাঙালী জা'ত যেন দু'শ' বছর মূর্চ্ছাগ্রস্ত হ'য়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে এই জাতি আবার চোখ মেল্‌লে; তার চিন্তাশক্তি আর সাহিত্য আবার প্রাণ পেলে। আর বাঙালী জা'তকে তার পূর্ণতা দিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এসে, যাঁর সম্বন্ধে কবির উক্তি—'বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধ'রেছে কায়া'—সম্পূর্ণরূপে সার্থক উক্তি।

এতদিন ধ'রে বাঙালী ঘর-মুখো হ'য়েই কাটাতে পেরেছে, দেহে আর মনে তাকে বড় একটা বাঙলার বাইরে যেতে হয় নি; বড়ো জোর

পুরী, মিথিলা, কাশী, বৃন্দাবন, দিল্লী পর্য্যন্ত সে ঘুরে' এসেছে। কিন্তু এখন সেকাল আর নেই, বিশ্বের সঙ্গে বাধ্য হ'য়ে বাঙালীকে এখন যুক্ত হ'তে হ'চ্ছে। নবীন যুগের নানা নোতুন অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত এখন বাঙালীকে বিচলিত ক'রে তুল্‌ছে—দেহে মনে তাকে আর ঘ'রো বা প্রাদেশিক হ'য়ে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না। তাকে ওদিকে যেমন তার দেশের প্রাচীন কথা জান্‌তে হ'বে, দেশের প্রাচীন গৌরব কোথায় সেইটী উপলব্ধি ক'র্‌তে হবে; তেমনি তাকে বিশ্বের মধ্যে একজন হ'য়ে তার কর্ত্তব্য আর তার অধিকার গ্রহণ ক'র্‌তে হবে,—তার জা'তের দ্বারা যে চরম উৎকর্ষ সম্ভব তাকে তাই অর্জ্জন ক'র্‌তে হবে। এই নবীন যুগে ঘরে বাইরে নানা সংঘাত, সংশয়, আশা, আশঙ্কা, আনন্দ, বিষাদ তাকে অভিভূত ক'র্‌ছে। কিন্তু তার ভাগ্যক্রমে, তার জা'তের নিহিত কোনো অদৃষ্ট শক্তির ফলে, সে এই যুগে ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ নেতা পেয়েছে—রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ।

মাত্র হাজার দুই বছর কি তার চেয়েও কম নিয়ে' বাঙালীর অতীত ইতিহাস—খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে বাঙালী জাতীয়ত্বের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, মাগধী প্রাকৃতকে অবলম্বন ক'রে বাঙলা ভাষার বনিয়াদ স্থাপন। তার আগে প্রায় হাজার বছর ধ'রে, ধীরে ধীরে এই সৃষ্টিকার্য্য চ'ল্‌ছিল। তখন সেই সৃষ্টির যুগে প্রস্তূয়মান বাঙালী জাতির গৌরবের কি ছিল জানি না—তবে তখন বাঙালী জাতি সংস্কৃত ভাষা আর আর্য্য সভ্যতাকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে, আত্মসাৎ ক'রে নিচ্ছে, সংস্কৃত ভাষায় বাঙলার বিদ্বজ্জন সাহিত্য লিখ্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যে গৌড়ী রীতি ব'লে একটা রচনা-শৈলীও খাড়া

হ'য়ে গিয়েছে। তার পূর্ব্বে বাঙালী ছিল অনার্য্যভাষী—বাঙালী বা গৌড়ীয় বা গৌড়-বঙ্গ ব'লে তখন এক ভাষা এক রাজ্য এক ধর্ম্মের পাশে বদ্ধ কোনও জা'ত ছিল না—কিন্তু রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে খণ্ডে খণ্ডে বিক্ষিপ্ত বাঙালীর পূর্ব্বপুরুষ দ্রাবিড় আর কোল-ভাষী গণদের নিজেদের একটা সভ্যতাও যে ছিল, তার প্রমাণ আমাদের যথেষ্ট আছে। এই প্রাগ্-আর্য্য যুগে তারা ভালো ভালো শিল্প জান্‌ত, মিহি কাপাসের সূতোর কাপড় বুন্‌ত, হাতী পুষ্‌ত, জাহাজে ক'রে ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপে ব্যবসা ক'র্‌তে, উপনিবেশ স্থাপন ক'রতেও যেত;—আর যে ধর্ম্মভাব পরবর্ত্তী যুগে সহজিয়া, বাউল, বৌদ্ধ, শাক্ত আর বৈষ্ণব আর মুসলমানী সুফী মতকে অবলম্বন ক'রে এমন সুন্দর দর্শন আর সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছিল, আর যে কুশাগ্র বুদ্ধির দ্বারা নব্যন্যায়ের মত দর্শনের চরম বিকাশ বাঙলা দেশের মাটীতেই সম্ভব হ'য়েছিল, তারও মূল যে এই আদি অনার্য্য বাঙালীর মধ্যেই ছিল, এটা অনুমান করা অন্যায় হবে না। বিদেশ থেকে আগত আর অধুনা বাঙালীভূত কোনও কোনও জাতি বা সমাজকে বাদ দিলে আদি বাঙালীর, আমাদের আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বাঙালী জা'তের পিতামহ বা মাতামহ বা উভয় কুলের পূর্ব্বপুরুষদের এইরূপ পরিচয় আঁক্‌বার চেষ্টা দেখে, যাঁরা সত্যযুগের অস্তিত্বে আর সংস্কৃতে-কথা-বলা—দিব্যশক্তিশালী ঋষিদের শাসিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের সমাজের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁরা খুশী হবেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক আর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা পূর্ব্বকথার নষ্ট কোষ্ঠীর পুনরুদ্ধার ক'র্‌লে আমাদের ইতিহাস আর আমাদের জা'তের পূর্ব্ব-পরিচয়টা এইরকমই দাঁড়ায় ব'লে আমার বিশ্বাস। খালি আমাদের

বাঙালীদের যে দাঁড়ায় তা নয়, ভারতের আরও অনেক জা'ত সম্বন্ধে এই ধরণের কথাই ব'ল্‌তে হয়। নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ—সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা আমাদের করা উচিত ;—আমাদের সহজ জাতীয়তার গৌরববুদ্ধি, আমাদের অতীত সম্বন্ধে যে কল্পনোজ্জ্বল অথচ অস্পষ্ট ধারণা আছে, তার উপরে সত্যদিদৃক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই। আমাদের অতীত কিছু অগৌরবের নয় ;—মোটে দু' হাজার, দেড় হাজার বছরের হ'লই বা? কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎকে আরও গৌরবময় ক'রে তুল্‌তে হবে,—এই বোধ যেন আমাদের থাকে, আর তা যেন আমাদেরকে আমাদের জাতীয় আর ব্যক্তিগত জীবনে শক্তি দেয়।

[এই প্রবন্ধ ছাপাবার সময় ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃনত্ত্ববিদ্যার অন্যতম অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহের সঙ্গে বাঙলার নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপের সুযোগ হয়, তাতে দু' একটি বিষয়ে নূতন তথ্য তাঁর নিকট পাই, আর তাঁর সমালোচনায় আমি বিশেষ উপকৃত হই। বন্ধুবরের কাছে সেইজন্য আমি কৃতজ্ঞ।]

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দ্বন্দ্ব।

ধমনীতে রক্তস্রোত মানেনা বারণ!
লৌহসম মুষ্টিমাঝে করিয়া ধারণ
পৃথিবীর বক্ষ চিরি নিষ্কাশিয়া রস,
করিবারে চাহে পান; রজনীদিবস
মধুমত্ত মাতঙ্গের মত্ত খেলাসম
পদ্মবন মথি' দলি' লুণ্ঠি' অনুপম
করিবারে চাহে কেলি; অসুর সমান
প্রাণের অদম্য বেগে করি কম্পমান,
রমণীর কম্বুকণ্ঠ করি আকর্ষণ,
নিষ্ঠুর আঘাতে বক্ষ করিয়া মন্থন,
নিঃশেষে নিঃশেষ করি' শুষি' নিতে চায়
যত আছে প্রাণ তার; লক্ষ দিকে ধায়
আকাঙ্ক্ষার সংখ্যাহীন দুর্ম্মদ সন্তান
ভীষণ তাণ্ডবে, অতি ভীম রুদ্রতান
কণ্ঠ চিরি বাহিরায়; যেন বিশ্বতল
রূঢ় আকাঙ্ক্ষার স্পর্শে হতেছে সবল,—
যেন আকাঙ্ক্ষার শেষে শেষ সৃষ্টিলিখা
শুধু পড়ে' রবে কৃষ্ণ মৃত্যু-যবনিকা!

তারপর ধীরে ধীরে সব মিশে যায়।
কি মধু সঙ্গীত ওঠে প্রাণের খেলায়,
স্নিগ্ধ পুলকে কে যে গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে নহে কভু নহে, সত্য হোথা নহে,
নহে ওই দানবের নর্ত্তন তাণ্ডবে,
রুদ্র জীবনের ওই রূঢ় মহোৎসবে,
নহে কভু নহে; সত্য সত্য হ'য়ে আছে
যেথা সৃষ্টি আদি হ'তে মৌনতার মাঝে
রচিছে আনন্দ-গান; যেথা ধীরে ধীরে
ফুল ফুটে হেসে ওঠে পুষ্পবীথিশিরে,
নিবিড় নীলিমাঘেরা আকাশের গায়
তারা নেভে জ্বলে পুনঃ ঊষায় সন্ধ্যায়,
নীরব পুলকে; রাখালের বাঁশিগান
স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে যেথা দিতেছে সন্ধান
আকাঙ্ক্ষার পরপারে যে জগৎ রাজে,
তাহারি গোপন বার্ত্তা; রমণীর মাঝে
যেথায় নিবিড় হ'য়ে নিভৃত মন্দিরে
মৌন আনন্দের সুরে বেঁধেছে গম্ভীরে,
তারি স্পর্শে সত্য আছে; সত্য আছে ওই
যেথায় আনন্দবাণী চির মৌনময়ী।

এই দুই রূপে মোরে করিছে পাগল
বারে বারে; ভেসে আসে আকুল চঞ্চল

প্রমত্ত প্রাণের নেশা ভৈরব গর্জ্জনে,
যেন ভীম প্রভঞ্জন স্বন্ স্বন্ স্বনে
উপাড়িয়া নিতে চায় জীবনের সব।
অর্থহীন ব্যস্ততার রুষ্ট কলরব
আপনারে শক্তি বলি' করিছে প্রচার
দিকে দিকে, লক্ষ লক্ষ ভোগ আকাঙ্ক্ষার
মথিত ব্যথিত যত জীবনের গান
আনন্দের বার্ত্তা বলি' লভিছে সম্মান
অহঃরহ,—সেইখানে করিছে ঘোষণা
আপনারে সত্য বলি প্রাণের ঈষণা
অহর্নিশ।

পরক্ষণে চোখে আসে জল
নেহারিয়া সরোবরে প্রস্ফুটিত-দল
শতদলে; প্রজাপতি রঙীণ্ পাখায়
ফুলবনে ফুলসনে অধীর খেলায়,
অলির গুঞ্জনে, বন্য কপোতের ডাকে,
উদাস আবেশে যবে চিত্ততল ঢাকে,
মনে জাগে এর চেয়ে আর কিবা আছে
ইন্দ্রিয়-বিলাস? কোন্ সংগ্রামের মাঝে
আছে এর সুখলেশ? রমণীর রূপে
যা-কিছু আনন্দ আছে, আছে চুপে চুপে
ভোগ যেথা ইন্দ্রিয়েরে করি অতিক্রম
রচিয়াছে মৌন নীড়; সকল সংযম

মিথ্যা যেথা হ'য়ে গেছে ঊর্দ্ধের আলোকে,
জীবন-দেবতা যেথা রোমাঞ্চ পুলকে
আনন্দের বীজ খোঁজে আপনারি মাঝে,
সৃষ্টি যেথা নবরূপে পূর্ণ হ'য়ে রাজে
ভোগের ওপারে।
এই দুই পরিহাস
নিত্য মোর চিত্ততলে করিছে বিলাস,
জীবন বিক্ষুব্ধ ক'রি; দানব দেবতা
পরে পরে ব'য়ে আনি আপন বারতা
মিথ্যা করি' দিয়া যায় সকল বিরাম
মর্ম্মতলে; তাই মোর নাহিক বিশ্রাম:
আকুল আগ্রহে তাই যাহা ধরি',—হায়,
অন্য পরিহাসে পুনঃ মিথ্যা হ'য়ে যায়!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।

—:**=:—

এতদিন যাহোক একরকম ছিলাম। লোকে বড় জোর পরাধীন বলে' একটা অখ্যাতিই করত, ভীরু কাপুরুষ বলে' নাহয় একটা অপবাদ দিত। তবুত যখনতখন এমন করে' খামখা লাঠি মেরে কেউ মাথাটা ভেঙ্গে দিত না, 'ভাই' 'ভাই' বলে' পাশাপাশি রাস্তা চলতে চলতে এমন আচম্‌কা ছুরি মেরে কেউ কল্‌জেটা দু'খান করে' ফেলত না। ইংরাজ আমাদের পর। তথাপি তার আর যত দোষই দিই, এ দোষ আমরা কিছুতেই দিতে পারবনা যে, তাদের গুপ্ত ছোরার ভয়ে আমরা ঘরে শুয়ে কোনদিন ঘুমোতে পারিনি। কিন্তু ঘরের ঢেঁকি কুমীর হ'লে যে কিছুতেই সোয়াস্তি থাকেনা, তা' আমরা খুবই বুঝতে পেরেছি এবার। তাই যাঁরা ইংরেজের উপর রাগ করে' বলেন—বাদসাহী আমলে আমরা পরাধীন থাকলেও ঢের বেশী সুখে ছিলাম, তাঁদের কথা এখন মনে হ'লে মনটা মোটেই খুসী হয় না। কারণ এই যদি সে সুখের নমুনা হয়, তাহ'লে বোধ করি আমার মত অনেকেই বলবেন—ও সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ঢের ভাল। তবুও গেরস্ত এখনও শিয়রেই আছেন। তিনি স্বয়ং খোঁয়াড়ের দুয়ারে খাড়া থাকতে থাকতেই আমাদের গুঁতিয়ে মেরে ফেল্লে; না জানি যখন খোঁয়াড়ের মালিকই এঁরা ছিলেন, কি দুঃখেই তখন দিন গিয়েছে।

সংসারে যতরকম করুণ তামাসা আছে, তার মধ্যে সেরা তামাসা হচ্ছে যখন দেখা যায়, খোঁয়াড়ের একটা বলদ মনের গরমে আর গুলোকে গুঁতিয়ে ঘায়েল করে' খোঁয়াড়-রাজ্যে একাধিপত্য করবার স্বপন দেখে। সে ভাবে বুঝি খোঁয়াড়ের মধ্যে বাহাদুর হ'তে পারলেই তার জয়জয়কার হবে; কিন্তু হতভাগা প্রাণী একবারও ভাবে না যে, ভাগ্যহীনের বোঝার ভাগ ভাগ্যবানে কখন নেয় না। যদিই কোন কালে কেউ তার দুর্ভাগ্যে দোসর হয়, তাহ'লে আজ যাকে সে প্রাণ-পণে গুঁতিয়ে মারছে, সেই হতভাগারাই হবে। তারপর, সত্যি সত্যিই যদি তাদের ঘায়েল করা সম্ভবই হয়, তাহ'লেও যে শেষে সব বোঝা-ই তাকে একা বইতে হবে, এ হুঁস বোধহয় তার নেই। যে কারণেই হোক, বর্ত্তমানে কিছু না বল্লেও, বোঝা টানাবার সময় যখন আসবে, বাহাদুর বলে' এতটুকু দয়াও ত মনিব তখন করবে না! কথামালার ঘোড়া ও গাধার গল্পের ঘোড়ার মত সব বোঝা-ই যখন টানতে হবে, তখন সে দেখতে পাবে, রাম কখন্ উল্টো বুঝে বসে আছে।

এইত অবস্থা। এখন "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি" কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছি নে। একদিকে জাত, আর এক দিকে 'জান্'; 'জান্' বাঁচাতে গেলে জাত থাকে না, আবার জাত বাঁচাতে গেলে জান্ থাকে না। প্রাণটা যে অতি প্রিয় এবং মূল্যবান বস্তু, তা কিছুদিন থেকে মাঝে মাঝেই বোঝবার সুযোগ আমাদের ঘটছে। উপরন্তু শাস্ত্রেও বলেছে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি"। এদিকে জাতও ত আমাদের কাছে কম মূল্যবান বস্তু নয়। কারণ আমাদের জাত মানেই ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মেরও যেমন ছত্রিশটে শাখা; জাতেরও

তেমনি ছত্রিশটে শাখা। এ ছত্রিশ জাত ভাঙ্গা মানে জাতের গোড়ায় একেবারে কুঠার দেওয়া। আর এ জাত যাওয়া মানেই ধর্ম্ম-যাওয়া। ধর্ম্মই যদি গেল, তবে এ ধর্ম্মহীন জীবনে আমাদের প্রয়োজন? শাস্ত্রে এও ত আছে—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"। কি কঠিন সমস্যা! একটি রাখতে গেলে আর একটি থাকে না! বিধাতার মনে নিতান্ত দুরভিসন্ধি না থাকলে বোধ করি এমন বিপদে তিনি আমাদের ফেলতেন না। বড় বড় নেতাদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা তারস্বরে বলবেন—যদি জানে বাঁচতে চাও ত ছত্রিশ জাত ভেঙ্গে এক হও, সংগঠন কর। এক ত হব, কিন্তু জাতই যদি গেল, তবে আমাদের রইল কি?

বিপদ যখন আসে তখন বুঝি এমনি করেই আসে, কোনদিকেই নিস্তার থাকে না। আমাদের সনাতন ধর্ম্মের উপর স্থাপিত সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম জাতিগোষ্ঠির মধ্যে নির্বিবাদে থেকে যে নিশ্চিন্ত মনে পরমার্থ চিন্তা করব, তারও জো নেই। পাড়ার লোক এসে ঘরে ঢুকে খুঁচিয়ে মারবে। পৃথিবীতে কোনকালে কোন জাতি বুঝি এমন বিপদে কখন পড়ে নি! তারপর বিধাতা যাঁদের হাতে আমাদের সুখশান্তি রক্ষার ভার অর্পণ করেছেন, তাঁদের কাছে যদি নালিশবন্দী হলাম, তাঁরা ভাবলেন—ভালই হয়েছে। আমরা যতই পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরে গুঁতোগুঁতি করে' কাবু হব, তাদের শান্তিরক্ষার কাজ ততই সহজ হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই তাঁরা দিল খোলসা করে' ভরসা দিলেন—"কুছ পরোয়া নেই"। পরোয়া ত নেই, কিন্তু বিড়ালের রুটি-ভাগ নিয়ে বিবাদের সালিসী নিষ্পত্তির কথা মনে হলেই যে ও-ভরসায় পরওয়ার মাত্রা আরো বেড়ে ওঠে। কাজেই এক একবার মনে হয়, যদি জাত ভেঙ্গে এক হলেই ছোরার ঘা থেকে বেঁচে যাওয়া যায়, না

হয় তাইই করা যাক। কিন্তু একবার ভাঙ্গলে যদি চিরকালের জন্যে আমাদের সনাতন জাতি সম্পদ নষ্ট হ'য়ে যায়, সেই দুশ্চিন্তা। অথচ মাঝে মাঝে নানা স্থান থেকে যে-সব পরোয়ানা এবং খবর আসছে, তা শুনলেও বুকের রক্ত জল হ'য়ে যাচ্ছে। তাই দিনরাত ভাবছি "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি", জাত বাঁচাই কি 'জান্' বাঁচাই ?

৫ই শ্রাবণ। শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।

উভয় সঙ্কট।

—৵৹*৹৵—

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সমাদ্দার "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি" সে বিষয়ে মনস্থির করতে পারছেন না। এই হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার ফলে, শুধু তিনি নন, ইংরাজীশিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই এই উভয় সঙ্কটে পড়েছেন।

সমাদ্দার মহাশয়ের কাছে সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে এই :—একদিকে প্রাণ, অপরদিকে জগৎ—এ উভয়ের ভিতর শিক্ষিত হিন্দুরা কোন্‌টিকে বরণ করবে ?—অবশ্য মনের সঙ্গে জগতের এমন কোন স্পষ্ট শত্রুতা নেই যে, একটির আশ্রয় নিলে অপরটিকে ত্যাগ করতে হবে। জগৎ ধ্বংস হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীমাত্রেরই প্রাণধ্বংস হবে। অপরপক্ষে প্রাণ নষ্ট হলে, জগৎ থাকে কি না থাকে তাতে প্রাণীর বয়ে যায়।

কিন্তু সমাদ্দার মহাশয় জগৎ শব্দটা একটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাছে জগৎ মানে হিন্দুধর্ম্ম, এবং প্রাণ মানে হিন্দু-জাতির প্রাণ। সুতরাং হিন্দুজাতি পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করবে কিম্বা পৈতৃক ধর্ম্ম রক্ষা করবে—এই মহা সমস্যায় পড়েছে।

অবশ্য এ সমস্যা নিরক্ষর হিন্দুদের মনকে কিছুমাত্র বিচলিত করছে না। Mass যে নিরেট, এ কথা physics-য়েও বলে। কিন্তু a. b. c. গলাধঃকরণ করার ফলে যে-সকল হিন্দুর হৃদয়মন ইংরেজদের চাইতেও উদার হয়ে গেছে, তাঁদেরই মনোরাজ্যের

শান্তিভঙ্গ হয়েছে। আমাদের অন্তরে লড়াই বেধেছে—আমাদের মনের শিক্ষিত অংশের সঙ্গে অশিক্ষিত অংশের। বলা বাহুল্য ইংরাজী শিক্ষার পরশপাথরের স্পর্শে আমাদের মন একেবারে খাঁটি সোনা হয়ে যায় নি; যা হয়েছে তার নাম গিল্টি। আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা পাছে আমাদের মনের সেই বিলেতী গিল্টি চটিয়ে দেন, এই ভয়েই আমরা কাতর হয়ে পড়েছি। এ ভয় পাবার কারণও আছে। এই গিল্টির প্রসাদেই আমরা যখন মোক্ষলাভ কর্‌ব ঠিক করেছি, তখন আমাদের মনের সে বিলেতী রঙ চটে গেলে "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা"। কিন্তু আমার মনে হয় এ সমস্যাটা জীবনের সমস্যা নয়—কথার সমস্যা মাত্র। যদি হিন্দুজাতি না থাকে তাহলে অবশ্য হিন্দুধর্ম্মও ত থাক্‌বে না,—একমাত্র পুঁথিপত্রে ছাড়া। অপর পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম যদি না থাকে ত হিন্দুজাতি বলেও কোনও জাতি থাক্‌বে না—এ ত সোজা কথা।

সুতরাং আসল সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, জাতি গঠন করতে হলে হিন্দুধর্ম্মকে সে মহৎ কার্য্যের বাধা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য কি না। এ সমস্যা আমাদের মনের দুয়োরে হাজির হতে বাধ্য—কেননা আমরা প্রত্যেকেই এক একজন nation-builder। ধরুন যদি আমরা হিন্দুজাতি না হয়ে শুধু "জাতি" অর্থাৎ nation হয়ে যাই—তাতে কি ক্ষতি? ইংরাজীতে বলে যে "গোলাপের অন্য নাম দিলেও তার সৌরভ সমান সুমধুর থাক্‌বে"; আমাদেরও হিন্দু নামের বদলে যদি Indian নাম হয়, তাহলে আমাদের গৌরব শুধু সমান থাক্‌বে না, সম্ভবত বাড়্‌বে। আমাদের জীবনতরীর কোনও কোনও কর্ণধার পরামর্শ দিয়েছেন যে, এখন থেকে আমাদের কর্ত্তব্য হবে

এই মন্ত্র জপ করা যে, আমরা হিন্দুও নই মুসলমানও নই। এ অবশ্য একটি মহাবাক্য, কিন্তু এটি গ্রাহ্য করবার একটু মুস্কিল আছে। এ পরামর্শ আমরা শিক্ষিত লোকেরাই শিরোধার্য্য করে নেব; কিন্তু অশিক্ষিত হিন্দুরা এ কথা কানেই তুলবে না, আর এই অশিক্ষিত লোকরা বড় কেও কেটা নয়,—একেবারে জ্যান্ত দরিদ্রনারায়ণ।

তারপর আমরা যদি না-হিন্দু না-মুসলমান হই, তাতেও আমাদের কোনও সুসার নেই। আমরা যে non-Mahomedan আছি, সেই non-Mahomedanই থেকে যাব।

এ অবস্থায় করা কি? যদি আমরা শ্যাম ও কুল দুই রক্ষা করতে চাই, তাহলে আমাদের ধর্ম্মে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং আমাদের প্রাণে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কি করে তা করা যাবে?—God only knows

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নারীর দান।

বুঝি এতদিনে ঠেলি' এত রুদ্ধদ্বার,
বিদেশে হেলায় ঘুরি' এত দীন বেশে
আছে শুধু এক দ্বার মোর পশিবার
মহা এই জীবন-উৎসবে। তুমি এসে,
খুলি সেই দ্বারখানি বরিলে আমায়
নারীরূপ অর্ঘ্যে, তব যৌবনপ্রভাতে,
রবিশশীতারা রাখি সৌন্দর্য্য-থালায়।
বুঝেছি যে সেই তব মধুপাণ্ডু হাতে
বিরহের মহাশেষে পাব এ জীবনে
যে গান সকল গানে আছে গাহিবার;
পাব আমি, দিনে দিনে, সুন্দর ভুবনে
প্রেমিকের পরিপূর্ণ শুভ্র অধিকার।

জানি নারী তুমি জীবনের শ্রেষ্ঠ হর্ষ,
বিধাতার সৃষ্টিকরে পূর্ণ তব স্পর্শ।

জহাঙ্গীর বকীল।

সাধুমা'র কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

•

পরে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দিন আমার কর্ণবেধ হয়ে গেল, তা'তে আর বিশেষ কিছু ধুমধাম হয় নি; আপনা আপনি নিমন্ত্রণ করে আনন্দ লাড়ু পূর্ব্বদিন হয়। পরে পঞ্চমীর দিন কর্ণবেধ হতে আরম্ভ হল। আমাদের কর্ণবেধে ষষ্ঠি মার্কণ্ড পূজা হয়; পরে আমার স্নান হয়ে অধিবাস হল, লালপাড় কাপড় পরে হাতে বড় ২ চারটি সন্দেশ আর চারটি লাড়ু নিয়ে কান বেঁধাতে বসলুম। আমার মনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে কখন কাঁদব না, যতই কষ্ট হোক। বসে গেলুম, বাজনাবাদ্য হতে লাগল, কানটী একটু হাত দিয়ে ডলে নিয়ে বেঁধাতে বসল, আমি স্থির হয়ে রইলুম। মা দিদিমার কিন্তু ভয় হচ্ছে আমি হয়ত কত কাঁদব, কি উঠে কর্ত্তামণির কাছে পালাব, কিন্তু সে সব কিছুই না। তারপর উঠে আবার লাল ফুলপাড় চেলি পরে, গলায় গড়ে মালা দিয়ে, মল, বালা, গলায় হার দিয়ে, চন্দন পরে বরণ হলো। ঠাকুর বাড়ী প্রণাম করতে যাওয়া হল, আর কর্ত্তামণিকে প্রণাম করতে গেলাম; তিনি কেঁদে ফেললেন, তাঁর ঐরকম অসুখ ছিল, বেশী আহ্লাদ হলেই চক্ষু জলে পূর্ণ হত। তিনি আমায় আদরআশীর্ব্বাদ করে বললেন— এইবার মেয়েটিকে কোথায় বিদায় করে দেবার মতলব করছে।

আমার কর্ণবেধের পর ক্রমে ক্রমে আমার উপর কান দুটী ছিদ্র করা হয়, আর মাঝের কান দুটী ছিদ্র হয়; ঐরকমে হয়, কাঁদা কি

গোলমাল কিছু হয় নি। পরে আবার সেই মধু খানসামা একদিন এসে বল্লে—মা, বড় বৌঠাকরুণ বলেছেন এবার নাকটা বিঁধিয়ে দিতে। দিদিমা বল্লেন যে নাক বিঁধতে বলেছেন, ওর টিঁকলো নাক কি না, একটু শক্ত পাটা, লাগবে বলে বেঁধাইনি। এখন তো সব বিবিয়ানা, কেউ নথ পরে না। মধু খুব পাকা লোক, সে বল্লে—না, না, আমাদের বাড়ী সবাই নথ পরে, আমার বাবু নথ, মল, আলতা পরা বড় ভালবাসেন। তখন দিদিমা বল্লেন—তবে দেরী নয়, ফাগুন মাসে দিলে হত, চৈত্র মাস বায়, কাল একটা ভাল দিন দেখে দেব। জিজ্ঞাসাবাদ করে মধু বিদায় নেয়, মাকে ডেকে দিদিমা সব কথা বলেন। তার পরদিন, দিন ভাল ছিল, বাসন্তী পঞ্চমী, আমার নাক বেঁধানো হয়ে গেল; এবার কিন্তু চোখের জল পড়ল, আমার নাকটা বড় শক্ত, খুব লেগেছিল।

এইবার আমার শ্বশুরবাড়ীর কথা। বৈশাখ মাসে ফুলদোলের দিন আমার বড় জা এসে একটা মোহর দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে যান, এর নাম পাকা দেখা। দিন স্থির করে আমার শ্বশুরবাড়ীর পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মশায় আসেন; আর একদিন এসেছিলেন আমার কোষ্ঠি নিতে, আমাকে ডেকে দেখেওছিলেন,—মা আমাদের চমৎকার সুন্দরী বলে ভগবতীর সঙ্গে তুলনা করে যান। পরে দু তিন দিন পর দিদিমা একদিন গিয়ে আমার বরকে আশীর্ব্বাদ করে আসেন। এসে খুব সুখ্যাতি করেন, কেবল বলেন যে একটু পাতলা গড়ন, মুখ চোখ চুল অতি সুন্দর, রংটি হলদে হলদে, খুব ঠাণ্ডা স্বভাব, কথাগুলি আস্তে আস্তে, অতি নম্র ভাব; আর সব ছেলেগুলি নম্রতামাখা, বৌ তিনটীও বেশ, বাড়ী ঘর ভাল, এখন দু হাত এক হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হই।

পরে একদিন ভট্টাচার্য্য এসে বলে যান, ১৩ই আষাঢ় গোধূলি লগ্নে বিবাহ; কোন্ সময় গাত্রহরিদ্রা দিতে হবে, কোন্ সময়ে বাসিবিবাহের যাত্রা, কোন দিন নবধা গমন, সব লগ্নলেখা লগ্ন পত্রিকা দিয়ে যান। পরে মধু এসে আমার মের্জাই চেয়ে নিয়ে গেল, দিদিমাও জুতাজামার মাপ চেয়ে পাঠালেন; একটী এসেন্সমাখা কামিজ আর ফিরোজা পশমের ভরাট সাদা পুঁতির আঙ্গুরফলপাতা দেওয়া জুতা ১পাটী আসে। এ কথাগুলি লিখছি আমার স্মরণশক্তির চিহ্ন বলে; যেটুকু লিখেছি তা সঠিক, অতিরঞ্জিত কথা কিছুই নেই। আমার পিত্রালয়ে আমি এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাব, এর আগে আমার ও-বাড়ীর দিদি শ্বশুরবাড়ী গেছেন; নইলে এনাদের সব কুলীনের ছেলে সুশ্রী দেখে এনে ঘরজামাই রাখা হয়। আমার এইবার নূতন পথ প্রকাশ হবে, আমার নূতন সংসারের মধ্যে বাস হবে, নূতন মানুষদের সঙ্গে মন মিলাতে হবে। এ সব অজানা, আমার স্বভাব, অশন বসন, চলন ভাবভঙ্গী, কথা শয়ন সকলি পরিবর্ত্তন হবে। সব আয়োজন হতে লাগল। আমার বিবাহের সময় আমার পিতামহের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়, ভিতরে ভিতরে খুব ঋণ; এদিকে বাড়ী গাড়ী জমিদারী সব মজুত আছে। ডবল সুদে ঋণ পান, সরকার আর খরচের আমলারাও বেশ ঐ বাবদে উপার্জ্জন করে। তা ছাড়া জমিদারীর টাকাও সুবিধা পেলে লুটতে ছাড়ে না। সংসার দেখতে একমাত্র আমার পিতামহী; পিতামহ বায়ুরোগগ্রস্ত, আর পিতার সংসার বিষতুল্য,—কে দেখে। পাঁচজন অনুগ্রহ করে বিলক্ষণ ব্যয় করে; এমন যে সমস্ত দিন দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর কামাই নেই। এদিকে আমার বিবাহ উপস্থিত, মানের জন্ম কিছু ত দিতে হবে। কিছু

সোনা গা-সাজানো গহনা করতে দিলেন, আর এক সুট রূপার বাসন গড়াতে দিলেন, আর পিতল কাঁসা, পূজার তাঁবার বাসন, খাট বিছানা আলনা দেরাজ জলচৌকী সব একরকম চলনসইগোছ যোগাড় করলেন। তবে এখনকার মত এত খুঁটিয়ে দেবার প্রথাও বেরয় নি; যত দিন যাচ্ছে তত এ ফ্যাশন বেশী বেশী বেরচ্ছে। যতটুকু যার সামর্থ্য, তা যেন একটু অতিক্রম হয়েও উঠছে। তবে আমার বিবাহের সময় দলবৃদ্ধি হয়। আমার শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে পূর্ব্বে দল ছিল না, তাঁদের ত নিমন্ত্রণ হবেই, এ ছাড়া অনেক বাড়ী দল হল। সেজন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের আয়োজন করতে হবে, তার ফর্দ্দ প্রস্তুত হল। একদিন মাছ ভাত হল, সেটা গাত্রহরিদ্রার দিন; আর বিবাহের দিন জলপান। এ ছাড়া ফুলশয্যা পাঠানো, জোড়ে আসা, পরে বিবাহ হয়ে গেলে কুটম্ব খাওয়ানো। এইমত অনেক ফর্দ্দ প্রস্তুত হল, কিছু-না-কিছু-না করেও খাইখরচ ও দানসামগ্রী সব সমেত তিন হাজার টাকা ব্যয় হয় শুনেছিলাম। যাই হোক, ১০ই আষাঢ় আমার গায়-হলুদ হবে, ৯।১০ই থেকে আমার শ্বশুরালয়ের সামাজিক বেরিয়েছিল। সব বাড়ি দিতে দিতে আমাদের বাড়িতে আসে—চারখানা করে পিতলের থালা; তার এক থালায় বাদাম পেস্তা ইত্যাদি নানাপ্রকার মেওয়া, আর এক থালায় বাদামের বরফি, এক থালা মেওয়ার বরফি, আর একখানিতে সন্দেশ আর একটি করে নয়নসুখের থান ছিল। আমার দাদাশ্বশুরম ্ব বড় বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি কিসে লোকের সুবিধা হয়, তার হিসাব বিশেষরূপ জানতেন, বৈষয়িক বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। তাঁর সু-বন্দোবস্তে আমার বিবাহে খুব যশ পেয়েছিলেন। আমার শ্বশুরের ঐ একমাত্র সন্তান; সেজন্য

বেশ ভালরূপ করেই বিবাহ উৎসব নিষ্পন্ন করবার মনন করেন। আর হয়ও তাই। তবে এখনকার ধুমের বিয়ে অন্যপ্রকার, আর তখনকার আর এক ধরণ, কিছু প্রভেদ আছে। পরদিন আবার গায়ে হলুদ এল, তখনকার নিয়মে মাছ, দই, সন্দেশ, ক্ষীর, ফুলমালা আর হলুদ। আর একজন ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদী-চন্দন, ধানদুর্ব্বা, মোহর নিয়ে এলেন; বেশী কিছু দেবার প্রথা ছিল না। এখনকার দিনে এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে, হোক; যখন যেরূপ হাওয়া, তখন মানুষ সেইমত চলে। সেদিন ত খুব বাদ্যবাজনা করে আমার গাত্রহরিদ্রার উৎসব আহারাদি সাঙ্গ হল। দিদিমা নিজে আমায় চন্দনতিলক পরালেন, ঠাকুরের চরণে প্রণাম করে আসা হল; তিনি বুঝি নয়নভঙ্গী দ্বারায় আজ্ঞা দিলেন—যাও, আমি তোমার জন্য সকলি প্রস্তুত রেখেছি, তোমার সকলি সুখের, দেখ যেন দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে হৃদয় অন্ধকার কর না। বাস্তবিক আমার এই ধারণাই দৃঢ়, যে দুঃখ কি? যখন কার্য্য অনুযায়িক ফল পাব, তখন আর দুঃখ কি; সকলি আনন্দ। আনন্দময়ের রাজ্যে যেন এইরূপ আনন্দেই সকল প্রাণী থাকে, হৃদয় পরিষ্কার রেখে আনন্দময়ের আনন্দধামে সদানন্দে থাকে। পরদিন আমার লাড়ুকোটা,—সকালবেলা চাল ধোওয়া, নারিকেল কোরা, তিল ঘসা এই সব রীত হল। প্রায় বেলা ১০টার সময় আমার আয়বুড় ভাত খেতে যাবার নিমন্ত্রণ ছিল দাদামশায়ের বাড়ী। দিদিমা সাজিয়ে চন্দন পরিয়ে বসিয়ে রেখেছেন, পরে তাদের ঝি পাল্কি নিয়ে এল, আমায় নিয়ে গেল।

আমার যাবার পর তাঁরা আমায় নিয়ে দিদিমার ঘরে বসান। তারপর এক এক করে লোক জমা হয়ে সব বসলেন; আমার নাক,

মুখ, চোখের কিছুক্ষণ উদ্বেগ হয়ে মোটের উপর আমি একজন সুন্দরীর মধ্যেই পরিগণিত হলাম। তাঁরা কর্ত্তার কাছে নিয়ে গেলেন, তিনিও দেখে বল্লেন—"বেশত, মেয়েটী খুব শান্ত।" তখন আমি মনে মনে হাসছি যে, এঁরা আজ আমায় শান্ত বলছেন, আমি মাঠে কত দৌড়তে পারি এঁরা ত আর দেখেন নি! পরে আমায় খাওয়াবার জন্য উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি খেতে বসে আস্তে আস্তে একটু একটু করে পোলাওয়ের মাছ, মুড়ার চোখ, মুখে তুল্‌ছি আর সামনে এক এক বার চাইছি; দেখি যে একটী ভুবনমোহন মূর্ত্তি সম্মুখের বারাণ্ডায় রেলের ধারে দাঁড়িয়ে, লাল রংয়ের বেনারসী চেলি পরিধান, খালি গায়ে কাঁধের উপরে পটি-কোঁচানো চাদর, গলায় মুক্তার কণ্ঠী, যুঁই ফুলের গড়ে মালা, কপালে চন্দন কেশরমিশ্রিত, তাতে প্রশস্ত ললাটে লতিকাকারে কুঞ্চিত কেশের অতি সুন্দর শোভা দেখলাম, তার নীচে আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু, খগচঞ্চুর মত নাকটি, কান দুটি যেন ঠিক মানুষের হাতে গড়া, ঈষৎ গোঁফের রেখা, বর্ণটি ঠিক হরিতাল-মাখানো, গঠনটির সুন্দর রমণীয় শোভা, না অতিশয় লম্বা, না বেশী খর্ব্ব। এমন রূপ আমি কখনও দেখি নি, জানি নে যে এমন রূপ মানুষের হয়। তার উপর কি কমনীয় মূর্ত্তি, মৃদু মৃদু হাসিমাখা ঠোঁট দুটি, দাঁতগুলি ঠিক মুক্তার মত। আমি ন' বছরের বালিকা, আমি সুন্দর জিনিষ ভালবাসি, চক্ষুর সামনে সুন্দর সামগ্রী দেখলে কে আর না চায়? আমি জানতুম না যে, এ আমার বর। আমার চেয়ে-দেখা দেখে আমার খাবার কাছে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা সব মুখ-চাওয়া করতে লাগ্‌লেন; আমার তখন সে বিষয়ে কোন দৃষ্টি ছিল না। পরে আমার ছোট দিদিমা যিনি হতেন, তিনি বল্লেন তখনকার তাঁদের আদরের ভাষাতে—

(এখনকার সভ্য জগতে নিন্দনীয় হতে পারে)—"ওলো ও কি, দেখছিস্ কি ?—ও তোর বর"। তখন আমি মুখ হেঁট করলুম, আর সকলে একটু হাসতে লাগলেন। কিন্তু আমার মনে কোন কিন্তু হয় নি। কেনই বা হবে ? আমি প্রথমতঃ বালিকা, তার উপরে আমাদের বাড়ীতে কারো বিবাহ দেখিনি, কিছুমাত্র জানিনে; লজ্জা যে কাকে বলে তাও জানিনে। একমাত্র পাশের বাড়ীর বড়দির ও ছোট্দির বিয়ে দেখেছিলুম, তাও অত খেয়াল নেই; বর হয়েছে, যায়, বেড়ায়, বই পড়ে, ইস্কুল যায়—এই জানি, আর কিছু জানি নে। এখনকার বালকবালিকাগুলি অল্পকালেই এ সকল গূঢ়তত্ব, লজ্জাশীলতা, সাজ-সজ্জা খুব শীঘ্র শেখে; আমার কিন্তু এ বিষয় সকলি অজানা ছিল। আমি প্রায় বেশী সময় পুরুষমানুষের সঙ্গেই অতিবাহিত করতুম। তারই জন্য হোক, কি সমবয়স্কা বেশী ছিলনা বলেই হোক, আমার স্বভাব অনেকটা পুরুষভাবাপন্ন ছিল। যখন বাড়ী এলাম, দিদিমা একবার আমার ঝি'কে সব জিজ্ঞাসা করে নিলেন; সে সব বলে চলে যাবার পর, আমায় কাছে বসিয়ে, যেয়ে পর্য্যন্ত ও ফেরার সময় তক্, কি হল না হল, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন,—তাঁর এই স্বভাব ছিল। সব কথাই হয়েছিল, কেবল আমি বর দেখেছি, এই কথাটি হয় নি,—ওটি আমার মনের মাঝেই খেলা করছিল। আমার বড় আমুদে প্রাণ, এ কথা আমি আগে থেকেই লিখে গেছি, এখন পাঠক-পাঠিকা মাতা পিতারা বিশেষ লক্ষ্য রেখে যাবেন, আমার লেখবার ক্ষমতা কিছুমাত্র নেই, ভাষাজ্ঞান পর্য্যন্ত নেই, আপনারা নিজগুণে দোষ মার্জ্জনা করবেন।

গায়ে হলুদের পূর্ব্ব দিনে, আমায় বাবা সকালে কোর্টের ভিতরে

নিয়ে বেড়িয়ে আনেন, মনুমেণ্ট চড়া হয়, পরে দুপুরবেলা যাদুঘর ও জুলাজিকেল গার্ডেন দেখে আসি। বৈকালে গড়ের মাঠে রোজ যেমন বাজা শুনে বাড়ী ফিরি, সেইমত হয়। কেবল সেদিন কর্ত্তামণি আমার দিকে ভাল করে চাননি, আমার বেশ মনে আছে। আর যদি কোন সময় চার চক্ষু এক হয়েছিল, তাহলে জলপূর্ণ দৃষ্টি। আমি পূর্ব্বেই লিখেছি যে এমন ভালবাসতে কেউ পারবে না আমায়। এখন চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ণ হয়ে পঁয়তাল্লিশে পদার্পণ করলাম, এখনও পর্য্যন্ত আমার কর্ত্তামণির মতন মেজাজের লোক দেখলাম না। পরে আমার লাড়ু কোটা, মাখা, পাকানো, ভাজানো, আবার ঠাকুরের সেবা লাগানো হয়ে গেল; তারপর সব বাড়ী বিলি করা হতে লাগল, ঝাঁকার উপর আট দশ হাঁড়ি বসিয়ে বামুনরা এক এক দিকে গেল। মা এঁরা রাত দুটা পর্য্যন্ত অনেকজন বসে তরকারি বানানো, পান-সাজা করতে লাগলেন। আমার সেদিন আর কি কাজ,—একবার বাইরে একবার বাড়ীর ভিতর এই ঘুরছি। লালপাড় শাড়ী পরা, খোঁপায় একগাছি ফুলের মালা, গলায় একগাছি গোড়ে মালা, হাতে রূপার কাজললতা, পায় চারগাছি মল ঝম্‌ঝম্ করে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার গায়ে হলুদ হয় ১০ তারিখে আর বিবাহ হয় ১৩ তারিখে; মধ্যে দুদিন, একদিন আমার মাসীমার বাড়ী আয়বুড় ভাত খেয়ে আসি। পরে সেদিন গরম গরম লাড়ু দুটি খেয়ে, জলপান খেয়ে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লুম।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে।

(সিংহল হতে নেপাল)

৪।

শান্তিনিকেতন।

[মাদাম লেভির ফরাসী হইতে পূর্ব্বানুবৃত্তি]

জোসেফ যুদ্ধচিন্তামগ্ন সেনাপতির মত তার হুকুম জারি করছে, তার গোলাগুলি বর্ষণের উদ্যোগে ব্যাপৃত রয়েছে, যা'তে করে' কাল ফরাসী প্রতিনিধির অভ্যর্থনায় সাহেব-মেমসাহেবের মানরক্ষা হয়। আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, অভাবপক্ষে মাছ এবং যদি পাওয়া যায়ত পায়রা হলেই খানা একরকম চলে যাবে। সে নির্লিপ্ত-ভাবে জবাব দিলে যে, তিনটে পদ চাইই। যদি কেবল আমরা রুটি ও সোডা পাই, তবেই রক্ষে! এখানকার জলটা বড় সুবিধার নয়, আর মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে আশ্রমের অন্যতম প্রধান নিয়ম ভঙ্গ না করাই ভাল।

২৯ নবেম্বর।—জোসেফ তার কালামুখ উজ্জ্বল করে' ফিরে এল; মাছ পাওয়া যাবে, ষ্টেসনে যে লোককে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, সে একজন জেলেকে পাকড়েছে। খুব সহজ উপায়, সত্যি। কিন্তু মাখন পাওয়া যাবে না, সোডাও পাওয়া যাবে না। ফ্রান্সের প্রতি-নিধিকে লেমনেড খেয়েই থাকতে হবে।

এমন সময় তাঁর সুন্দর গেরুয়া বসন পরে' এসে উপস্থিত হলেন সিংহলের মহাথেরা (দক্ষিণ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সমুচ্চপদস্থ ব্যক্তি)।

তিনি এক বিরাট প্রস্তাব ফলিয়ে তুলেছেন, সেটি এই বৌদ্ধ-প্রবণ ফরাসীর কাছে পেশ করতে চান, এবং তা'তে সিদ্ধিলাভের জন্য এঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। পৃথিবীর বর্ত্তমান ভীষণ বিশৃঙ্খলা, অতি সাজ্জাতিক মনোভাবের পরিচয়, এবং দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশা ও প্রত্যেক হৃদয়ের নিরাশা উপলব্ধি করে' তাঁর মনে হয়েছে যে, কোন কোন শান্তিকামী আত্মা হয়ত এখানে এসে, নির্জ্জনবাসে থেকে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শান্তিদায়ক সত্যের উৎস হ'তে কিছু শমভাব, এমন কি স্বস্তিও লাভ করতে পারেন। কেবল একটা সমিতি গড়ে' তোলা চাই, তা'তে তিনি নিজে, আর ঠাকুরমশায় এবং সি—ও নাম দেবেন ; যদি কোন পাশ্চাত্যদেশীয় এই ডাকে সাড়া দেন, তাঁদের সহজেই আমন্ত্রণ করা যেতে পারবে ; আশ্রমে ত জায়গার অভাব নেই। কেন হবে না?—শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া যে বিশেষ শান্তিপূর্ণ, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম সেখানে কোন আমল পায় না। যে ধ্যানধারণা দিয়ে প্রত্যেকে দিন আরম্ভ করে, সে ধ্যান তারা যে-কোন ধর্ম্মমন্দিরে করতে প্রস্তুত ; কারণ প্রতি ইষ্টদেব, প্রতি নবধর্ম্মের অভ্যুদয় কেবল তাঁরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ,—যিনি এক, যিনি সব, যিনি নেতি।

মধ্যাহ্নভোজনের পর আশ্রমের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন। পি—সাহেব পূর্ব্বে মিশনারী এবং ইংরাজী প্রটেষ্টাণ্ট হলেও আমাদের পাশ্চাত্য মনোভাব বর্জ্জন করেছেন ; তার মধ্যে যে লোভ ও কপটতা প্রকাশ পায়, তা' তিনি দু চক্ষে দেখতে পারেন না। তিনি ১১ বৎসর যাবৎ এখানে বাস করছেন ; রক্তের কিঞ্চিৎ লালপরমাণু বৃদ্ধির চেষ্টায় বিলেত গিয়েছিলেন, সেখান থেকে সম্প্রতি ফিরেছেন ; আর সেই

ঘৃণিত সভ্যতার ধূলা এমন সম্পূর্ণভাবে জুতো থেকে ঝেড়ে ফেলেছেন যে, আর সকলের মত তাঁরও খালি পা ; শিশুর মত সরল, নবীন ও মনোরম এই লোকটি।

তারপর আমরা আশ্রমের হাওয়া-গাড়িতে ফ্রান্সের প্রতিনিধি, কলিকাতাবাসী মঁসিয় লা—র উদ্দেশে বোলপুর যাত্রা করলুম। একজন ফরাসীর সাক্ষাৎ পেয়ে, তাঁর ছোকরার মাথায় তে-রঙা শিরপ্যাঁচ দেখে, আর ফরাসী ভাষায় কথা কয়ে মহানন্দ লাভ হল। তিনি ভারত-সমুদ্রের চারিদিকে এত ঘুরপাক খেয়ে বেড়িয়েছেন যে, জঙ্গলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, এবং সেখানে কেমন করে' থাকতে হয় তাও জানেন ; তিনি বেশ ঠাণ্ডাভাবে তাঁর লেমনেড খেলেন, এবং তাঁকে অতিথিশালায় শুতে যেতে দেখে মনে ভাবলুম যে শক্ত বিছানার দরুণ তাঁর খুব বেশি কষ্ট হবে না ;—কারণ আমার স্বামী যাই বলুন, সেগুলি যে শক্ত, সে বিষয় সন্দেহ নেই।

কবি রাত্রে আমাদের সঙ্গে খেলেন ; আজ তিনি বিশেষ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে লা—র কাছে প্রাচ্যের আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্পের ব্যাখ্যা করলেন ; তারা আমাদের গোব্‌দা জুতা'র তলায় আর পিষ্ট হতে চায় না ; তাদের দর্শনাদি, তাদের সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তথা কৃতজ্ঞতা তারা চায়, অপরাবিদ্যা ও কলকারখানার ভারে মৃতপ্রায় পাশ্চাত্য দেশ তা'র থেকে কিছু প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করতে পারে ; আমাদের বিলাসবাসনা পাগলামী,—যত যুদ্ধবিগ্রহ এবং দুঃখদৈন্যের মূল ; এক কথায়, সেই সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, যা' আজকাল কচিৎ কোন বিশিষ্ট মনীষীর মনে সবেমাত্র উদয় হতে আরম্ভ হয়েছে।

৯

গান্ধী এবং ইনি, একই বিশ্বাস, একই প্রেম, একই নিঃস্বার্থভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও, কিরকম সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান, তা' দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। গান্ধীর মতে, পাশ্চাত্যের সমস্ত শিক্ষা ভুলে যাওয়া, অগ্রাহ্য করা; আদিম যুগের সরলতায় ফিরে যাওয়া, পূরাদস্তুর অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা, শরীর ও মনের নগ্নতা, ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন, ত্যাগ, প্রত্যেকে নিজের কাপড়ের সূতা কাটা ও বোনা (তাঁর ধর্ম্মবীজের এইটেই প্রথম সূত্র)—এতেই ভারতবর্ষের মুক্তি। অপরপক্ষে ঠাকুরমশায়, যিনি সৌন্দর্য্যের পূজারী শিল্পী, যাঁর মনীষা বিশ্বব্যাপী, তাঁর একান্ত বাসনা সকল জাতি এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করবে, পৃথিবীর উভয় খণ্ড ঘনিষ্ঠ সহযোগে সম্মিলিত হবে, বিজ্ঞানকে দাসত্বে বেঁধে মানুষ কলকারখানার সাঙ্ঘাতিক চাপ থেকে নিষ্কৃতিলাভ করবে।

১ ডিসেম্বর।—কবিবরের জ্বর হয়েছে। আশ্রমের নতুন অতিথি এ—আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন,—সাতাশ বৎসর বয়সের এক ইংরেজ যুবক, মার্কিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবে বেরিয়ে এখানকার কৃষিবিভাগ গঠন ও পরিচালনা করতে এসেছেন। গত বৎসর যখন ঠাকুরমশায় মার্কিনে ছিলেন, এই ছেলেটি ভারতবর্ষের প্রতি নিজের ভালবাসা ও ভক্তি জানিয়ে তাঁকে চিঠি লেখে;—যুদ্ধের সময় এক ছুটিতে বুঝি সে শরীর সারতে এখানে এসেছিল। কবি চিরকালই যৌবনের ভক্ত, তিনি তার চিঠির উত্তর দেন, তার সঙ্গে দেখা করেন, এবং এই যুবকের মোহে মোহিত হয়ে তাকে সঙ্গে আনবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তার কিছু পড়াশুনা বাকি ছিল। মাসের পর মাস কেটে যায়, অবশেষে ঠাকুরমশায় তাকে লেখেন যে, নতুন

কোন অনুষ্ঠান ফাঁদ্‌বার মত টাকা তাঁর নেই; ছেলেটি তার করলে যে সে ২৫০০০ ডলার যোগাড় করেছে এবং আস্‌ছে। প্রথম দিনই সন্ধ্যাবেলা সে আমাদের কাছে এল,—চামড়ার চাপ্‌লিপরা খালি পা, শাদা পাজামার উপর জালিকাটা কামিজ, ইংরেজ ভাবুকের নবীন মোহন মুখশ্রী নিয়ে। তার মাথায় নানান জাঁকালো কল্পনা খেল্‌ছে: সে বছরে তিনটে করে' ফসল ফলাতে চায়, সে এমন বলদ চায় যারা' রোগা সুটকে হাড়-বের করা হবে না—বেচারা ভারতবর্ষের গরু!—এমন মুরগী চায়, যারা বড় বড় ডিম দেবে; সব চেয়ে বেশি সে চায় যে হিন্দু চাষারা, যারা এত ভয়ঙ্কর গরীব, তাদের নিজের দেশের উর্ব্বরা মাটির কিছু সুবিধা ভোগ করতে পারবে, জল নিকাশের সুব্যবস্থা হবে, চারদিক পরিষ্কার করা হবে,—জ্বরজ্বালা, অন্ধতা প্রভৃতি যে সব ভীষণ রোগ দারিদ্র্যপ্রসূত, তাদের সঙ্গে লড়াই করা হবে। এখানে বছরকয়েক অথবা চিরজীবন থাকতে সে প্রস্তুত। * * * * * *

২ ডিসেম্বর।—আজ বিকেলে, তিব্বতী ভাষার অধ্যাপনান্তে, কবিবরের কুশলজিজ্ঞাসা করতে যাওয়া গেল। দেখলুম এখনো কাহিল রয়েছেন, তবে তাঁর ঘরে উঠে বসে আছেন। তাঁর ঘর! আমাদের যে-কোন সচিত্র পত্রিকায় তার একটা ফোটো তুলে পাঠাতে ইচ্ছে করে। তাঁর এই কুঠ্‌রীটি, তার খালি দেয়াল, লম্বাচওড়ায় বড় জোর সাত হাত, মেঝেয় মাদুরের উপর যে পাতলা গদি পাতা রয়েছে, মাপে ঠিক তারই সমান,—এর সঙ্গে আমাদের প্রথিতযশা বহুমানাস্পদ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের গৃহসজ্জার একবার তুলনা করা হোক্। তারই পাশে, যে নিভৃত কামরায় তিনি কাজ করেন,

সেটা এতই ছোট যে, তুজনের বেশি সেখানে বসা যায় না। অথচ এই কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে, যিনি এই ভাবে জীবন যাপন করেন, তিনি বিশ্বজ্ঞানের প্রচারকদের মধ্যে একজন; খুব কম লোকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে যে, তাঁর প্রভাব কি সুদূর-বিস্তৃত। এই জীবনের সরলতা কল্পনা করা সহজ নয়; কিন্তু সে সরলতা সুমহৎ শিল্পীর উজ্জ্বল, প্রেমল, আধ্যাত্মিক বৈরাগ্যমণ্ডিত।

৩ ডিসেম্বর।—আজ শান্তিনিকেতনে মহোৎসব, অ্যা—সাহেবের প্রত্যাবর্ত্তন। শুনতে পাই তিনি পনেরো বৎসর কেম্ব্রিজে ধর্ম্মতত্ত্ব এবং গ্রীকল্যাটিনের অধ্যাপনা করে' তারপর লক্ষ্ণৌয়ে আসেন, সেখানে ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে আলাপ হয়, পরে গত বারো বৎসর যাবৎ আশ্রমের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ হয়ে বিরাজ করছেন। ছোটখাটো মানুষটি, পাতলা মুখ দাড়িগোঁফে ভরা, সেই ঝোপঝাড়ের মধ্যে নাকমুখ বেশ টিঁকলো, নীল চোখ দু'টি সুন্দর, এবং মৈত্রীপূর্ণ মুখমণ্ডল হাস্যে উজ্জ্বল।

স্বভাবতঃই তিনি বাঙ্গালী বেশ ধরেছেন—সেই ঢেউখেলানো বেশবিন্যাস, যা'তে করে' এখানকার স্ত্রী-পুরুষ নিজেদের অঙ্গ এমন সুশ্রীরূপে সাজায়; কিন্তু তাদের পরবার শ্রীটি তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি। একদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর দীর্ঘ জলযাত্রার কাহিনী বল্‌লেন, ও সমস্ত শান্তিনিকেতন সন্ত্রস্তভাবে তাঁর চারদিকে ঘিরে বসে' শুনলে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী হিন্দুরা যখন দেখলে যে, শ্বেতাঙ্গদের প্রাপ্ত অধিকার থেকে তারা ক্রমে বঞ্চিত হচ্ছে, তখন তাঁকে তারা ডেকে পাঠালে। কর্ত্তৃপক্ষ তাদের জমি দিতে অস্বীকার করছে, তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে' তুল্‌ছে। অথচ তারা

সৈন্য সরবরাহ করেছে, বুয়র ও জর্ম্মাণদের সঙ্গে লড়েছে; তখন তাদের পরম লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। একদিকে পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক দলের নির্ব্বন্ধ, অপরদিকে হিন্দুদের অনুযোগ, এই দোটানার মধ্যে ফাঁপরে পড়ে' সরকার ভাবলেন যে, তার থেকে উদ্ধার হবার উপায় হচ্ছে হিন্দুদের এমন সব সর্ত্তে আবদ্ধ করা, যা স্রেফ প্রতিষেধেরই নামান্তর। এই ব্যাখ্যাটি বড়ই শ্রুতিকটু, এবং অ্যা—সাহেব এমন ভাবে সেটি বল্লেন, যেন নিজমুখে নিজের পাপ-স্বীকার (confession) করছেন; কিন্তু নিপীড়িত জাতির উল্লেখ করবার সময় "আমরা" কথাটা ব্যবহার করছিলেন।

* * * * * *

কবিবরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বি—ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। চুরাশি বছর বয়সের বৃদ্ধ, ঈগল পাখীর মত পাশ মুখের রেখা। তিনি নিজের ঘরের বারান্দায় বসে আছেন, বাতে হাতের আঙুল বেঁকে গিয়েছে। পরিচিত পাখী আর কাঠবিড়ালী তাঁর গায়ের উপর অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁর পকেটে পর্য্যন্ত দানা ও কুড়ো খুঁজছে, অথচ নিজের তত্ত্বচিন্তায় বিভোর হয়ে তাঁর যেন সেদিকে খেয়ালই নেই। এখানে সর্ব্বসাধারণের কাছেই তিনি বড়দাদা বা বড় ভাই। সি—সম্ভ্রমের সঙ্গে এই জ্ঞানী বৃদ্ধের কথা শুনলেন, যিনি এত পড়েছেন, এত ভেবেছেন, এবং জীবনের সন্ধ্যায় যিনি এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন যে, ভারতবর্ষই জ্ঞানের আদিগুরু।

আমরা সমস্ত আশ্রমের ভিতর দিয়ে ফিরলুম, এবং এই কর্ম্মরত মৌমাছির চাক দেখে আবার বিস্মিত হলুম; আমগাছতলায় ছাত্রেরা গোল হয়ে বসে' পড়াশুনা করছে; প্রত্যেক গাছের তলায় একটি

ছেলে কাজ করছে বা একজন পুরুষমানুষ পড়ছে; ছোট মেয়েরা তাদের উজ্জ্বল রঙের সাড়ি পরে', স্নানের পর ভিজে চুল এলিয়ে পড়ায় যোগ দিয়েছে; এ যেন আমাদের "সরবন্" কলেজের দেয়ালে আঁকা ছবি,—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সূর্য্যকরোজ্জ্বল এবং মনোমুগ্ধকর।

মঙ্গলবার ৬ই কথা হল সকাল সকাল স্থরুলে গিয়ে সেখানকার বাড়ী, জমি, বাগান, গ্রাম প্রভৃতি ঠাকুরমশায়ের সম্পত্তি দেখা যাবে, যেখানে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। দু'ঘণ্টা ধরে খর রৌদ্রে হেঁটে হেঁটে আমরা এই প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড দেখে বেড়ালুম; কাপাস, আখ, নীল, বেড়া-দেওয়া বড় বড় ক্ষেতে ছোট ছোট গাছ, তা'তে অতি মুখরোচক ফল ধরে' রয়েছে, মস্ত সেকেলে বাড়ী, ইতালীয় প্রাসাদের তুল্য; আর পুরণো একটি নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ, রীতিমত দুর্গ, যেখানে ভারি ভারি পাঁচিলের আশ্রয়ে থেকে একটি ইংরেজ ভদ্রলোক অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাস করেছেন, লড়েছেন ও পয়সা করেছেন।

অবশেষে গ্রাম ও মন্দির দর্শন; শেষটি সুন্দর ও ছোট, এবং খোদাই-করা পোড়ানো ইঁট দিয়ে সাজানো, তা'তে রামায়ণের প্রধান প্রধান ঘটনা চিত্রিত। সেটি জমিদারের বাড়ী,—থুড়ি, প্রাসাদের অন্তর্গত। গ্রামসুদ্ধ লোক এই ফরাসীটিকে ঘিরে দাঁড়ালে, তিনি এই পুরণো ভাস্কর্য্য যেন বইয়ের মত পড়ে' যেতে লাগলেন; তারা তাঁকে একটা মোড়া এনে দিলে, ও সেই সঙ্গে একটা কুকুরকে লাথি মেরে তাড়ালে,—সে মন্দিরের সিঁড়িতে উঠ্‌ছিল, এত বড় তার আস্পর্দ্ধা! তারা গর্ভমন্দিরের দ্বার খুলে দিলে, যেখানে প্রাতঃপূজার ফুল ও ভস্মে ঢাকা শিবলিঙ্গ বন্ধ ছিল। জমিদার বাবুর সমস্ত

স্ত্রী-পরিবার এই বিদেশী আগন্তুকদের উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল,—তাদের রহস্যময় ঘোমটার আবরণ তুলে ধরে', এবং থাম ও দেয়ালের অংশ বা আধখোলা দরজার আড়ালে নিজেদের কমবেশি গোপন করে'। এরাই যদি এই মস্ত বড় লোকের সঙ্গিনীদল হয়, তাহলে এলোথেলো বেশে বড় যুৎসই বলে' মনে হল না।

(ক্রমশঃ)

চুপ চুপ।

—— ✻ ——

সেদিন বঙ্গবাণীতে দেখলুম, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে, আজকাল মুখ ফুটে কোনও কথা বলা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কেউ যদি এমন কোনও কথা বলতে উদ্যত হয়, যা পলিটিক্‌সের মামুলি বুলি নয়—তাহ'লেই চারিদিক থেকে বিজ্ঞ পলিটিসিয়ানরা ব'লে ওঠেন "চুপ চুপ"।

পলিটিসিয়ানদের স্বধর্ম্মই হচ্ছে,—কাউকে এমন্ কোনও কথা বলতে না দেওয়া, যা তাঁদের কথার পুনরাবৃত্তি নয়। মানুষে যাকে গবর্ণমেণ্ট বলে, সে বস্তু ত পলিটিক্সের একটা অঙ্গ বই আর কিছুই নয়, এবং প্রকৃতপক্ষে সব চাইতে বড় অঙ্গ। আর সকল দেশে সকল যুগে গবর্ণমেণ্টের প্রয়াস হচ্ছে—নীরবতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রবৃদ্ধ হওয়া।

আর গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার উদ্দেশ্যে দেশে যে-সকল পলিটিকাল সঙ্ঘ গঠিত হয়, সে সবও নৈসর্গিক নিয়মে গবর্ণমেণ্টের হালচাল অবলম্বন করতে বাধ্য; কারণ, সে সব সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একদিন না একদিন গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। সুতরাং এমন কোনও কথা তাঁরা কাউকে বলতে দিতে চান না, যাতে ক'রে তাঁদের চলতি পথে বাধা ঘটে।

এইটিই যে পলিটিক্‌সের সনাতন ধর্ম্ম, সে কথা স্বয়ং মাকিয়াভেলি

আজ পাঁচশ' বৎসর আগে ব'লে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, যে পলিটিসিয়ানের দল একদিন গবর্ণমেণ্ট হবার আশা রাখে, তাদের জানা উচিত যে, লোকমত তারা উপেক্ষা করতে বাধ্য, এবং সে মতকে ছলে বলে কৌশলে চেপে দেবার চেষ্টা তাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। এতে ভয় পেলে তারা কস্মিনকালে শাসনকর্ত্তা হ'তে পারবে না। কারণ, শাসনকর্ত্তার কাজই হচ্ছে জনসাধারণকে শাসন করা, তাদের সঙ্গে প্রেম করা নয়। মাকিয়াভেলির মতামত একালে অসাধু ব'লে গণ্য। কিন্তু তাঁর দুর্নীতির কথা আজও যে লোকে শোনে তার কারণ, সে সব কথা একেবারে অসত্য নয়। অপরকে চুপ করবার হুকুম কিন্তু একমাত্র পলিটিসিয়ানরাই দেন না। যেমন এক দলের লোক রাজ্যের দোহাই দিয়ে অপরের মুখ বন্ধ করতে চান, তেমনি অন্য দলের লোক, কেউ বা নীতির দোহাই দিয়ে, কেউ বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমাদের ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে থাকতে আদেশ দেন। অর্থাৎ যাঁরাই পৃথিবীর কোনও একটা মহৎ ব্যাপার নিয়ে কথার ব্যবসা খোলেন, তাঁরাই কথা-বস্তুকে একচেটে করতে চান। কারণ এ ভয় তাঁদের মনের ভিতর চব্বিশ ঘণ্টা জাগে যে, কে কোথায় কোন সত্য কথা ফস্ ক'রে ব'লে ফেলবে, আর অমনি তাঁদের ব্যবসা মারা যাবে।

এ প্রবৃত্তির সঙ্গে ঝগড়া করা বৃথা, কেননা এটা হচ্ছে মানুষের একটা আদিম প্রবৃত্তি। আমরা কি দিনে দু'বেলা ছোট ছেলেদের বলি নে—"চুপ চুপ"? আর তার কারণ কি এই নয় যে, তারা অস্থানে অসময়ে এমন সব সত্য কথা ব'লে বসে, যার দরুণ আমাদের বিপদে পড়তে হয়?—সত্য কথাটা যে মারাত্মক, তা যিনিই

ছোট ছেলে নিয়ে ঘর করেছেন, তিনিই জানেন। এখন আমাদের মধ্যে যদি এক দল এমন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক থাকেন, যাঁরা আর সকলকে কাণ্ডজ্ঞানহীন ছোট ছেলে বলে' মনে করেন, তাহ'লে তাঁরা উঠতে বসতে আমাদের মুখে হাত দিতে বাধ্য, কেননা তাঁরা পরম কৃপাবশতঃ লোকহিতের জন্য দল গড়তে বাধ্য। আর যাঁরা দল বাঁধেন, তাঁরাই তাঁদের মতামতকে শৃঙ্খলিত করতে বাধ্য, এবং যে মত তাঁদের গড়া শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে নি, তাকেই উচ্ছৃঙ্খল বলতে বাধ্য। দল বাঁধাটাও মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি, একালের মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা যাকে বলেন herd instinct; এ মনোবৃত্তির পরিচয় সর্ব্বপ্রকার জীবের মধ্যেই পাওয়া যায়। মানুষে যাকে বলে দল, সে বস্তু হচ্ছে পশুরা যাকে বলে "পাল"—তারই মানব সংস্করণ।

সুতরাং "চুপ চুপ" আদেশে আর কারও কোনও ক্ষতি নেই,—সেই অল্পসংখ্যক লোকের ছাড়া, যারা নিজের আত্মাকে কোনওপ্রকার দলের অন্তরে বিলীন করতে পারে না। এ শ্রেণীর দু' দশ জন লোক সব দেশে সব যুগেই থাকে। আর তারা সব বিষয়ে সত্য কথা বলবার জন্য লালায়িত। এ শ্রেণীর লোকদের সব দলের দলপতিরা, আর সেই সঙ্গে তাঁদের অনুচররা চিরকালই ভয় করেন; অন্ততঃ তাঁরা এ ভরসা পান না যে, এরা দেশকাল বিবেচনা ক'রে কথা কইবে, বরং ভয় পান যে ছোট ছেলের মত যখন যা মনে হয়, এরা তাই ব'লে বসবে। এ আশঙ্কা অমূলক নয়। যে সত্য কথা বলতে চায়, তাকে সে কথা বেপরোয়াভাবেই বলতে হবে। সত্য কথার ফলাফল কি হবে, সে কথার বিচার করতে বসলে কথা বলা যায়, কিন্তু সত্য বলা যায় না। গীতার একটি বচন একটু বদলে নিলে দাঁড়ায় এই

যে,—মানুষের সত্য কথা বলবার অধিকার আছে, কিন্তু "মা ফলেষু কদাচন"। "যোগস্থ বদ বাক্যানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়",—এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করবার যাঁর সাহস নেই, তাঁর সত্য কথা বলবারও অধিকার নেই। এর প্রমাণ দর্শনের বিজ্ঞানের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। আর পলিটিক্‌সই বল, ধর্ম্মই বল, ও দুয়ের কোনটিই দর্শন-বিজ্ঞানের অধিকারবহির্ভূত নয়। সুতরাং যাঁর ইচ্ছে, তিনিই নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে যা সত্য ব'লে মনে করেন, অবাধে তাই বলতে পারেন, যদি না তিনি কোনও দলবলের চোখ-রাঙ্গানি অথবা চোখ-ঠারা দেখে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। জনৈক পেশাদার অভিনেতা আমাকে একবার বলেছিলেন যে, রঙ্গমঞ্চে উঠে দর্শক-শ্রেণীকে বাঁদর মনে করলেই নির্ভয়ে ফূর্ত্তিসে act করা যায়। কথাটা যদি সত্য হয় ত, আমার মতে একঘরে লেখকরা যদি দলকে herd ব'লে চিন্‌তে পারেন, তাহলেই তাঁদের কলম ফূর্ত্তিসে চলবে।

সে যাই হোক, "চুপ চুপ" আদেশটা আজকালকার দিনে মানাও কঠিন, এবং মানা সঙ্গত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

বৈষ্ণবরা বলেন ঃ—

"বিষয়-বালিসে আলিস্‌ রেখো,
দেখো যেন ঘুমায়ো না।"

আমরা দেশসুদ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় গোটাকতক পলিটিকাল বুলির বালিসে আলিস্‌ রাখতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আর সেই জন্য দুদিন আগে সেই বুলির বিরুদ্ধে কেউ কিছু বল্‌তে গেলেই সহৃদয় লোকেরা অমনই তাদের ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলতেন "চুপ চুপ"। কথা

কইলেই যে সকলের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আর আধ্যাত্মিক লোকেরা এ কথাও আমাদের বুঝিয়েছেন যে, এ ঘুম যে-সে ঘুম নয়, একেবারে যোগনিদ্রা। আমরা যারা বিশ্বাস করি নি যে, শিক্ষিত সমাজ স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বরাজ্যে গিয়ে পৌঁছবে, আমরাও বেশি কিছু উচ্চবাচ্য করি নি, কারণ জানতুম যে, দেশের লোকের যোগনিদ্রা ভাঙ্গানো আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে অসাধ্য।

তারপর একদিন মুসলমানদের এক ধাক্কায় হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। ফলে আমরাও বেশির ভাগ লোক এখন হতভম্ব ভাবে চোখ রগড়াচ্ছি, আর জনকতক ঘুমের ঘোরে সেই সব পুরানো বুলিই এলোমেলোভাবে আওড়াচ্ছেন। এ অবস্থায় যাঁদের দস্তুরমত চোখ খুলেছে, তাঁদের মনে নানা কথা উদয় হচ্ছে। এ সময়ে "চুপ চুপ" বলার সার্থকতা নেই। যারা জেগে উঠেছে, তারা সে আদেশ মানবে না। আজকের দিনে যাঁরা নিজের মনের কথা বলতে পারেন, তাঁদের কথাই আমরা শুনতে চাই, আর তাঁদের কথাই শোনবার যোগ্য। তাঁরা কথা কইতে আরম্ভ করলে, চুপ-চুপ-ওয়ালারাও চুপ হয়ে যাবে। আর এ কাজ লেখকেরা নির্ভয়ে করতে পারেন। সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলাকওয়ার ফলে, স্বরাজের তারিখ এগিয়ে না আসুক, অন্ততঃ পিছিয়ে যাবে না।

বীরবল।

দশম বর্ষ, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

গাছ।

—:*:—

গাছের ফল।—যে সব গাছে ফুল হয়, সেই সব গাছেই ফুল থেকে ফল হয়। আমরা মনে করি ফলের শাঁসটাই হচ্ছে সব, বীচিটা কিছুই নয়; কিন্তু গাছের কাছে ফলের বীচিটাই হচ্ছে সব, শাঁসটা কিছুই নয়। বীচিকে বুকে করে মানুষ করবার জন্যই ফলের শাঁস আর খোসা।

দু' একটা গাছ আছে, যাদের ফুল থেকে ফল না হয়ে কেবল বীচিই হয়; কিন্তু সেই সব আগ্‌লা বীচি প্রায়ই পোকা-পাখীতে খেয়ে ফেলে। যতদিন বীচি কচি থাকে, যতদিন না তার গায়ের খোলা শক্ত হয়ে ওঠে, ততদিন তাকে ঢেকে লুকিয়ে রাখবার জন্য ফলের শাঁস আর খোসার দরকার। একটা কচি আমকে চিরলেই দেখতে পাবে তার কসিটী কত নরম—আর সেই কসির গায়ের খোলা কত পাতলা। কসিটীকে বের করে বাইরে ফেলে দাও—অম্‌নি হয় তাকে কাকে ঠুক্‌রে খাবে, নাহয় গরু ছাগলে মুখে পূরবে; কিন্তু কচি আমটাকে বাইরে ফেলে রাখ, কাকেও ঠোক্‌রাবে না, গরুছাগলেও খাবে না। সে বিষ টক—তার গা দিয়েও টক গন্ধ ছাড়ছে; তা ছাড়া সে যদি গাছে ঝোলে, তাহলে তাকে ফল বলে চিনতেই বা পারে কটা জন্তুতে?—সে তার সবুজ রং নিয়ে বেমালুম পাতার সঙ্গে মিশে থাকে।

ফল পাকলে তার গায়ে ফুলের পাপড়ীর মতই লাল নীল হলদে নানান্ রং দেখা দেয়, আর একটা মিষ্টি গন্ধও অনেক পাকা ফল থেকে ভুর্‌ভুর্ করে বেরোয়। এই রং আর গন্ধ ফুলের মধ্যেও যেখান থেকে আসে, ফলের মধ্যেও সেইখান থেকে আসে। গাছের ভিতরে গাছ-সবুজের মত গাছ-লাল, গাছ-নীলও আছে, আর সুগন্ধী গাছ-তেলও গাছের মধ্যে অনেক তৈরী হয়; যার জন্য শুধু ফুলফলে কেন, লেবু, দারচিনি, পানকর্পূরের মত অনেক গাছের পাতা দিয়েও সুগন্ধ বের হয়।

ফুলের রং আর গন্ধ কি কাজে লাগে তা তোমরা বুঝেছ; কিন্তু পাকা ফলের রং আর গন্ধ দিয়ে যে গাছের কি কাজ হয়, তা একটু পরেই যখন গাছের বীচি চড়ানোর কথা বল্‌বো, তখন বুঝ্‌বে।

একটা গাছে যত ফল ধরে তার সবই কিছু শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে না—বেশীর ভাগই কচি বেলায় ঝরে পড়ে যায়। তোমরা হয় ত মনে কর ফলগুলো রোদের তাপেই ঝরে পড়ছে—কিন্তু তা নয়। গাছ তার সব ফলে রস জোগাতে পারে না। সে জানে তার কতখানি রস আছে, আর তাই দিয়ে সে কতগুলো ফলকে খাইয়ে বড় করতে পারবে। সে সেইগুলোকেই বেছে নিয়ে তাদের গোড়াতেই রস চালান করে—বাদবাকি ফলগুলো রস না পেয়ে শুখিয়ে ঝরে যায়।

ফুলের রেণু যখন গর্ভদানার সঙ্গে মেশে, তখনই সেই রেণু আর গর্ভদানা মিশে বীচি হয়; কিন্তু ফুলের কোন্ জিনিষটা বদ্‌লে ফল হয়? আর কি করেই বা রেণু গিয়ে গর্ভদানার সঙ্গে মেশে?

আগেই বলেছি গর্ভ দেখতে অনেকটা কুঁজোর মত। কুঁজোর যেমন মুখ আছে, গলা আছে, পেট আছে—গর্ভেরও তেমনি আছে।

গর্ভের মুখকে বলে গর্ভমুখ, গলাকে গর্ভনলী, আর পেটকে গর্ভখোল। গর্ভখোলের মধ্যে আবার গর্ভথলি আছে, আর সেই গর্ভথলির মধ্যে থাকে গর্ভদানা। একটা গর্ভখোলের মধ্যে কখনো একটা গর্ভথলিও থাকে, কখনো বেশীও থাকে। বেশী গর্ভথলি থাক্‌লে সেগুলো পাশাপাশি কুঠ্‌রীর মত সাজানো থাকে। কি গর্ভথলির মধ্যে অনেক গুলো করে গর্ভদানা থাকে।

গর্ভমুখ হতে গর্ভথলি পর্য্যন্ত যাবার সরু সরু রাস্তা আছে। গর্ভমুখ দিয়ে একরকম চট্‌চটে রস বেরোয়, যার জন্য গর্ভমুখে রেণু পড়লে তা আর নড়তে পারে না, বরং ভিজে ফুলতে থাকে। তারপর ঐ রেণুটী সূতোর মত লম্বা হয়ে গর্ভনলী দিয়ে নাম্‌তে থাকে, এবং শেষকালে গর্ভথলিতে পেঁাছে যেটী সব চেয়ে বড় গর্ভদানা তার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। যেম্‌নি এক হয়ে যাওয়া, অম্‌নি গর্ভদানাটি বীচি হয়ে দাঁড়াল। বীচিও পুরুষ্ঠ হতে লাগলো, অমনি গর্ভথলিও বাড়তে লাগলো, গর্ভখোলও বাড়তে লাগ্‌লো। গর্ভথলি বাড়লেই হয় বীচির খোলা, আর গর্ভখোল বাড়লেই হয় ফলের খোসা। গর্ভ-থলি আর গর্ভখোলের মধ্যে যে ফাঁকটুকু আছে, তাই ক্রমে ভরাট হয়ে ফলের শাঁস হয়ে যায়। গর্ভমুখসুদ্ধ গর্ভনলীটা, ফল একটু বড় হলেই ফলের গা থেকে খসে পড়ে যায়। দু' একটা ফলে আবার খসেও না। কচি লাউএর পিছনে যে ফুলটা ঝোলে, কি ভুট্টার মাথায় যে টিকীর মত আঁস্‌টাগুলো ওড়ে, সে ঐ গর্ভনলী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন ধর একটা গর্ভমুখে একটা রেণু না পড়ে তিন চারটে রেণু পড়লো। সেই তিন চারটে রেণুই কি গিয়ে গর্ভদানার সঙ্গে মিশবে?— না। সব রেণুগুলোই গর্ভনলীর ভিতরকার এক একটা রাস্তা দিয়ে

সূতোর মত হয়ে ছুটলো বটে, কিন্তু যেটা সব চেয়ে তেজী, সব চেয়ে জোরালো, সে-ই বাজী জিতলে, সে-ই আগে গিয়ে গর্ভদানার সঙ্গে মিশ্‌লো। অন্য সূতোগুলো মিশতে না পেরে শুখিয়ে মরে গেল—কখনো কখনো বা দু'একটা ছোট গর্ভদানার সঙ্গে মিশ্‌লে। যে গর্ভে অনেকগুলো গর্ভথলি থাকে, সে গর্ভের ফি গর্ভথলিতেই অন্ততঃ একটা করে রেণু-সূতো ঢোকে, অন্তত একটা করে বীচি হয়।

লেবু, পেয়ারা, পেঁপে, তরমুজ, মটর—এই সব ফুলের ফি গর্ভেই অনেকগুলো করে গর্ভথলি আছে; তাই এই সব ফলের মধ্যে এক রাশ করে বীচি। জবাফুলে পাঁচটা গর্ভথলি, আর কাপাসফুলে তিনটে গর্ভথলি আছে।

একটা কমলালেবু ছাড়ালে যতগুলো কোয়া দেখতে পাও, তার ফি কোয়াটাই এক একটা আলাদা গর্ভথলি থেকে হয়েছে। পেয়ারা তরমুজের মধ্যে আলাদা কোয়া বলে কিছু টের পাবার জো নেই, তার মানে কোয়াগুলোর ভিতরকার পাঁচীল গলে যাওয়াতে কোয়া-গুলো জুড়ে এক হয়ে গেছে। কিন্তু বীচিগুলো সব আলাদাই আছে।

যে সব ফুলে একটা গর্ভের বদলে অনেকগুলো করে গর্ভ থাকে, সে সব ফুলের ফি গর্ভ হতেই একটা করে ফল হয়, আর ফি ফলের মধ্যেই অন্তত একটা করে বীচি থাকে। একটা কাঁঠালকে একটা আস্ত ফল বলে মনে হলেও, সে বাস্তবিক তা নয়। তার ফি কোয়াটাই এক একটা আস্ত ফল। আনারস, আতা, তুঁত, এ সব ফলও ঠিক তাই—অনেকগুলো ফল একটা খোসা দিয়ে ঢাকা। আনারসের এক একটা চোখ, আতার এক একটা ডুম্‌কিই এক একটা আলাদা ফলের চিহ্ন।

গাছ চায় তার অনেক বীচি হোক্, আর ফি বীচিটাই যেন জোরালো হয়। এই জন্যই একটা গর্ভের মধ্যে সব সময় একটা গর্ভথলি থাকে না, অনেক গর্ভথলি থাকে। এই জন্যই একটা গর্ভথলিতে অনেক গর্ভদানা থাক্‌লেও, এবং একটা গর্ভমুখে অনেক রেণু পড়লেও, সবচেয়ে জোরালো রেণুটা গিয়ে সব চেয়ে বড় গর্ভদানার সঙ্গে মেশে।

আম, কুল, লিচু, সুপারীর ফি বীচিটাই একটা আলাদা ফলের মধ্যে থাকে। কিন্তু একটা ফলের মধ্যেই যদি অনেকগুলো বীচি পোরা যায়, তাহলে সেটা কত সুবিধার। বীচিগুলোও ঢাকা রইলো, ফলও তৈরী করতে হল কম; কেননা বেশী বীচিই গাছের দরকার, বেশী ফল নয়। এই জন্যই লেবু, পেয়ারা, বেগুন, লঙ্কা, সীম, সরষের মত ফল তৈরী করে গাছ খুবই বুদ্ধি দেখালে।

কিন্তু সে তার চেয়েও বুদ্ধি দেখালে কাঁঠাল আনারসের মত ফল তৈরী করে। একটা গর্ভের মধ্যে অনেক গর্ভথলি থাকলে একটা গর্ভখোলই তাদের ঢাকতে পারে; কিন্তু অনেকগুলো গর্ভের অনেকগুলো গর্ভথলি যখন একটা গর্ভখোল দিয়ে ঢাকা পড়ে, তখন সেটা বাস্তবিকই অবাক কাণ্ড বটে। বিশ পঞ্চাশটা গর্ভখোলের একটা গর্ভখোল হয়ে মিশে যাওয়া বড় সোজা কথা নয়।

ফুল হতে যখন ফল হয়, তখন ফুলের ভিতর-পাপড়ীও যেমন খসে পড়ে, বার-পাপড়ীও তেমনি খসে পড়ে; কিন্তু দু' চারটি ফুলের ভিতর-পাপড়ী খসলেও বার-পাপড়ী খসেনা—বার-পাপড়ী ফলের গায়ে লেগে থাকে। বেগুনফুলের বার-পাপড়ী এইরকম। পেয়ারাফুল আর ডালিমফুলের বার-পাপড়ী ফলের মাথার দিকে দেখা যায়। টেঁপারি

ফুলের বার-পাপড়ী—ফলের উপরকার খস্‌খসে ঢাক্‌নি হয়ে যায়। পানিফলের শিংগুলোই তার বার-পাপড়ী।

এ সব বার-পাপড়ী ফলের গায়ে লেগে থাক্‌লেও, এদের ফল বলে ভুল করবার কোনই কারণ নেই। কিন্তু চালতার বেলায় তোমরা নিশ্চয়ই সে ভুল করে থাক। তোমরা জান সমস্ত চাল্‌তাটাই একটা ফল—কিন্তু তা নয়। চাল্‌তার ভিতরে যে বীচিতে ভরা লাল্‌সে জিনিষ থাকে, সেই হচ্ছে চালতার ফল; আর চাল্‌তার যে অংশটা আমরা কুটে অম্বল রেঁধে খাই, সেই হচ্ছে চাল্‌তার বার-পাপড়ী। বার-পাপড়ীগুলো খুব বড় আর শাঁসালো হয়ে ফলটাকে ঢেকে রাখে বলে, তোমরা বার-পাপড়ীগুলোকেই ফল বলে ভুল কর।

কোন কোন ফলের আবার বোঁটাটাই তোমরা ফল বলে জানো। বোঁটাটা ফেঁপে মোটা হয়ে ফলটাকে প্রায় গিলে ফেলে—কাজেই বোঁটাটাই ফল বলে চলে যায়। ডুমুরের বোঁটার চাকটাই বীচিসুদ্ধ ফলগুলোকে ভিতরে পূরে ডুমুর হয়ে দাঁড়ায়। নাস্পাতির ভিতরে যে কচ্‌কচে শক্ত জিনিষটা পাও—সেই হচ্ছে তার ফল; আর যা তোমরা নাস্পাতি বলে খাও, সে হচ্ছে তার শাঁসালো বোঁটা। হিজ্‌লি বাদাম (আমকুসি) বোধহয় তোমরা খেয়ে থাকবে। এ ফলের তলার দিকে যে ছোট্ট আঁঠির মত জিনিষটা বেরিয়ে থাকে, সেই হচ্ছে আসল ফল; আর উপরদিকের যে বড় শাঁসালো জিনিষটাকে তোমরা ফল বলে জানো, সেটা ফলের বোঁটা।

যে কাজের জন্য ফলের শাঁসের দরকার, সে কাজ যদি কোন ফলের শাঁস না করতে পারে, তাহলে কাজেই তার বোঁটা কিম্বা বার-পাপড়ী শাঁসের মত হয়ে সেই কাজটা করে দেয়।

বীচি ছড়ানো।—তোমরা জানো ফলের মধ্যে বীচি থাকে —আর বীচি মাটিতে পড়লেই গাছ হয়। কিন্তু গাছের সব ফল যদি খসে গাছের তলাতেই পড়তো, তাহলে সেখানে বীচির ডাঁই হতো, আর সেই বীচি থেকে যে সব চারা বেরতো, তারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি, জড়াজড়ি করে মরতো। একেত ধাড়ী গাছটার আওতায় পড়ে কেউই ভাল করে আলো পেত না, তার উপর একই মাটী থেকে রস টান্‌তে গিয়ে কেউই ভাল করে রস পেতোনা—কাড়াকাড়িই সার হতো; ফলে, দুদিন বাদেই সব চারাগুলো গরীবের ঘরের উপোষী ছেলেদের মত শুখিয়ে মরে যেতো। তাই গাছ নানা ফন্দীতে তার বীচিগুলোকে তফাৎ তফাৎ ছড়িয়ে দেয়। * আতা গাছ আর ডেঁয়া গাছ তাদের ফলগুলোকে করেছে থস্‌থসে নরম। যেই সেগুলো উঁচু ডাল থেকে থপাস্ করে মাটিতে পড়ে, অম্‌নি বীচিগুলো যায় ছড়াৎ করে চার পাশে ছিটকে। কিন্তু এতে আর বীচি কত দূরেই বা যাবে? তাই দোপাটী, আমরুল, অপরাজিতা, কালকাসুন্দে, দুপুরে (সূর্য্যমণি)—এইরকম কতকগুলো গাছ তাদের ফলের মধ্যে এক কল খাটিয়েছে। তারা ফলগুলোকে করেছে সুঁটির মত, কিন্তু এক একটা সুঁটি কড়াইসুঁটির মত এক একটা আস্ত খোসা দিয়ে তৈরী নয়, পাঁচ সাতটা টুক্‌রো খোসা দিয়ে। বীচি পুরুষ্ঠ হলেই সুঁটিগুলো ফাটতে থাকে, আর তাদের টুক্‌রো খোসাগুলো ঘড়ির স্প্রিংএর মত গুটিয়ে যায়। এই গুটোবার

---

* শোনা গেছে কোন কোন গাছের বীচি দু'হাজার মাইল তফাতে গিয়েও গাছ হয়েছে।

জোরেই ভিতরকার বীচিগুলো বন্দুকের ছর্‌রার মত ছিট্‌কে যায়। এদেশের বনে জঙ্গলে যে পট্‌পটে ফলের গাছ হয়, তার বীচিও ঠিক এই কায়দায় ছড়ায়। ফলের উপরে একটু জলের ছিটে দিলেই তার বীচিগুলো ফট্‌ফট্‌ করে ফেটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পোস্ত আর ট্যাঁড়সের খোসা স্প্রিংএর মত গুটোয় না বটে, কিন্তু এম্‌নি ভাবে ফেটে যায় যে, দেখ্‌লে মনে হয় কেউ ছুরি দিয়ে তাদের গা চিরে দিয়েছে। এই দুই ফলেরই বোঁটা হয় খুব লম্বা। হাওয়ার জোরে, কি জন্তুজানোয়ারের গায়ে বেধে ডালটা যদি নুয়ে যায়, তাহলে সোজা হবার সময় বোঁটার গায়ে এম্‌নি ঝাঁকি লাগে যে, সেই ঝাঁকির চোটেই খোসার ফাটল দিয়ে বীচিগুলো গুল্‌তির মত ছিট্‌কে বেরোয়। দক্ষিণ আমেরিকায় বাঁদরের খাবার ঘণ্টা (মঙ্কিজ্ ডিনার-বেল্) বলে একরকম ফল আছে, যার মধ্যে অনেকগুলো করে খোপ্ থাকে, আর ফি খোপে একটা করে বীচি। ফল পাকলেই এক একটা খোপ পিস্তলের মত শব্দ করে ফাটতে থাকে, আর মারবেলের মত শক্ত শক্ত বীচিগুলো এমন জোরে ছুট্‌তে থাকে যে, চোখে লাগলে চোখ কানা হয়ে যায়। রাখাল-শঁসার বীচি ছড়ানো আরো মজার। তার বোঁটাটা থাকে বোতলের ছিপির মত ফলের মুখে বসানো। ফল পেকে উঠলেই ভিতরকার রসটা সোডাওয়াটারের জলের মত উপর দিকে ঠেলা দিতে থাকে। সেই ঠেলার চোটে যেই বোঁটাটা ভট্ করে খুলে যায়, অমনি রসটা পিচ্‌কিরি দিয়ে ছুটে বেরায়—আর সঙ্গে সঙ্গে বীচিগুলোও চারপাশে ছিট্‌কে পড়ে। 'উইচিংড়ে জই'-এর নাম তোমরা আগেই শুনেছ। এই জইগুলো আর এক কায়দায় গাছ থেকে তফাতে যায়। যেই এরা খসে পড়ে, অম্‌নি লম্বা লম্বা

ঠ্যাং বাড়িয়ে হাঁটতে থাকে। তার মানে তারা যে হঠাৎ মাকড়সার মত হামাটানা জীব হয়ে ওঠে, তা নয়। তাদের ঠ্যাং দুটোর গায়ে একরকম শোঁয়া আছে। যেই হাওয়াতে জোলো গ্যাস (বাষ্প) একটু বাড়ে, অমনি শোঁয়াগুলো হয় লম্বা; আর যেই একটু কমে, অমনি শোঁয়াগুলো হয় ছোট। এইরকম একবার ছোট একবার বড় হবার জন্যই জইগুলো সামনের দিকে এগিয়ে যায়—কিন্তু পিছু হটতে পারে না। তারপর কোন একটা জিনিযে বেধে গিয়ে যখন আর এগোতে পারে না, তখন সেইখানেই গেড়ে বসে কলাতে আরম্ভ করে।

কিন্তু এ সব কায়দাতেও গাছের বীচি বড় বেশীদূর যায় না—খুব বেশী যায় ত ত্রিশ হাত। তাই কোন কোন গাছ নিজে না বীচি ছড়িয়ে, পরকে দিয়ে ছড়ায়। যারা বাতাসকে দিয়ে বীচি ছড়ায়, তারা কেউ কেউ বীচিগুলোকে করেছে গুঁড়ো গুঁড়ো আর হাল্কা—যেমন নটেশাক আর অর্কিড। যেই বীচিগুলো ফাটে, অমনি ফর্‌ফর্‌ করে চারদিকে উড়ে যায়।

কোন কোন গাছের বীচির গায়ে রেশমী শোঁয়া লাগানো। যেই ফল ফেটে বীচি বেরোয়, অমনি সেগুলো বেলুনের মত বাতাসে উড়তে থাকে—ঠিক মনে হয় কে যেন চুলের ঝুঁটি ধরে তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা যে মাঝে মাঝে দেখতে পাও, পাউডার-মাখার ঠুসীর মত এক একটা গোল সাদা জিনিষ উড়ে যাচ্ছে, যাদের তোমরা বল বাতাসীমা'র দেশের ফুল, সে আর কিছুই নয়, হয় তিৎফলের নয় আকন্দের রেশমী শোঁয়াআলা বীচি। করবী, মালতী আর মধু-মালতীর (মেধুর লতা) বীচিও আকন্দের বীচির মত ঝুঁটি-লাগানো।

দুপুর রোদে শিমুলের ফলগুলোও ফটাস্ করে ফেটে যায়, আর তাদের ভিতরকার তুলো, বীচি মুখে করে চারপাশে উড়তে থাকে। সজ্‌নে সোনা, পারুল আর বিলাতী ঝাউগাছের বীচির দুপাশে পাখীর ডানার মত দুখানা ডানা লাগানো থাকে—সেই ডানায় ভর দিয়ে তারা এরোপ্লেনের মত উড়ে চলে যায়। পলাশ আর শালগাছের ফলের গায়েও ঐরকম ডানা। ফলগুলো উড়ে উড়ে যেখানে গিয়ে পড়ে, সেইখানেই তাদের বীচি বেরিয়ে মাটিতে মাথা গোঁজে।

আর একরকম গাছ আছে, যা রুশিয়া আর আরব দেশের মাঠে জন্মায়। ঐ গাছের বীচি হলেই গাছটা শুখিয়ে যায়—কিন্তু পাছে সব বীচি এক জায়গায় জড় হয়ে ভিড় করে, তাই গাছটা আগে থাকতেই তার শিকড়কে এম্‌নি আল্‌গা করে রাখে যে, একটু জোর হাওয়া লাগলেই গোটা গাছটা উপড়ে তালগোল পাকিয়ে বলের মত গড়াতে গড়াতে ছোটে—আর বীচিগুলো গাড়ীর চাকার কাদার মত ছিট্‌কতে ছিট্‌কতে যায়।

যে সব গাছ জলের ধারে হয়, তারাও জলকে দিয়ে বীচি বইয়ে নেয়। নদীসমুদ্রের ধারে অনেক নারকোলসুপুরীর গাছ হয়। পাছে জলে পড়ে পচে যায়, তাই নারকোলসুপুরীর ছোব্‌ড়া অমন শক্ত। মাঝ-সমুদ্রে অনেক দ্বীপ আছে, যাতে আগে নারকোল-সুপুরীর গাছ মোটেই ছিল না; কিন্তু এদেশের নারকোলসুপুরীই জলের পিঠে চড়ে নাচতে নাচতে সেই সব দ্বীপে গিয়ে ঠেলে উঠেছে—কাজেই এখন সে সব দ্বীপে নারকোলসুপুরীর বন।

আবার কোন কোন গাছ বৃষ্টির জলকে দিয়ে বীচি ছড়িয়ে নেয়। সিঙ্গাপুর অঞ্চলে একরকম গাছ আছে। ঐ গাছ উত্তর আফ্রিকাতেও

দেখা যায়। শুখ্‌নোর সময় তাদের ফলের চারপাশের ছোট ছোট ডালগুলো কুঁকড়ে গিয়ে ফলগুলোকে ঢেকে রাখে; তারপর যখন বর্ষা আসে, তখন ডালগুলো সোজা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আর বৃষ্টির তোড়ে ফলগুলো ত ফাটেই, বীচিগুলোও হু হু করে ভেসে যায়।

হাওয়া, জল—দুয়ে মিলে পদ্মের বীচিকে পদ্মগাছের কোলছাড়া করে। যেই বীচিগুলো পেকে চাক হতে ফেটে বেরোয়, অম্‌নি একটী ছোট্ট হাওয়ার ভুড়ভুড়ি কি বীচিটার তলায় গজিয়ে ওঠে, যাতে সে না ডুবতে পারে। হাওয়া-পোরা রবারের বালিস বুকে বাধিয়ে যেমন ছোট ছেলেরাও জলে ভাসতে পারে, তেমনি বীচিগুলোও ভাসতে থাকে—আর যেদিকে ঢেউ বাতাস ঠেলে নিয়ে যায়, সেই দিকেই যায়। এম্‌নি ভাবে খানিকটা দূর গেলে পর হাওয়ার ভুড়ভুড়িগুলো ফেটে যায়, আর বীচিগুলোও তলিয়ে মাটিতে পড়ে।

কোন কোন গাছ আছে, যারা হাওয়াজলের বদলে জন্তু-জানোয়ারকে দিয়েই বীচি ছড়িয়ে নেয়। তাদের ফল মানে শুখ্‌নো খোসায় মোড়া বীচি নয়। তাদের ফলের উপরে খোসা, তার নীচে শাঁস, তার মধ্যে বীচি। কাঁচা বেলায় যখন বীচি নরম থাকে, তখন খোসা থাকে সবুজ, আর শাঁস থাকে টক কি তিতো কি কষা—কাজেই পশুপাখীরা তখন কাছ দিয়েও ঘেঁসে না; কিন্তু যেই বীচি পুরুষ্ঠ হয়ে ওঠে, অমনি শাঁস হয়ে যায় মিষ্টি, আর খোসার রংও হয়ে যায় লাল, হল্‌দে কি বেগুনী। তা ছাড়া অনেক ফলের গা দিয়ে তখন সুগন্ধও বেরোয়—যেন গাছ রাজ্যের পশুপাখীকে নেমন্তন্ন করে ডাক্‌তে থাকে। কাজেই পশুপাখীরা তখন দূরদূরান্তর থেকে ছুটে আসে; কিন্তু সকলেই যে গাছে বসে, কি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ফল খায়,

তা নয়, কেউ কেউ মুখে করেও নিয়ে যায়—হয় ধীরেসুস্থে নিজেরা খাবে বলে, নাহয় বাসায় গিয়ে বাচ্চাদের খাওয়াবে বলে। তারা শাঁসটুকুই খায়, বীচিগুলোকে ফেলে দেয়। তোমরা যদি ভোরে উঠেই দেখতে পাও যে, বাড়ীর উঠানে আধ-খাওয়া পেয়ারা বা বাদাম পড়ে আছে, অথচ বাড়ীর ত্রিসীমানায় ও-সব গাছ নেই, তাহলে বুঝবে হয় বাদুড় নাহয় কাঠবেড়াল ঐ সব ফল মুখে করে এনেছে। বেলের মতন যে সব ফল তলায় পড়েই ফেটে যায়, অথচ ভারি বলে পশু-পাখীরা মুখে করে নিয়ে যেতে পারে না, তাদের বীচি হয় প্রায়ই আঠা-ওয়ালা—ফল খাবার সময় দু-চারটে বীচি ঠোঁটেমুখে লেগে যাবেই যাবে। যখন অন্য জায়গায় গিয়ে পশুপাখীরা ঠোঁটমুখ ঘষে, তখন সেইখানেই বীচিগুলো খসে পড়ে যায়। সোঁদালের লম্বা ছড়ির মত ফলের মধ্যেও মিষ্টি আঠাওয়ালা বীচি থাকে। ঐ আঠার জন্যই বীচিগুলো ঠোঁটে লেগে চালান্ হয়ে যায়। মান্দা (বাঁদরা) পরগাছারও ফল যেমন মিষ্টি, বীচিগুলো তেম্‌নি আঠাওয়ালা। পাখীরা যখন এক গাছ থেকে ফল খেয়ে অন্য গাছে গিয়ে ঠোঁট ঘষে, তখন সেই গাছের ডালে ঠোঁটে-জড়ানো বীচিগুলো লেগে যায়—আর সেই গাছেও পরগাছা গজিয়ে ওঠে। যে সব ফল ছোট অথচ বীচিতে ভরা, তা পশুপাখী অনেক সময় গিলে ফেলে; কিন্তু সব বীচি হজম হয় না, যেমন তেম্‌নি পেট থেকে বেরিয়ে যায়। অনেক সময় বাড়ীর ছাতে কি পাঁচীলের উপর যে বট অশথ গাছ গজিয়ে উঠ্‌তে দেখা যায়, তার মানে কাক শালিখ বুলবুলের পেট থেকে বট অশথের বীচি বেরিয়ে ঐ ছাত বা পাঁচীলের উপর পড়েছিল্।

অনেক গাছ আছে, যারা বীচির রং দিয়ে পাখীদের ভুলিয়ে

থাকে—আর সেই ভুলের জন্যই বীচিগুলো দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। কুঁচ আর লট্‌কানের রাঙা টুক্‌টুকে বীচিগুলোকে পাখীরা মিষ্টি খাবার ভেবে টপ্ টপ্ করে গিলে ফেলে; কিন্তু সেগুলো মোটেই হজম হয় না, বট অশথের বীচির মতই যেমন তেম্‌নি পেট থেকে বেরিয়ে যায়। নাটাফলের দাগ-কাটা শক্ত বীচিগুলো দেখতে অনেকটা গুব্‌রে পোকার মত। পাখীরা অনেক সময় পোকা ভেবে তাদের ঠোঁটে করে নিয়ে চলে যায়—তারপর যখন ঠুক্‌রে দেখে সেগুলো পোকা নয়, তখন ফেলে দেয়। গাঁদাফুলের ছোট ছোট বীচিও দেখতে অনেকটা ফড়িঙের মত। পাখীরা ফড়িং ভেবেই তাদের বয়ে নিয়ে যায়। পাখীদের মত ইঁদুর পিঁপড়েরাও অনেক ফলের বীচি বয়ে নিয়ে তাদের গর্ত্তে মজুত করে রাখে। সবগুলো তারা খেতে পারে না, অনেকগুলো গাছ হয়ে পড়ে। ইঁদুর পিঁপড়ের গর্ত্ত খুঁড়লে অনেক সময় ধান ছোলা মটর বেরিয়ে পড়ে।

ফলের লোভ দেখিয়ে, ফল খাইয়ে বীচি ছড়িয়ে নেবার দোষ এই যে, কতকগুলো বীচি নষ্ট হয়ে যায়। বীচির রং দেখিয়ে ভুলিয়ে বীচি ছড়িয়ে নেবার দোষ এই যে, একবার যে জন্তু ঠকে, সে চালাক হয়ে যায়। তাই কোন কোন গাছ লোভও দেখায় না, ভোলায়ও না—জোর করে বীচি বইয়ে নেয়। রেড়ী, আলকুসী, বনওক্‌ড়া, চিড়চিড়ে (আপাং)—এই সব ফলের গায়ে মাথা-বেঁকানো আলপিনের মত কাঁটা আছে, তা তোমরা বোধহয় দেখেছ। গরু ভেড়া ছাগল চরতে চরতে যেই ও-সব গাছের কাছ দিয়ে চলে যায়, অম্‌নি গোটা কয়েক ফল তাদের লোমে জড়িয়ে যায়। খানিকটা দূর গেলে পর যখন গা কুট্‌কুট্ করতে থাকে, তখন তারা গা-ঝাড়া দেয়, আর বীচি

সুদ্ধ ফলগুলো ঝরে পড়ে। বর্ষাকালে মাঠ থেকে বেড়িয়ে এলে কাপড়ে যে ছোট ছোট চোরকাঁটা (ভাঁটুই) লেগে থাক্‌তে দেখেছ, যা ধোপাবাড়ীর কাপড়েও কখনো কখনো দেখা যায়,—সে আর কিছুই নয়, একরকম ঘাসের বীচি; ঐ কায়দায় তারা আসল গাছ থেকে তফাতে গিয়ে পড়ে। খানা ডোবা কি খালের ধারে যে চিরুনী ফলের গাছ হয়, যার ফল দিয়ে পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা মাথা আঁচ্‌ড়ে থাকে—তারও গোল গোল ফলের গায়ে এমন বেঁকানো কাঁটা বসানো আছে যে, গরুছাগলের গায়ে বেধে ফলগুলো দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

শুধু গায়ে বাধিয়ে নয়, পায়ে বাধিয়েও অনেক গাছ তাদের বীচি চালান করে। তোমরা হয় ত দেখে থাক্‌বে বেশ একটা পরিষ্কার পুকুর দু' চারদিনেই পানায় বোঝাই হয়ে গেল। তোমরা মনে করলে কোন দুষ্টু ছেলে পানা ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু তা নয়। পানা পুকুরে মাছ ধরবার সময় পানার বীচি বকের পায়ের আঙুলের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছিল—তারপর সে যখন পরিষ্কার পুকুরে মাছ ধরতে এল, তখন ঐ পানার বীচি পড়লো তার জলে। আর যাবে কোথায়? হুহু করে পানা গজিয়ে উঠ্‌লো।

বাঘনখ বলে একরকম গাছ আছে, যার ফল দেখ্‌তে ঠিক বাঘের নখেরই মত। ফলগুলো খসে ঠিক গাছের তলাতেই পড়ে। জন্তু-জানোয়ারেরা গাছের তলায় গেলেই একটা না একটা ফল পায়ের তলায় ফুট্‌বেই; অম্‌নি তারা ছুটে পালায়, আর প্রাণপণে চেষ্টা করে সেটাকে বের করে ফেলবার জন্য। এম্‌নি করে অনেক দূর যাবার পর তবে সেটা খুলে পড়ে।

ইউরোপের হঙ্গারী দেশে আর একরকম গাছ আছে, যার বীচির

খোলার উপর একটা শক্ত ধারালো ফলা বসানো থাকে। এরও বীচি গাছের তলায় পড়ে; গরুভেড়ারা চরতে চরতে যেই তার উপর পা দেয়, অমনি ফলাটা প্যাঁট্ করে তাদের খুরের মধ্যে বিঁধে যায়। কিন্তু তখন তারা টেরই পায় না যে এমন কিছু হয়েছে—আপনার মনে চলে যায়। চল্‌তে চল্‌তে একটু পরেই ফলাটা মট্ করে ভেঙে গিয়ে খুরের মধ্যে গিঁথে থাকে, বীচিটা খুলে পড়ে যায়। দু' চারদিন পরে যখন ফলাবেঁধা খুরটা পেকে টাটিয়ে ওঠে, তখন তারা বুঝতে পারে যে গাছের উপকার করবার বক্‌সিস্‌টা কি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আর একরকম গাছ আছে যারা আরো দয়ালু। তারা বীচিগুলোকে করেছে অনেকটা নোঙরের মত। এই বীচি সিংহের পায়ে ফুট্‌লে সিংহকেও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে হয়। তা ছাড়া সেকেলে তীরের মুখে যেমন বিষ মাখানো থাক্‌তো, এই বীচির ফলার মুখেও তেম্‌নি বিষ আছে, যাতে করে এমন দগ্‌দগে ঘা হয়ে ওঠে যে, সিংহেরও প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। এই জন্যই এই বীচির নাম সিংহমারা বীচি। এই বীচি একবার পায়ে ফুট্‌লে চট্ করে খোলা যায় না, কাজেই খুলতে খুলতেও দূরে গিয়ে পড়ে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক
ও
শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি।

বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যে মানবতার বিকাশ।

আমরা ছেলেবেলায় সংকীর্ত্তনের পদে শুনেছি—"আর হবে না মানব জনম ভাঙ্‌লে মাথা পাষাণে।" মানব-জন্মের জন্য এই দারুণ আগ্রহ দেখে মনে হয়, আমাদের দেশের প্রাচীনেরাও মানব-জীবনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেকটা সচেতন ছিলেন। চুরাশী হাজার জন্ম ডিঙিয়ে এসে একবার মানুষ হয়ে জন্মালে পিছনের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে আর বড় একটা ইচ্ছা হবার কথা নয়, তার উপর ইহলোক ও পরলোকেও বেশ কিছু সুখ-সুবিধার জোগাড় করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, মানব-জীবন ত আর মানুষের নিজের জন্য নয়—দেবতার কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই কল্পিত। মানুষের আবার নিজের সুখই বা কি, দুঃখই বা কি? তাই, প্রকৃতির মায়াজালের মধ্য থেকে মানুষকে বাইরে যাবার জন্য চেষ্টা কর্‌তে হবে; কেননা, মানুষের নিজের কাছেও তার জীবনের আর কোন সার্থকতাই নেই।

আমাদের দেশের সহজিয়ারা মানুষকে খানিকটা আমল দিয়েছিলেন—মানুষকে আশ্রয় ক'রে সাধন করবার জন্য। "মনুষ্যং নাবমাসাদ্য তর দুঃখ-মহানদীং"। মানুষের জন্যই মানুষকে দরকার হয়নি, মানব-জন্মটাই যে দুঃখ, তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই মানুষের দরকার। গোঁড়া হিন্দুরা যেখানে দেবতার প্রসাদী হিসাবে

জীবনটাকে দেখ্‌তেন, বৌদ্ধ সহজিয়ারা সেদিক দিয়ে না চেয়ে মানুষ ভাবটিকে ধরেই মানুষকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে চেয়েছিলেন।

মোট কথা, আমাদের যা' কিছু সাহিত্য, যা' কিছু শিল্প, অর্থাৎ মানুষ-হিসাবে যা' কিছু রস ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এবং উপভোগ করবার সম্ভাবনা, তা সবই অতিমানুষকে নিয়ে। কিন্তু কত যুগের অমানুষ অবস্থা কাটিয়ে মানুষ যে ক্রমেই বেশী ক'রে নিজের রহস্যের সন্ধানটি পাবার জোগাড় করেছে, তাতে সব উপস্বত্ব দেবতার—তার নিজের কোন অধিকার নেই; আর যদিও কিছু থাকে, তা দেবোত্তর সম্পত্তির মত। সে যদি নিজেকে শুধু নিজেই উপভোগ কর্‌তে চায়, তবে দেবতাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ঐ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার যোগ্য। মানুষের সঙ্গে তার দেবতার সম্বন্ধটা দেখে মনে হয়, প্রাচীন কালে শাপের দ্বারাই হোক্ আর বরের দ্বারাই হোক্, দেবতার দৃষ্টি মানুষের জীবনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুল্‌ত। কি যুদ্ধে, কি বাণিজ্যে, কি গৃহস্থালির ব্যাপারে, কি সামাজিক উৎসবে, কোথাও দেবতাকে ছাড়া মানুষ চল্‌তেই পার্‌ত না। মানুষ দেবতার লীলার বাহন হয়ে জীবনের বোঝা বয়ে বেড়াত—জীবনকে আস্বাদন কর্‌বার অবসর পেত না। জীবনের হলাহল দেবতার কৃপায় প্রশমিত হত কিনা জানিনে; কিন্তু জীবনের অমৃত থেকে মানুষ বঞ্চিত হত, সে কথা নিশ্চয় ক'রে বলা যায়। দেবতার কৃপা হলে মানুষ অল্পেতেই খুসী হত—সে নিজের ভূমার সন্ধান কর্‌ত না।

মানুষ একবার বাঁধা পথে চল্‌তে সুরু কর্‌লে আর ভেবে দেখে না সে পথ ভাল কি মন্দ। খৃষ্টের ১৮শ শতক অবধি আমাদের প্রাচীন ধারা চলে 'এসেছে; ততদিন পর্য্যন্ত মানুষ ধর্ম্মের নামে ও দেবতার

প্রীতি-কামনায় সতীদাহ করিয়েছে, ডাকাতি করতে চেয়ে কালীপূজা করেছে, নিজের গায়ে কাঁটা ফুঁড়েছে, নরবলি দিয়েছে, আরো কত কি করেছে। ইংরেজের আমলের গোড়ায় মহাধার্ম্মিক হিন্দু-কর্ম্মচারীরা যে ভাবে ইংরেজ প্রভুদের হুকুম মান্য করেছিলেন, তা ইতিহাসের বিষয় হয়ে রয়েছে। তখনও অবশ্য অনেক অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙালী-ভোজন প্রভৃতি খুব সমারোহেই করা হত, কিন্তু তাতে মানবতা ছিল না, মানুষের প্রতি প্রেম ছিল না, মানুষকে বড় করে দেখ্‌বার ইচ্ছা বা শক্তি ছিল না।

সেকালের কথা ছেড়ে দিয়ে এবার একালে আসা যাক্।

একালের কথা বল্‌তে হ'লে শুধু আমাদের দেশকে নিলে চল্‌বে না, ১৯শ শতকের ইউরোপের কথাও অনেকটা তোলা দরকার হবে। কারণ এই একালটি আমরা একরকম হাতে হাতে ইংরেজের কাছ থেকেই পেয়েছি। ইউরোপ যা কয়েক শ' বছরের সাধনায় লাভ করেছিল, তা' ঠিক যুগসন্ধিক্ষণেই আমাদের কাজে লেগেছিল। মধ্যযুগের খৃষ্টীয় প্রভাব কাটিয়ে উঠে ইউরোপ ক্রমে ক্রমে কারণবাদের অগ্নিকাণ্ডে বহু প্রিয় ও প্রাচীন জিনিষ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। কোন ব্যক্তির বা গ্রন্থের মতকে যুক্তির শেষ বলে মনে করা আর চল্‌ল না। সব মত ও প্রথার গোড়ায় নাড়া দিতে দেখা গেল যে, মানুষের সব ব্যাপারের মধ্যেই বহুকালের বহু গলদ জুটেছে— একমাত্র কারণবাদের আলোকে সে সব আবর্জ্জনা দূর হবে। বিজ্ঞানের দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তিকে, আর দর্শনের দ্বারা মানসিক শক্তিকে মানুষ নিজের ও সমাজের কাজে লাগাতে লেগে গেল। বহুকাল থেকে যারা মহামানবের উন্নতির পথ আগ্‌লে ব'সে ছিল, আজ

তাদের স'রে যেতে হ'ল। মানুষ নিজের প্রভু হয়ে উঠ্‌ল—এই হ'ল মানবতার প্রথম সোপান। যুক্তিবাদ পুরাণো বহু মত ও পথকে ধ্বসিয়ে দিয়ে শুধু শূন্যকে আশ্রয় করে পথ চলে নি। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, এমন কি পরমেশ্বরকেও জবাবদিহি কর্‌তে ছাড়ে নি বটে, কিন্তু সব ঝাঁটিয়ে ফেলে শূন্যকে নিয়ে ত আর ঘর করা চলে না। তাই প্রাচীন পথ ছেড়ে দিয়ে সব দিক দিয়ে মানুষের নিজের মাহাত্ম্য-বোধ হতেই নতুন সুরে মহামানবের (Humanity) স্তুতি আরম্ভ হয়ে গেল। রাস্কিনও বলে গিয়েছেন যে, ইউরোপে প্রকৃত মানুষ-পূজা ১৯ শতাব্দীর কারণবাদীরাই প্রচার করেছিলেন। জোসেফ্ ম্যাক্‌কেব তাঁর "The Churches and the People" নামে এক বইয়েতে এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। প্রাচীনেরা যা' করেছিলেন, তা' আর যাই হোক—"মানবতা" নয়।

আমাদের দেশে মানুষকে গৌরব দান না করাতে মানুষের যে অপমান শূদ্রত্বের রূপ ধারণ করে মৌরসি অধিকার লাভ করেছিল, তার সম্বন্ধে আমরা সচেতন হ'য়ে উঠি ইংরেজের সংস্পর্শে এসে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে আমরা প্রথমে যাদের সঙ্গে কারবার করি, তারা সবাই শুধু বাণিজ্য-প্রয়াসী ছিল। তারা কর্ম্মে বা মর্ম্মে তাদের দেশের কাল্‌চারকে বহন কর্‌ত না। সুতরাং তারা আমাদেরও কাজে লাগেনি, আর তাদের দেশেরও গৌরব বাড়ায় নি। আমাদের মধ্যে আধুনিক ইউরোপের মনের সঙ্গে পরিচয় হয় সর্ব্বপ্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের। তার ফলে তিনি দেখ্‌লেন এ দেশে যারা বাণিজ্য কর্‌তে এসে নিজেরাও অমানুষ হয়েছে আর এ দেশের লোককেও সেরূপ করে তুলেছে, তাদেরই নিজের দেশে মানবতার নব-বিধানের পত্তন হচ্ছিল।

যাঁরা হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীকে বাড়িয়ে আধুনিক পাশ্চাত্যের নিকট থেকে যা কিছু গ্রহণীয় তা নিতে পেরেছেন, তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় সকলের প্রথম ও প্রধান বলে গণ্য। তাঁর উদার দৃষ্টি ও বিশাল হৃদয় শুধু ধর্ম্মান্দোলনের জালেই আট্‌কে যায় নি। তিনি তাঁর ধর্ম্মচর্চ্চা থেকে লব্ধ ঐক্যবোধটিকে মানুষের সাধারণ সাংসারিক ব্যাপারে প্রয়োগ কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মনে ভারতের গভীরতা ও পশ্চিমের ব্যাপকতা, এই দুটি মিশে যেতে পেরেছিল। পৃথিবীর কোন দেশের মানুষ যে নিজেকে ক্ষুদ্র করে দেখে, নিজেকে বদ্ধ মনে করে, এ ধারণা তাঁকে ব্যথা দিত। তখনকার দিনে মানুষকে বড় করে দেখ্‌বার কোন আয়োজন এ দেশে ত হয়ই নি। এইজন্য শ্রীযুত অ্যাণ্ড্রুজ তাঁকে "greatest humanitarian and world-thinker of the early nineteenth century" বলেছেন। একবার তিনি পৃথিবীর অন্য প্রান্তের একটি দেশের স্বাধীনতালাভের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ কর্‌বার আতিশয্যে হঠাৎ পড়ে গিয়ে পায়ে খুব ব্যথা পান। কোন্ বিদেশের কোন্ স্থানে মানুষ স্বাধীনতা লাভ কর্‌লে, তাতে আমাদের অধিকাংশ লোকেরই মাথা-ব্যথা নেই। তারপর, দেশের দিক্ থেকে দেখলে, সতীদাহ প্রভৃতি বন্ধ করতে তাঁর চেষ্টার আসল কারণ এখন আমরা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনে। তখনকার দিনে সতীদাহের মত অমানুষিক কাণ্ড বোধ হয় কোন সভ্য দেশে ঘট্‌তে পার্‌ত না। রাজা রামমোহন শুধু শাস্ত্র ও যুক্তি নিয়ে যুদ্ধ কর্‌তেই পটু ছিলেন বলে এ সব ব্যাপারে হাত দিয়েছিলেন মনে কর্‌লে এই মহাপুরুষের প্রতি অবিচার করা হবে।

তান্ত্রিক সাধকেরা যেমন সুরার উন্মাদনাকে নিজেদের সাধনার

সহায় করে তুল্‌তে পারেন, মহাত্মা রামমোহনও তেম্‌নি পাশ্চাত্য জ্ঞানকে নিজের কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার পরেই এদেশের চিন্তাধারা একেবারে ওলট্‌ পালট্‌ হয়ে গেল। এই বাঙ্‌লা দেশের মনোভূমিতে বহুদিন ধরে যে সব দেবমন্দির দাঁড়িয়েছিল, তা একই সঙ্গে পশ্চিম দেশের দর্শনের ভূমিকম্পে ও বিজ্ঞানের গোলা বর্ষণে ভেঙ্গে চূরমার হয়ে গেল। দেবতারা যে যার পালাবার পথ খুঁজে পেলেন না—এমন কি ক্রমে স্বয়ং জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরকেও নতুন যুগের কালাপাহাড়েরা অব্যাহতি দিলেন না। যে কজন ইউরোপীয় তখনকার বাঙালী যুবকদের মনের উপর খুব প্রভাব বিস্তার কর্‌তে পেরেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই নাস্তিক ছিলেন। এঁরা যীশুকেও মান্‌তেন না, ঈশ্বরও মান্‌তেন না। ডেভিড্‌ হেয়ার, ডিরোজিও প্রভৃতির কথা সবারই জানা আছে। এঁরা ছাড়া আরও অনেক নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী এদেশে এসেছিলেন। তখন প্রথমে খৃষ্টানীর ঢেউ ও পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক খুব প্রবল হয়ে উঠ্‌ছিল, তাতে কিন্তু নাস্তিকদের জ্ঞানালোকিত অন্ধকার দূর হল না। বরং একদিকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে প্রভৃতির; অপর দিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী আন্দোলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই তৃতীয় পক্ষ ফরাসী কোঁৎ-ব্যাখ্যাত "পজিটিভিজম্‌" অনেককে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ-ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি, কে, এম্‌, চ্যাটার্জ্জি, রামকমল ভট্টাচার্য্য, বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী, দ্বারকানাথ মিত্র, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কোঁৎ-এর Humanity আদর্শ দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন;

এঁদের কেউ কেউ ত রীতিমত কোঁৎ-এর শিষ্যই ছিলেন। আর খুব সম্ভব পরোক্ষভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্ততঃ বাইরে থেকে দেখ্‌তে গেলে, এই পজিটিভিজ্‌ম্‌ তখনকার কালে সকলপ্রকার ধর্ম্মমতের বিরোধী ছিল বল্‌তে হবে। আধুনিক বাঙালীর মনের উপর এই পজিটিভিজ্‌ম্‌-প্রভাবের ফলাফল কেউ যে ভাল করে লক্ষ্য করেছেন, তা আমার মনে হয় না। বাঙালী আর যাই হোক্‌, বোধহয় কোন-কালেই নাস্তিক ছিল না—প্রাচীন মহাযানী বজ্রযানীরাও শূন্যভাবনা সত্ত্বেও দেব-দেবী ছাড়ে নি। বাঙালী মানুষকে ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হিসাবে দেখে এসেছে; দেশের কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন মানুষ সে কল্পনাও কর্‌তে পারি নি।

এই নাস্তিকের দলটিকে বুঝ্‌তে হলে এদের দুটি জিনিষের প্রতি নজর দিতে হয়—এক এদের কর্ম্ম, আর এদের চিন্তা। কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে গেলে দেখ্‌তে পাই, যেন পরমেশ্বর ও দেব-দেবী থেকে বিমুখ হয়ে এদের মনের সমস্ত শক্তি মানবের হিত-সাধনে নিয়োজিত হয়েছিল। ডেভিড্‌ হেয়ার ও বিদ্যাসাগরের কর্ম্ম-স্রোতের এই মূল উৎসের সন্ধান না নিলে, তাঁদের চরিত্রকে আমরা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ব না। মানবতার উপাসক এই দুই কর্ম্মবীর নিজেদের উজাড় করে মহামানবের পূজায় বলি দিয়েছিলেন—তাই এঁদের পূজা মহা-মানব গ্রহণ করেছেন। যাঁরা শুধু সমাজের হিত-সাধন কর্‌ব বলে কর্ম্মচেষ্টা করেন, তাঁদের সঙ্গে এঁদের এখানেই তফাৎ দেখা যায়। একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে যে, যে সময়কার কথা হচ্ছে, তখন চার-দিকের ধর্ম্মোদ্যমের মধ্যে এই দলটি চিন্তায় ও কর্ম্মে বহু বাধা পেয়েছিল—

সেইজন্য এদের কোন ছাপ আমাদের সমাজের উপর ভাল করে পড়্‌তেই পায় নি ; এরাও লোকসমাজে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা কর্‌তে বড় একটা চেষ্টা করে নি। যাহোক, আমরা এই দলটিকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম—কেবল কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "চতুরঙ্গ" মধ্যে জেঠামশায়ের চরিত্রে এদের অমর করে রাখবার চেষ্টা করেছেন বলা যেতে পারে।

ডেভিড্‌ হেয়ার কেন যে লোকের বাড়ী বাড়ী অসুখের খবর নিয়ে বেড়াতেন, ইস্কুলের দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ছুটির পর বালকদের মুখ নিজের হাতে মুছিয়ে দিতেন, আর বিদ্যাসাগরের হৃদয়-সাগর যে কোন্ অতল গভীরতা হতে আপনি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল—তা' তলিয়ে দেখবার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংস বার বার বলেছেন যে, ঈশ্বরকে না জান্‌লে শুধু ইস্কুল, কলেজ, হাঁসপাতাল ইত্যাদি বানিয়ে জন-সেবা করে কি হবে ?—কিন্তু মহামানবই বিদ্যাসাগরের কাছে পরমেশ্বরের স্থান অধিকার করেছিল। তাঁর এই সব কাজকে শুধু নৈতিক কার্য্য বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে—এই গুলি তাঁর পক্ষে ধর্ম্মকর্ম্ম পূজাপার্ব্বণেরই মত ছিল। বিদ্যাসাগর-চরিত্রটি তলিয়ে দেখ্‌লে বুঝতে পারি, বিধবা-বিবাহ চালানো ব্যাপারটি তাঁর হৃদয়েরই জিনিস—শাস্ত্রের বিধান ও আইনের বন্ধন শুধু বাইরের অস্ত্র-শস্ত্র। আমাদের এই ছোঁয়াছুঁতের দেশে বিদ্যাসাগরের প্রাণটি সকলকেই স্পর্শ করেছিল—সবাইকে কাছে টানতে চেয়েছিল। এ বিরাটত্ব বোঝ্‌বার ক্ষমতা তখন দেশে ছিল না। প্রচলিত ধর্ম্ম-কর্ম্মে বিশ্বাসীরা নানা অনুষ্ঠান ও স্তবস্তুতি দ্বারা

যে শান্তি লাভ করতে চায়, বিদ্যাসাগর মানবের সেবা দ্বারাই তা লাভ করতেন। ব্যষ্টির ক্ষুদ্রতা ও নীচতা, কালিমা ও কদর্য্যতা, সমষ্টির সংহতি ও সৌন্দর্য্যে ডুবে গিয়ে তাঁকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল; কারণ মানুষের সেবা করতে গিয়ে তাঁকে ভুগতেও বড় কম হয় নি।

বাঙালী পজিটিভিষ্ট্‌দের চিন্তার কথা আমরা বড়, একটা জানতে পাইনে। তার কারণ তাঁরা নিজের মনের কথা খুলে লিখে যান নি। তাঁরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের সময় তখনও আসেনি। কয়েক বছর হল আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁর পুরাণো কথার কিছু কিছু বলে গেছেন। তা থেকে দেখা যায় যে, একটি Positivist Club চলেছিল। তাতে, আগে যে সব পজিটিভিষ্ট্‌দের নাম দেওয়া হয়েছে, তাঁরা ছাড়া কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার ও নীলমণি কুমার প্রভৃতি সভ্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজনের কথা একটু বিশেষ করে না বল্‌লে চলে না। বাঙালী পজিটিভিষ্ট্‌দের পাণ্ডা যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ খুব আশাবান্ লোক ছিলেন। পজিটিভিজ্‌ম্ সম্বন্ধে তাঁর খুব উচ্চ ধারণা ছিল, আর এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। এই নব ধর্ম্মের প্রচারে তাঁর এরূপ আগ্রহ ছিল যে, যখন তিনি দেখ্‌লেন যে এদেশের লোকেরা ওরূপ বিলাতী ভাব পছন্দ করছে না, তখন তিনি কোঁৎ-এর মতটিতে ভারতীয় পোষাক পরাতে চেয়েছিলেন। তিনি Humanity কে "নারায়ণী" নাম দিয়ে এর একটা মাতৃমূর্ত্তিধরণের মূর্ত্তি গড়তে ইচ্ছা করেছিলেন। আর, যাতে এদেশের লোক রোজ মহামানব সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু চিন্তা করে, সেই জন্য তিনি "জবাকুসুমসঙ্কাশং" ইত্যাদি সূর্য্যের স্তবটি পর্য্যন্ত পজিটিভিজমের মধ্যে আন্‌বার চেষ্টা করেছিলেন। এই

সব কল্পনা আমাদের দেশের তখনকার ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান্ লোকেদের কাছে নিছক আমোদের কারণ হয়েছিল—এখনও শুধু কৌতূহল উদ্রেক করবে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের বন্ধু জজ দ্বারকানাথ মিত্রের দুচারটা কথায় আমরা দেখতে পাই যে, চিন্তায় ও কর্ম্মে এঁরা পজিটিভিজ্‌মের আদেশ মেনে চলতেন। জজ দ্বারকানাথ "প্রত্যহ রাত্রি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমার কার্য্য করিতেন, তাহার পরে কোঁতের এক chapter না পড়িলে তিনি কিছুতেই ঘুমাইতে পারিতেন না।" এই মিত্র মহাশয় পিতার শ্রাদ্ধ করেন নি; কারণ, তিনি বলতেন—"আমার যখন কিছুতেই বিশ্বাস নাই, আত্মা, ভগবান্, পরকাল কিছুতেই বিশ্বাস নাই, তখন আমি লোকদেখানো কেনই বা পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে যাই?" ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মতামত বাইরে বড় একটা প্রকাশ নেই। তিনি নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, তবে নাস্তিকতা নিয়ে কারও সঙ্গে বাদানুবাদ করতেন না। "কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুর্য্যের সহিত তিনি পরকালতত্ত্ব লইয়া হাস্য পরিহাস করিতেন। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন,—হাঁরে ললিত, আমারও পরকাল আছে না কি?" বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় আচার্য্য কৃষ্ণকমল আমাকে বলেছেন—"বিদ্যাসাগরের বোধোদয়ের কয়েক সংস্করণে 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' এরূপ ছিল, পরের সংস্করণগুলিতে সে কথা উঠাইয়া দেন।"

এই ঈশ্বরহীন, ধর্ম্মসম্প্রদায়হীন দল সমস্ত চিন্তা মহামানবের কল্পনায় নিয়োজিত করেছিলেন। পজিটিভিস্ট্‌রা বিবর্ত্তনশীল মানব সমাজকেই চরম উপাস্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। মানবত্বের

বিকাশকেই এঁরা পরম ধর্ম্ম বলে মনে করতেন—মানবের সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যেই এঁরা ভোর হয়ে যেতেন।

কেবল যে পজিটিভিজ্‌মের স্রোত এদেশে বয়েছিল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কারণবাদ (Rationalism), হিতবাদ (Utilitarianism) প্রভৃতি ইউরোপীয় নতুন চিন্তার প্রভাব এখানে ওখানে দেখ্‌তে পাওয়া যেত। "জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিলের মতে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ (Omnipotent) ও সর্ব্বজ্ঞ (Omniscient) তাঁহাকে All-merciful বলা কিছুতেই যায় না।...এই তিনটি attributes একত্র করিয়া এক পরমপুরুষ কল্পনা করা যাইতে পারে না ; জোর এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটা ভালর দিকে ঝোঁক—a tendency towards the good—কল্পনা করা যাইতে পারে ; তেমনিই একটা মন্দের দিকে ঝোঁকও কি কল্পনা করা যাইতে পারে না ?" আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই ধরণের মত প্রকাশ করায় একবার আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ হয়েছিল। সেই সময়ে ঠাকুর মহাশয় তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন,—"he can write, and he can fight, and he can slight all things divine !" (পুরাতন প্রসঙ্গ)। সম্প্রতি আমি আচার্য্য কৃষ্ণকমলকে তাঁর নিজের সম্বন্ধে এই সব কথা উত্থাপন করে, অধ্যাপক বিপিন বাবুর "পুরাতন প্রসঙ্গের" "আমি পজিটিভিষ্ট, আমি নাস্তিক" প্রভৃতি কথা তিনি এখনও বলেন কিনা বিশেষ করে জান্‌তে চেয়েছিলাম। তার উত্তরে তিনি বলেন যে, এখনও তিনি পজিটিভিষ্ট্ আছেন বটে, কিন্তু নাস্তিক বল্‌তে যা বোঝায়, অতদূর যেতে রাজী নন। এই জগদ্-

ব্যাপারে একটা mystery আছে, গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের এই কথা এখন তিনিও মেনে নিতে চান।

আমরা তখনকার মনীষীদের কথা তবু কিছু জানি; কিন্তু তখনকার কবিও যে মুক্তভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর্‌তে পার্‌তেন, তার খবর বোধ হয় অনেকেরই জানা নেই। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর রচনায় দেখতে পাই—

যদি তাঁর ইচ্ছা নয়,
তবে কেন পাপ রয়?
যদি সংসারের তরে
পাপ প্রয়োজন করে,
অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা,
সন্দেহ কি তায়?
লীলাখেলা বল মুখে
মনে কিছু জান?
কেবল বিশ্বাসে শ্রদ্ধা
রবে না কখন!

সঙ্গীত-শতক (নং ৮৬)।

এই আধুনিক মহাশূন্যবাদ থেকে বাঙ্‌লা দেশের চিন্তাধারায় এক নব তন্ত্রের নব শক্তির উদ্ভব দেখা যায়। পজিটিভিষ্ট্‌রা প্রাচীন বিশ্বাসের স্থানটিকে খালি করে সেখানে মহামানবকে স্থাপিত কর্‌লেন। এঁরা কয়েকজন শুধু মুষ্টিমেয় হলে কি হবে, এঁদের মানব-পূজায় দেশে যে একটা ঢেউ জাগ্‌ল, তা কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত চিন্তায়

বা কর্ম্মে ক্ষয়ে-মুছে যায় নি। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে তার ছাপ পড়েছে। এই সাহিত্যরূপ না পেলে এই ভাবধারার কোন চিহ্ন হয় ত খুঁজে পাওয়া যেত না। সবাই যে ঠিক পজিটিভিষ্ট্‌দের মতকে স্বীকার করে নিয়ে, বা তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এরূপ সাহি···চষ্টা করেছিলেন তা নয়; তাঁদের চিন্তার ধারা থেকে যে একটা ধাক্কা এসে পড়েছিল, তা নানা দিকে সাহিত্যের আকার পেয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে এই মানবতার আদর্শ বাঙ্‌লার সাহিত্যে এক নতুন সুর জাগিয়েছিল। প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যে সুধু দেবতাদেরই মঙ্গলগান করা হত—গত শতাব্দীর বাঙ্‌লা দেশে প্রথম মানুষের মঙ্গলগান সুরু হল।

কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী শুধু যে বাঙ্‌লার গীতি-কবিতায় নতুন ভাব ও ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা' নয়, তিনি এই মানব-গানেরও আদি কবি। বিহারীলালের আগেকার বাঙালী কবিরা কেউ প্রাচীন রামায়ণ মহাভারত থেকে উপন্যাস-বস্তু নিয়েছিলেন, কেউ রাজপুতানা-মহারাষ্ট্র থেকে, কেউ প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস থেকে; কিন্তু বিহারীলাল জ্বলন্ত-জীবন্ত কাল ও পাত্রের ভাবকে গানে ফোটাতে চেয়েছিলেন। এই নব বঙ্গ-গীতি-কাব্য কোথা থেকে উৎসারিত হল, তার সন্ধানে কেউ এ পর্য্যন্ত মাথা ঘামায় নি। অন্য বিষয়ের কথা ছেড়ে দিলেও, তিনি যে ভাবে মানব-বন্দনা করেছেন, তাতে প্রাচীনদের মত ষড়্‌রিপু-পীড়িত দুর্ব্বহ জীবনভারের কথা নেই—আর আদি-ব্রাহ্মদের মত পাপ ও মৃত্যুর বিভীষিকা নেই। এ হচ্ছে মানুষের মঙ্গল ও মহত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষের জীবনানন্দ থেকে উদ্ভূত রসশিল্প। নিধুবাবুর টপ্পা সুরে ও ভাষায় নতুন হলেও, খুব উচ্চ অঙ্গের

সাহিত্য নয়—জীবনের গভীরতা থেকে তা' উৎসারিত হয়নি; আর তাঁর নর-নারী-প্রেমে জীবনের অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে কোন যোগ নেই বলে তা' মানুষের হলেও তাতে মানবতা নেই।

মানব-জন্মের গুণগান প্রাচীনেরাও করেছেন—কারণ এ জন্মে জীব সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভ করে, এমন কি দেবত্ব পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে। এই জন্যে বিহারীলালের নীচেকার কয়েকটি পংক্তি হয়ত নতুনধরণের বলে মনে হবে না—

মানুষ সৃষ্টির সার,
দেবতার অবতার,
ব্রহ্মাণ্ডের শিরোমণি। সঙ্গীত-শতক (নং ৭১)।

কিন্তু তাঁর গানে ও কবিতায় মানব-জন্মের গৌরব কীর্ত্তন করতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নি :—

মানুষ আমার ভাই!
বড় প্রিয় ধন,
মানুষ-মঙ্গল সদা
করি আকিঞ্চন;
জন্মেছি মানুষ-অঙ্গে,
বেড়েছি মানুষ সঙ্গে,
মানুষের সমুখেই
হইবে মরণ;
মানুষেরি খাই, পরি,
মানুষেরি কর্ম্ম করি,

মানুষেরি তরে ধরে
রয়েছি জীবন;
মানুষের ব্যবহারে
জ্বালায়েছে বারে বারে,
চোটে গিয়ে নির্জ্জনেতে
করেছি গমন।

* * * *

পরে ভাল নাহি লাগে,
কেবলই মনে জাগে
প্রিয়তম মানুষের
মোহন আনন॥ সঙ্গীত-শতক (নং ৭২)।

আবার ঃ—

হেন যে মনুষ্য-সৃষ্টি চরাচর-শোভা,
দেবতার মত যার মুখশ্রীর প্রভা।
যাহার প্রকাণ্ড জ্ঞান পরিমেয় নয়,
তুলনে সমস্ত বিশ্ব বিন্দু বোধ হয়;
যাহার কৌশলাবলী মহা অপরূপ,
যেই সৃষ্টি জীবসৃষ্টি-আদর্শ স্বরূপ।
প্রেমপ্রবাহিনী (১ম সর্গ)।

মানুষের দুঃখ ও দুর্ব্বলতার প্রতি দরদ জন্মালে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা বন্ধন গড়ে ওঠে, আর মানুষের জ্ঞান থেকে মানুষ-জন্মের রহস্য জান্‌বার ইচ্ছা আসে। কিন্তু মানুষের বর্ত্তমানে ত তার

সবখানি রহস্য নিহিত নেই; মানুষের বিবর্ত্তন-লীলা (man in evolution) যে একটি অনির্ব্বচনীয় দূর অতীতে নিয়ে যায়, সেখান থেকে দেখ্‌লে মানুষ নিজের প্রতি পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দৃষ্টিপাত কর্‌তে শেখে, আর নর-দেবতার' চরণে অঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়। নতুন যুগের এই নতুনরকমের ধ্যান থেকে মানুষ একই সঙ্গে নিজের ভূমা ও ভবিষ্যতের একটা ধারণা করে নিতে পারে, শুধু "ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড" বলেই ভেবে অস্থির হয় না।

এই ভাবের একটি কবিতা বিহারীলালের শিষ্য অক্ষয়কুমার বড়ালের "মানব-বন্দনা।" এই কবিতাটি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের একটি অপরূপ জিনিষ—অথচ এর প্রতি আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে কিনা বল্‌তে পারিনে। তাই এই দীর্ঘ কবিতাটির কতক অংশ তুলে দেওয়া গেল।

মানব-সমাজের শৈশবে :—

সেই আদি-যুগে যবে শিশু অসহায়,
নেত্র মেলি ভবে,
চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,
দেবে, না মানবে?

তারপর মানুষের সাহচর্য্যের কথা :— * * *

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি
শিকার সন্ধান?
* * * *

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে
হইনু বাহির ?

* * * *

যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন,
প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ?

মানুষ কি থেকে কি হয়েছে এক কথায় তার চিত্র ঃ—

লয়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে,—
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু,
উড়ালে পর্ব্বতে !
গঠিলে আপন মূর্ত্তি—দেবতালাঞ্ছন
কালের পৃষ্ঠায় !
গড়িছ, ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে, বিজ্ঞানে,
আপন স্রষ্টায় !

মানব-সমাজ-ধারার লক্ষ্য ঃ—

চিরদিন একে লক্ষ্য,—জীবনবিকাশ
পরিপূর্ণতায় !

এই যে মনুষ্য-সমাজের বিকাশের বৃত্তান্ত, এই যে অপরিণতি হতে পরিপূর্ণতার দিকে প্রবৃত্তি, এ কথা এই যুগে নতুন করে শোনা গেল। কোন যুগে এ কথা কেউ বল্‌তে সাহস পায়নি যে, বিশাল প্রকৃতির ক্রমবিকাশের অঙ্গীভাবে মানুষের সমাজও আপনাআপনি

নিজেকে নিজেই গড়ে তুলেছে—বাইরের কোন দেবতার কৃপা বা অদৃষ্টের হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা ছিল না। এ কল্পনার যেমনি সাহসিকতা, তেমনি মানুষ নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকতে বাধ্য হয়। এ যুগের খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম বা হিন্দু সমাজের যা ভাবতেও আতঙ্ক বোধ হত, পজিটিভিষ্ট্‌ ও অন্যান্য নাস্তিকের দল এসে ঠিক সেই কথাটিই বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল—"পুরাণো মত ও পথে আর কাজ চল্‌বে না, এ যুগের বিজ্ঞান দেখাচ্ছে আর দর্শন বোঝাচ্ছে, মানুষের ব্যাপারে মানুষই সবের উপরে, তাকে চালাবার কেউ নেই, বরং বাধা দেবার ঢের জিনিষ আছে। মানুষ শুধু নিজের লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারে নি বলেই সমাজে কত দুঃখ, কত দ্বন্দ্ব, কত দ্বিধা ও কত দৈন্যের চাপ সয়ে এসেছে। মানুষকে তার নিজের আসল গৌরবের স্থানে প্রতিষ্ঠিত কর, তার ইতিহাস অন্য রূপ ধারণ কর্‌বে।"

মানব-ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়েছে, খুব উঁচু আদর্শও বাস্তব ব্যাপারগুলি শোধন কর্‌তে গিয়ে ঠেকে গিয়েছে। যা শুধু চিন্তার, শুধু ভাবের বিলাসে বেশ মনোরম বোধ হয়েছে, তা দিনকয়েকের পরীক্ষাতেই ফাঁকা ব'লে ধরা পড়ে গিয়েছে; মাঝখান থেকে মুস্কিল হয়েছে এই যে, ভাল কথার খোলসটি রাস্তার মাঝখানে নতুন বিপদের ও আশঙ্কার কারণ হয়ে থাকৃত। আর মানুষের মন একটি বিচিত্র রহস্য; কতকাল থেকে ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি একে টেনে নিয়ে চল্‌তে, হাতের মুঠোর মধ্যে আয়ত্ত কর্‌তে চেয়েছে,—কিন্তু বারবার এ বেশ করেই এড়িয়ে চলেছে।

আমরা পজিটিভিষ্ট্‌ চিন্তার মূল অবধি তলিয়ে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারি, যা ধ্রুব বলে মনে করা হয়েছিল, তা মানব-মনের সহজ জীবন-

প্রবৃত্তির (instinct) সঙ্গে খাপ খায় নি। অথচ বাইরে ত খুবই জাঁক ছিল। পজিটিভিষ্ট্রা সকলরকম সভ্যতাকেই স্বীকার করে নিয়ে, সব মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ আদর্শের সৃষ্টি কর্তে চেয়েছিলেন। কোঁৎ যে Positivist Calendar তৈরি করেন, তাতে গ্রীস থেকে আরম্ভ করে তখনকার ইউরোপ, আবার এশিয়ার চীন থেকে আরম্ভ করে আরব অবধি সব দেশের জন্য জায়গা রাখা হয়েছিল—সব দেশের ধার্ম্মিক, বৈজ্ঞানিক, কবি ও দার্শনিকদের নামে বছর, মাস ও দিনের নাম রাখা হয়েছিল। কোঁৎ যেরূপ আটঘাট বেঁধে, দিনক্ষণ দেখে তাঁর মতবাদ গড়েছিলেন, মানবের মন কিন্তু সেরূপ ব্যাপক ও পাকাপাকি বন্দোবস্ত কোনকালেই বরদাস্ত করতে পারে নি। আরেকটি কথা এই যে, ব্যক্তির যেমন, সমাজেরও তেম্নি ভুল করবার, শোধ্রাবার ও মোটামুটি সাহস দেখাবার দরকার আছে—তা না থাক্লে জীবনের স্বাদটাই ত কমে যায়, বৈচিত্র্যেরও অভাব ঘটে। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর হাজারো ভাল কথায় এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নি।

কার্য্যকালে কোঁতের মতের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তা একবার দেখা যাক্। এ বিষয়ে একটি চমৎকার ঘটনার কথা জানা গিয়েছে। আমাদের দেশের একজন পজিটিভিষ্ট্ মিষ্টার কে, এম্, চ্যাটার্জ্জি একবার বিলেত যান। সেখানে গিয়ে পজিটিভিষ্ট্দের সঙ্গে মেলা-মেশার সুবিধে হবে বলে, বাঙ্লা দেশের পজিটিভিষ্ট্দের পাণ্ডা যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, তাঁকে এক চিঠি দেন। শ্রীযুত চাটুয্যে বিলেতে গিয়ে দেখ্লেন যে, ততদিনে সেখানকার পজিটিভিষ্ট্রা দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে, এবং এক দল আরেক দলকে নিন্দা ও আক্রমণ কর্তে আরম্ভ করেছে। তিনি একদিন একটি পজিটিভিষ্ট্ ভজনে গিয়ে

আচার্য্যের বক্তৃতাতে শুনলেন যে, European Humanity ও Asiatic Humanity নাকি আলাদা আলাদা জিনিস। এ কথা শুনেই আমাদের চাটুয্যে সাহেবের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল!

বাস্তবিকই শুধু মহামানবের দোহাই দিলে ত চলবে না—মহামানব ত আর ভূতের মত মানুষের ঘাড়ে এসে চেপে বসবে না! তার জন্য ব্যক্তিগত সাধনা অপেক্ষাও সমাজগত সাধনা বেশী দরকার। অথচ বর্ত্তমান কালের কোন সমাজ ধর্ম্ম, কোন সমাজ বাণিজ্য, ও কোন সমাজ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে মহামানবকে পদদলিত করতে মোটেই নারাজ নয়। তারপর মানব-সমাজের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বড় বড় অংশ-গুলি, আবার তাদের প্রত্যেকের ভিতরকার স্তরগুলি, একই সমতল ভূমিতে অবস্থিত নয়—তাদের বিকাশের ঢের তফাৎ আছে। সেই জন্যই একই মহা আদর্শ ব্যাপকভাবে চালানো সম্ভব হয় না।

এই প্রচেষ্টার ফল এক কথায় বোঝাতে গেলে এই বলতে হয় যে, আধুনিক যুগেও শুধু বিজ্ঞানের ভিত্তির উপরে নতুন ক'রে সমাজ গড়া চলল না। আর আমাদের তখনকার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের (individualism) যুগে মহামানবের দিকে মন দেবার অবসর ছিল না।

এই প্রবন্ধে পজিটিভিষ্ট্‌দের চিন্তাধারার কথা কিছু বলা গেল। অন্যান্য প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের মতামত আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীরমেশ বসু।

রবীন্দ্রনাথ।

(দ্বিতীয় স্তবক)*

There's not the smallest orb which thou beholdst
But in his motion like an angel sings,
Still quiring to the young eyed cherubims:
Such harmony is in immortal souls.

..... Shakespeare.

এ বৎসর ১০ই এপ্রিল তারিখে পণ্ডিচেরীর স্বনামধন্য লেখক ও কবি সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমি ও আমার এক বন্ধু কবিবরের অতিথি হ'য়ে দ্বিপ্রহরে পরমানন্দে রথীবাবুর আতিথেয়তার সদ্ব্যবহার করছিলাম, এমন সময়ে কবিবর আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন বেলা প্রায় একটা।

আমরা গেলাম। কবিবর বল্‌লেন: "ওহে দিলীপ, আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি একটা বিশেষ দরকারে—আমার একটা গানের সুর দিতে।"

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিরকম!"

কবিবর বল্‌লেন, "বিভীষিকার কোনও কারণ নেই হে। এটা তোমাকে ঠিক পরীক্ষা করা নয়। আমি দেখ্‌তে চাই তোমার সুর রচনার ভঙ্গীটি কিরকম।"

* প্রথম স্তবক আষাঢ়ের ভারতবর্ষে বাহির হয়।

আমি এ ভরসা সত্ত্বেও ত্রস্ত হ'য়ে বল্‌লাম, "কিন্তু আমার সুর রচনার ভঙ্গী ত আপনি জানেন। আমি সুরের বিস্তৃতি ও খেলানো ভালবাসি; আপনার গানে যেরকম ঢঙের সুর সর্ব্বেসর্ব্বা, তাতে খুব সম্ভবতঃ আমার সুর রচনার ভঙ্গী আপনার বিশেষ পছন্দ হবে না। আপনাদের সেই বিমুখতার ফলেই আমি সচরাচর আপনার গান গাই না, জানেন ত ?—সেজন্য আপনার অনেক অনুরাগী আমাকে আপনার গানের বিদ্বেষী ব'লে প্রচার ক'রে আমার প্রতি অবিচার ক'রে থাকেন। তাই এ thankless কাজ ক'রে লাভ কি ? গান গায় মানুষ আনন্দের জন্যে লোকের বিরাগভাজন হওয়ার জন্যে নয়। অথচ আমি হুবহু আপনার সুরের ভঙ্গীতে গেয়ে বা সুর রচনা ক'রে নিজের বৈশিষ্ট্যটুকু ছাড়তে মনকে রাজি করতে পারি না কোনোমতেই।"

কবিবর বল্‌লেন, "আহা হা, তুমি আমার ঢঙে সুর দেবে কেন বল ত ? আমি তা চাই নে মোটেই—সত্যি বল্‌ছি। কারণ তাহ'লে তোমায় ডেকে পাঠাতুম না। আমি একটু বুঝতে চাই তোমার সুরের ইমারৎ গ'ড়ে তোলার পদ্ধতিটি কি ?"

ব'লে "তোমার বীণা আমার মনোমাঝে" গানটি স্বহস্তে লিখে আমায় দিলেন।* শেষে বল্‌লেন, "আমি আমার নিজের সুরটি তোমায় শোনাব না। কেন না তাহ'লে সে সুরটির হয়ত খানিকটা প্রভাব তোমার দেওয়া সুরে এসে যেতেও পারে।"

আমি বল্‌লাম "ঠিক কথা। আপনার সুরটা পরে শোনাবেন

---

* গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে এই গানটি আমার দেওয়া সুরসহ আমি স্বরলিপিতে প্রকাশ ক'রেছি।

কিন্তু।" সুরটি দেওয়া হ'লে প্রথমে সুরেশচন্দ্রকে শোনালাম। কারণ আমার নিজের ভাল-লাগাটা এ বিষয়ে চরম প্রামাণ্য নাও হ'তে পারে মনে হ'ল। সুরেশচন্দ্র যখন অনুমোদন করলেন, তখন একটু ভরসা পাওয়া গেল।

তাই একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে কবিবরের কাছে তার পরদিন (১১ই এপ্রিল) সকালে গিয়ে হাজির হ'লাম। সুরেশচন্দ্র আর আমার অন্য বন্ধুটিও ছিলেন।

কবিবর গানটি শুনে আন্তরিক খুসি হ'লেন বলেই আমার মনে হ'ল * কিন্তু সেদিন মুখে শুধু "বেশ হয়েছে" ছাড়া আর কিছু বল্লেন না। তিনি খাড় নেড়েই আরম্ভ করলেন—"দেখ হে, তোমার সঙ্গে এই সূত্রে আমার একটা বিরাট আলোচনা করবার আছে ব'লেই এই পরীক্ষায় তোমায় ফেলেছিলাম।"

আমি কর্ণদ্বয় যথাসম্ভব খাড়া ক'রে নীরবে অবস্থান করে' রইলাম—কারণ আমার ইচ্ছা ছিল তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েই এ কথাবার্ত্তার একটা রিপোর্ট লিখ্‌ব। কবিবর আমার এ "ইয়ার্কি"

* এ কথাটা রবীন্দ্রনাথের দুই একজন আত্মীয় অসত্য ব'লে প্রচার ক'রেছেন। কেন ক'রেছেন বলতে পারি নে—তাঁরা সে-সময়ে বোলপুরে ছিলেনও না। এরূপ কথা প্রচার করা বড় দুঃখের বিষয় ব'লে বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি এইজন্যে যে, এ আলোচনার পরদিন (অর্থাৎ ১২ই এপ্রিল তারিখে) কবিবর ইতালিয়ান প্রফেসর Tuccicে আমাদের সাম্‌নে ব'লেছিলেন যে, তিনি আমাকে তাঁর একটি গানের সুর দেওয়ার পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। আমি তাতে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম—পরীক্ষায় পাশ হ'য়েছি ত? সত্যি বলুন।" তাতে কবিবর হেসে ব'লেছিলেন—"নিশ্চয়ই। ও গানটি তুমি গাইতে পার।"

প্রবৃত্তির জন্যে আমাকে বারবার পরিহাস করেছেন—কিন্তু তবু তাঁর সুন্দর কথাবার্ত্তাগুলি সাধ্যমত সাধারণকে দেবার প্রলোভন আমি সহজে সংবরণ করতে পারি নে।

কবিবর বল্‌তে আরম্ভ করলেন—"দেখ হে, আমার আগে একটা কথা মনে হ'ত যে, আমার গান প্রত্যেকেরই আমার সুরেই গাওয়া উচিত। আজকাল আমার মনে হয় যে, আমার সে ধারণাটি ঠিক নয়। কারণ নানা লোকে আমার গানকে নানা ভাবে দেখ্‌বেই †। তাদের যদি ইচ্ছে হয়—বেশ ত, আমার গানে তারা নিজের নিজের সুর বসিয়ে গাক্ না। ক্ষতি কি? কিন্তু তাই ব'লে যদি বলো যে, আমার দেওয়া সুরকেও তাদের ইচ্ছামতো বদ্‌লে সদ্‌লে গাইবার স্বাধীনতা থাকা উচিত, তাহ'লে আমি আপত্তি কর্‌ব।"

আমি বল্‌লাম, "কেন?"

—"কারণ আমার গানে আমি যে সুরটি দিয়েছি, সেটা আমার গানের বা সুরের কোনও একটি আইডিয়া বা প্রেরণার সুসম্বদ্ধ বিকাশ। তাই তার নড়চড় হ'তে দিলে, সে আইডিয়াটির সার্থক হ'য়ে ফুটে ওঠায় বাধা দেওয়া হবে নাকি?"

—"তাতে ক্ষতি কি, যদি এ নড়চড় হওয়ার ফলে একটা শ্রেষ্ঠতর আইডিয়ার বিকাশ ফুটে ওঠে?"

—"কিন্তু সে রায় দেবার ভার কার উপর? এ ক্ষেত্রে কোন্

---

† এই কথাই গত বৎসর বঙ্গবাণীতে "রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও সঙ্গীত" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি কবিবরকে ব'লেছিলাম ব'লে তাঁর অনেক অনুরাগী বড় রাগ ক'রেছিলেন আমার হঠকারিতায়।

বিচারপতির রায়ের পরে আর আপীল চলে না ব'লে ধ'রে নেব শুনি ?"

—"এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন মানি। কারণ আর্টের উৎকর্ষ অপকর্ষ নিয়ে মতভেদ সম্বন্ধে সেই চিরন্তন বিবাদের চরম মীমাংসা কেমন ক'রে হবে, সে কথা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাও জানেন ব'লেত মনে হয় না। তাই সুরের এদিক-ওদিক হওয়ার ফলে তার যে লাভ হবেই হবে—ক্ষতি কখনো হবেই না—এমন কথা জোর ক'রে কেউ বল্‌তে পারে না। সুতরাং এ 'রিস্ক্‌' নেওয়া ছাড়া উপায় কি ?"

—"কিন্তু এ 'রিস্ক্‌' নিতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি কার ?"

—"এরকম 'রিস্ক্‌' না নিলে আপনার গানের আবেদনকে আপনি একটু বেশিরকম সঙ্কীর্ণ ক'রে ফেল্‌বেন না কি ?"

—"আমি সঙ্কীর্ণ করছি কোথায় ? তোমার গানে তুমি যাকে সুরের সমৃদ্ধতর বিকাশ বলো, তাই যদি চাও,—বেশ ত' নিজের আলাদা সুর দাও না। তাতে ত' আমি এখন আগেকার মতন আপত্তি করছি না ? কিন্তু যদি আমার সুরই নেওয়া স্থির করো, তবে সে সুরকে আংশিক ভাবে নিলে কি আমার উপর যথোচিত মমতা দেখানো হবে ? সুর-রচয়িতার রচনার উপর হস্তক্ষেপ করলে তাতে ক'রে যখন তাকে খর্ব্ব করার সম্ভাবনাও রয়েছে, তখন সেটা করতে যাওয়ায় সে বেচারীর উপর কি একটা অবিচার করা হবে না ?"

—"কিন্তু শুধু খর্ব্ব করার সম্ভাবনাটিকেই বা আপনি সর্ব্বেসর্ব্বা ক'রে তুলে ধরছেন কেন ? তাকে উজ্জ্বলতর করবার সম্ভাবনাটিকেই বা এমন হতশ্রদ্ধা করছেন কেন ? যখন—"

—"রোসো, রোসো। সুরের পরিবর্ত্তনে তার উজ্জ্বলতর হ'য়ে

ওঠবার সম্ভাবনা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু বিপদটা যে তুমিও দেখ্‌ছ না! এ বদলে কাজটা ভাল হ'ল না মন্দ হ'ল, সে বিচার কে কর্‌বে?"

—"প্রবুদ্ধ লোকমত—সমজ্‌দার—"

—"কিন্তু স্থানীয় ও সাময়িক লোকমতকে কি অনেক সময়েই ভুল রায় দিতে দেখা যায় নি? আজ যেটা অবজ্ঞাত, মানুষ কাল সেটার গুণ গ্রহণ ক'রছে—এমনও ত দেখা গেছে? তাই তুমি যে বল্‌ছ যে, আমার সুরের উপর তুমি কণ্ঠক্ষেপ ক'রে তাকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুল্‌তেও পার, সে বিষয়ে তোমার আজকের মতামত ভুলও ত' হ'তে পারে?—যেটা পরের যুগের সমৃদ্ধতর আলোতে হয় ত ধরা পড়্‌তে পার্‌ত, যদি আমার সুরটি বজায় থাক্‌ত?"

—"কিন্তু আজকের মতামত ভুল যে নাও হ'তে পারে, এটাই বা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন? এ বিষয়ে কার রায় চরম ব'লে ধরা যাবে?"

—"সেটা স্থির করা যখন মুস্কিল ব'লে স্বীকার করছ, তখন কেন রচয়িতার অধিকারটাই মেনে নেও না? কবির লেখায় ত তোমরা হস্তক্ষেপ কর না? কিন্তু কর না কেন, যখন অনেক ক্ষেত্রে তা কর্‌লে হয়ত সে লেখাকে আরও সুমার্জ্জিত ক'রে তোলা যেতে পারে?"

—"কিন্তু এরকম উপমা যে খাটে না। আপনি নিজেই ত এ কথা আর একদিন স্বীকার ক'রেছিলেন—মনে পড়ে না কি?—যখন আপনি ব'লেছিলেন যে, কাব্য ও চিত্রকলা স্থির ব'লে তাদের ধ'রে রাখা সহজ, কিন্তু সঙ্গীত চলচঞ্চল, তাই স্বতঃই পরিবর্ত্তনশীল? আপনি

সেদিন ব'লেছিলেন যে, গানকে তাই গায়কের দয়ার উপর ঢের বেশি নির্ভর করতে হয়। আমার এ কথা খুব সত্য বলে' মনে হয়। কেননা কাব্য ও সঙ্গীতের বিকাশধারার একটা প্রধান তফাৎই যে এইখানে।"

—"আমি সে ভাবে উপমাটি দিই নি। আমি এ উপমাটি দিয়ে বল্‌তে চেয়েছিলুম শুধু এই কথাটি যে, বিভিন্ন শিল্পকলার বিকাশ-ধারার মধ্যে প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু একটা মূলগত ঐক্য আর সাদৃশ্যও আছে।"

—"সে সাদৃশ্যটি কি ?"

—"সে সাদৃশ্যটি হচ্ছে এই যে, কলাকারু ছন্দোহীন অরূপকে, অসীমকে মূর্ত্ত ও ভাস্বর ক'রে তুল্‌তে চায়, ছন্দোবদ্ধ সসীম রূপের মধ্যে। অসীমের যে এই সীমাকে স্বীকার ক'রে তবে রূপ পরিগ্রহ করতে হয়, এতে তার লীলা ব্যাহত হয় না—এতেই সে নিজেকে প্রকাশের মধ্যে দিয়ে পায়। স্বাধীনতার খর্ব্বতা অনেক সময়ে উচ্চতর সৃষ্টির সর্ত্তস্বরূপ হ'য়ে থাকে। অনেক নিম্নশ্রেণীর জীবের গতির স্বাধীনতা মানুষের চেয়ে বেশি—কিন্তু মানুষ তাই ব'লে তাদের চেয়ে ছোটশ্রেণীর সৃষ্টি নয়। কলাসৃষ্টিতে এ কথা আরও খাটে। কেন না সীমার মধ্যে নইলে যে অরূপকে রূপ দেওয়া যায় না। মেঘ এখনই এইরকম ছিল, পরক্ষণেই অন্যরকম হ'ল। তাই চিত্রকলা তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পারে না। চিত্রকলা করে কি ? না, তার একটা বিশেষ ভঙ্গিমাকে দৃঢ় ও অনড় ক'রে, তার স্বাধীনতা খর্ব্ব ক'রে তবে তাকে প্রকাশ করে। তাই কলাকারুর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে—গতিকে স্থিতির মধ্যে, ছড়িয়ে পড়াকে সংহত সৃষ্টির মধ্যে, এলোমেলোকে সুসম্বন্ধের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করা।"

চিন্তিত স্বরে বল্‌লাম—"কিন্তু সুরের স্বাধীন লীলার মধ্যে যে আনন্দ আছে, সেটা—"

কবিবর শান্ত স্বরে বল্‌লেন :—"সেটা আমি অস্বীকার করি নে। কিন্তু এ স্বাধীনতার রস সত্য হ'লেও, অন্য একটা বিশেষ রস ফুটে ওঠে যখন সুরের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সেই অব্যাহত লীলা আরও সংহত হ'য়ে ধরা দেয়—কোনও ছোট গানের মধ্যে। তুমি বল্‌বে, 'গানটা যে ছোট্ট'। আমি বল্‌ব, হোক্ ছোট্ট। কিন্তু এটা সুরের একটা শ্রেষ্ঠতর বিকাশের ফলেই সম্ভবপর হ'য়েছে। জুঁইও ছোট্ট, কিন্তু তাই ব'লে সে অকিঞ্চিৎকর নয়। সব বড় সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতেই সীমার মহিমা খুব বেশি।"

—তাহ'লে কি আপনি বল্‌তে চান যে, সীমার দড়ি যতই টেনে বাঁধবেন, ললিত কলার বিকাশও ততই মহনীয় হ'য়ে উঠ্‌বে?

কবিবর একটু ব্যস্ত স্বরে বল্‌লেন :—"তা আমি মোটেই বলি নি। যে ললিত সৃষ্টির মধ্যে কোনও রসই নেই, তাকে শুধু সীমার ছাঁচের মধ্যে ফেল্‌লেই সে বড় হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না। কিরকম জানো?—ধর, একটা গোলাপ ফুল ও একটা কাঁকর। গোলাপ ফুলের মধ্যে শুধু যে সীমা আছে তাই নয়, তার মধ্যে আছে বর্ণের দ্যোতনা, পাঁপড়ির সুসঙ্গতি, সুগন্ধের সমৃদ্ধি—এক কথায় সব-জড়িয়ে তার মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সুষমা (harmony) সাবলীলভাবে ধরা দিয়েছে। তাই গোলাপ একটা অপূর্ব্বসুন্দর সৃষ্টি। আর অন্য দিকে দেখ কাঁকর : তার মধ্যে আছে শুধু সীমা—সৌষ্ঠব বা সুষমার কোনও গরিমা নেই।"

একটু থেমে, তিনি বাইরের দিকে চেয়ে ব'লে যেতে লাগলেন :—

"এক কথায়, প্রতি বড় সৃষ্টির মধ্যে ভূমা ক্রমশই বিবর্দ্ধমান সীমাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে থাকে দেখা যায়, সেই জন্যে তা বড় হয়। কাজে কাজেই শুধু সীমাকে আঁকড়ে থাক্‌লেই যে সে বড় হ'য়ে উঠ্‌বে, এমন কথা বলা নিশ্চয়ই অতি অসঙ্গত। কি জানো?—সৃষ্টি প্রথমটায় থাকে এলোমেলো অবস্থায়—undifferentiated ; ক্রমে তার প্রকাশলীলা যতই স্ফুট হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে, ততই সে হ'য়ে পড়ে সুসম্বদ্ধ—differentiated। ফলে হয় এই যে, তার মধ্যে individuality-র বৈশিষ্ট্য ক্রমেই দুর্নিবার হ'য়ে ওঠে। কেন না এইটেই হচ্ছে জীবনের ও শিল্পকলার বিকাশের ধর্ম্ম। তাই ললিতকলার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সীমার দাবীও বেড়েই চলে, অথচ সেটা কলাকারুর মহত্ত্বের বিকাশের পরিপন্থী না হয়ে সহায়কই হ'য়ে থাকে।"

—কিন্তু গানের ক্ষেত্রে এ নীতির প্রয়োগ কর্‌তে গিয়ে কি তাহ'লে বল্‌তে হবে যে, রামপ্রসাদী ঝিঁঝিট কোনও হিন্দুস্থানী ঝিঁঝিটের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু রামপ্রসাদী ঝিঁঝিটটিতে সীমার বাড়াবাড়ি হিন্দুস্থানী ঝিঁঝিটটির চেয়ে বেশি?

—"তা আমি বল্‌ছি নে ত! কোনও কলাসৃষ্টি বড় হ'লে তবে তার মধ্যে সীমার দাবী বেশি হ'য়ে উঠে থাকে বলার মানে হচ্ছে নয় যে, সীমার কাষ্ঠবন্ধন বাড়ালেই কলাসৃষ্টিটি বড় হবে। যেমন একটু আগে দৃষ্টান্তস্বরূপ বল্‌লাম যে, গোলাপ ফুলটি কেন বড় ও কুকুরটি কেন ছোট—যদিও দুয়ের মধ্যেই সীমার দাবী প্রায় সমান।

আমার বলবার কথাটি হচ্ছে শুধু এই যে, ললিতকলার বিকাশের ধর্ম্ম হচ্ছে তার মধ্যে সীমার বৃদ্ধি; কেননা individuality-র ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়, এ সীমার দাবী স্বীকার ক'রে—অবাধ স্বেচ্ছাচারকে আলিঙ্গন ক'রে নয়। রামপ্রসাদী ঝিঁঝিট সম্বন্ধে তুমি অবশ্য রায় দিতে পার যে, সে সুরটি সীমাকে ঠিক তেমনিতর ভাবে আত্মসাৎ করতে পারে নি, তেমন ভাবে তাকে চালিত করতে পারে নি, তেমন প্রেরণার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি, যেমন ভাবে হ'লে রামপ্রসাদী ঝিঁঝিটটি হিন্দুস্থানী ঝিঁঝিটটির সমান বড় সৃষ্টি ব'লে গণ্য হ'তে পারত। এটা হ'ল সমালোচনার কথা। সমালোচনা তুমি কর না কেন? তাতে কে আপত্তি করছে?—কিন্তু পরীক্ষায় রামপ্রসাদী ঝিঁঝিটের স্বরবিন্যাস ভাল নম্বর পায় না ব'লেই এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, ঝিঁঝিটের স্বচ্ছন্দ অবাধ আলাপ সব সময়েই একটি সুন্দর সমাহিত ঝিঁঝিট গানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হ'তে বাধ্য। বস্তুতঃ ঠিক তার উল্টো। অর্থাৎ শিল্পকলার গতি যতই পরিণতি লাভ করে, তার প্রকাশের ধরণও সেই অনুপাতে অবশ্যম্ভাবী বা inevitable হ'য়ে ওঠে—যে কথা তোমার "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ" প্রবন্ধটিতে তুমি সেদিন প'ড়ে শোনাচ্ছিলে।"

—কিন্তু সুরের অব্যাহত লীলাবিলাসে যে আনন্দ পাওয়া যায়—

—তাকে কে অস্বীকার করছে? তা থেকে ত আনন্দ পাওয়াই উচিত। আমিও কি আনন্দ পাই নে?—খুবই আনন্দ পাই। একটা টোড়ি আলাপের মধ্যে যে আনন্দ নেই, এ কথা ত' আর আমি বলছি নে! আমি কেবল বলতে চাই এই কথাটি যে, টোড়ি আলাপে আনন্দ আছে ব'লেই বলা চলে না যে, প্রতি টোড়ি গানেই টোড়ির

পূর্ণ বিস্তারের আনন্দটি সমগ্রভাবে দিতে হবে। বাস্তবিক টোড়ি যে মুহূর্ত্তে একটি সুসম্বদ্ধ গানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ কর্‌ল, সেই মুহূর্ত্তে সে একটি বিশেষ individuality নিয়ে ফুটে উঠ্‌ল। এ কথাটা দু'চারটে উপমা দিয়ে একটু পরিষ্কার ক'রে বলি।

কোনও রাগিণীর আলাপ ও সেই রাগিণীতে রচিত একটি সুসম্বদ্ধ গানের মধ্যে তফাৎ কেমনধারা জানো?—প্রথমটা হচ্ছে যেন একটা প্রকাণ্ড মাছ—সবে বাজার থেকে কিনে আনা হয়েছে। তাকে ঝালে ঝোলে অম্বলে নানারকমে রাঁধা যেতে পারে। সমগ্র মাছটার দৃশ্য আমাদের আনন্দ দেয় না কি? খুবই দেয়—অর্থাৎ অবশ্য যদি আমরা মৎস্যরসের রসিক হই; কিন্তু কোনও তরকারীতে ঐ মাছের যে বিশেষ স্বাদটি ফুটে ওঠে, সেটা হচ্ছে ঐ রাগিণীতে বসানো একটি সুসম্বদ্ধ গানের রসের অনুরূপ। কিম্বা কোনও হিন্দুস্থানী রাগালাপকে তুলনা করা যেতে পারে সোনার একটা পরিষ্কার বাটের সঙ্গে, ও কোনও সুসম্বদ্ধ গানের উপমা দেওয়া যেতে পারে ঐ বাটের সোনা-দিয়ে-তৈরী কোনও বিশেষ আভরণের সঙ্গে। অর্থাৎ ঐ রাগিণীতে রচিত কোনও গান যে মুহূর্ত্তে 'হয়'—'গ'ড়ে ওঠে'—সেই মুহূর্ত্তে তার ধর্ম্ম হয় নিজের সে স্বরূপটি রক্ষা করবার প্রয়াস-পাওয়া। কারণ এইটেই হচ্ছে জীবনের ধর্ম্ম। সে ক্ষুদ্র হ'তে পারে, অসম্পূর্ণ হ'তে পারে, কিন্তু তাই ব'লে তাকে তার অসম্পূর্ণতার জন্যে রূঢ় আঘাতে নিষ্পিষ্ট করা অনুচিত। যে মুহূর্ত্তে সে 'হ'য়েছে', সেই মুহূর্ত্তে তার বাঁচবার একটা অধিকার জন্মেছে। এ অধিকার স্বীকার না-করা কেমন জানো?—যেন একটি ছোট শিশুকে বলা যে, যখন সে নামতা বা ভূগোল জানে না, তখন তার শিশুলীলা

সংবরণ করাই ভাল। সে বল্‌তে পারে—'হোক্ আমি নাম্‌তা ভূগোল জানি নে; হোক্ আমি দুর্ব্বল ও শত দোষত্রুটিতে ভরা; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমি হ'য়েছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমি বিধাতার কাছ থেকে বাঁচবার ও বিকশিত হবার সনন্দ নিয়ে এসেছি।'

—যা 'হ'য়েছে' তাই যে মহান্, এমন কথা কিন্তু—

—না, তা আমি বলিনি। যা-ই একবার হ'য়েছে তাই যে অমরতার রাজটীকা নিয়ে জন্মেছে, বা বিশ্বমানবের শ্রদ্ধার যোগ্য—এমন কথা বলা 'মুড়ি-মিছরির একদর' বলার সামিল। ধর না কেন, সাহিত্যক্ষেত্রে যদি শুধু হওয়াটাই চরম কথা হ'ত, তাহ'লে রাম শ্যাম যদু হরি সকলেই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ত—তাদের লেখা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সঙ্গে অবিনশ্বর শেল্‌ফে বিরাজ করবে ভেবে।

—তবে ?

—আমার ও কথা বলার মানে এই যে, হওয়ার একটা বিশেষ অবস্থা বা 'ষ্টেজ' আছে, যে 'ষ্টেজে' পৌঁছলে তবে সৃষ্ট বস্তুর এ জীবনের দাবী মঞ্জুর হ'তে পারে। এখন, কেবল সেই সৃষ্টি এ ষ্টেজটিতে পৌঁছনোর দাবী করতে পারে, যে-সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয়ে একটা সাঙ্গহীন অণুরণন তোল্‌বার শক্তি বিরাজমান।

—আপনার এ কথাটি আমার ভারি ভাল লাগ্‌ল। কারণ মানুষ প্রায়ই সেণ্টিমেণ্টালিজমের আঁধিতে এ সত্যটির প্রতি অন্ধ হ'য়ে, ঐ যা বল্‌লেন মুড়িমিছ্‌রির একদর ক'রে ব'সে থাকে ব'লে মনে হয়। সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ইতিহাসও এই সাক্ষ্যই দিয়ে এসেছে যে, জীবের চৈতন্যের বিকাশ যত আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, প্রবুদ্ধতর চৈতন্যের

বিকাশের জন্যে প্রকৃতি তাকে ততই সহজে বলি দেন। যেমন প্রাণী-জগত উদ্ভিদজগতের ধ্বংসে জীবন ধারণ করে; শ্রেষ্ঠতর প্রাণী নিম্নতর জীবের বলিদানে নিজের বিকাশ সাধন করে—ও শেষে হয় মানুষ, যার চৈতন্য বিকাশের সেই স্তরে পৌঁচেছে বলা যেতে পারে, যেখানে তার চৈতন্যের লীলার বিকাশের জন্যে তার জীবনের দাবী নিম্নতর শ্রেণীর জীবের চেয়ে বেশি ব'লে গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত ব'লেই মনে হয়।

—ঠিক কথা। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্তে এটা আরও বোধগম্য হবে। ধর না কেন, মুরগী আর তার ডিম। ডিমের মধ্যে চৈতন্যের বিকাশ ডিম-ফোটা মুরগীর মতন সুস্পষ্ট হয় নি ব'লে, ভক্ষিত হবার বিরুদ্ধে তার আপত্তি মুরগীর চেয়ে কম গ্রাহ্য।

ব'লেই কবিবর একটু হেসে বল্লেন—"দেখো হে, এ ক্ষেত্রে আমায় যেন ভুল বুঝো না যে, আমি এই ছলে তোমার কাছে নিরামিষ আহারের শ্রেষ্ঠতার 'প্রপাগাণ্ডা' করছি। কারণ তোমার কাছে ডিমের বাঁচবার দাবীর চেয়ে ছানার বাঁচবার দাবী যে বেশি অযৌক্তিক ব'লে গণ্য হয়েই হবে, এ কথা অন্ততঃ আমার কাছে যে অগোচর নেই, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্তে পার। বিশেষতঃ অতিথিকে ভয় দেখাতে নেই ব'লেই এ ভরসা তোমায় দিতে বাধ্য হ'লুম।"—আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

হাসি থাম্তে আমি বল্লাম—"কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্যে যে-সৌন্দর্য্যটি সমগ্রভাবে ফুটে উঠেছে, তার মহিমা—"

—কে অস্বীকার করছে?—আমি যে সত্যিই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত থেকে গভীর আনন্দের খোরাক নিত্য সংগ্রহ করি। তাই হিন্দুস্থানী

সঙ্গীতের মহিমা অযথা খর্ব্ব করা যে আমার উদ্দেশ্য হ'তেই পারে না, এ কথা তুমি নির্ভয়ে বিশ্বাস করতে পার। আমি বল্‌তে চাই কেবল এই কথাটি যে, ছোট ছোট সুসমাহিত গানের মধ্য দিয়ে কবিত্ব ও কল্পনার সুকুমার সৌন্দর্য্যটি যে-ভাবে ফুটে ওঠে, সেটার স্বতন্ত্র মাধুর্য্যের মহিমাকে বিচার করার মানদণ্ড আলাদা।" ব'লে একটু থেমেই আবার বল্‌তে আরম্ভ করলেন :—

"কিরকম জানো?—একটা উপমা দেই। ধর, একটি সুন্দরী জীবন্ত মেয়ে ও একটি সাধারণ মেয়ের ছবি। সুন্দরী মেয়েটি শুধু তার নারীত্ব ও সৌন্দর্য্যের জন্যেই আমাদের আনন্দ দিতে পারে, এবং দিয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ মেয়েটির মুখখানি ছবিতে কি আমাদের এমন একটা সত্য আনন্দ দিতে পারে না, যে-আনন্দ সে নিজে দিতে পারত না, বা যেটা তার দৈহিক সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ? কলানুরাগী চিত্রবিলাসী মানুষের সাক্ষ্য যুগ যুগ ধ'রে সাক্ষ্য দিয়ে এসেছে যে—পারে। এখন প্রশ্ন ওঠে,—কেমন ক'রে পারে, যখন মেয়েটি দেখ্‌তে মোটেই সুন্দর নয়? তার উত্তর এই—জীবন্ত সুন্দরীর সৌন্দর্য্য আমাদের একভাবে স্পর্শ করে—যাকে জীবনের আবেদন বল্‌তে পার; আর সাধারণ মেয়েটির 'ছবি' আমাদের অন্যভাবে স্পর্শ ক'রে থাকে, যাকে চিত্রকলার আবেদন বল্‌তে পার। অর্থাৎ চিত্রকর তোমার কাছে আশা করেন যে, তুমি ছবিকে ছবিভাবেই উপভোগ করতে শিখ্‌বে, জীবন্ত সৌন্দর্য্য থেকে যেরকম আনন্দ পাওয়া যায়, সেরকম আনন্দের জন্যে তাঁর কলাসৃষ্টির কাছে হাত পাতবে না; কেননা সে দান করতে তিনি অক্ষম। তাই যখন ছবি উপভোগ করতে যাবে, তখন চিত্রকরকে এ প্রশ্ন কোরো না যে, তিনি মেয়েটিকে

সুন্দরী ক'রে তোমাকে দর্শনেন্দ্রিয়ের আশু পরিতৃপ্তি দিতে উদ্যত হ'লেন না কেন? কারণ আর্ট থেকে সত্য রস সঞ্চয় করতে হ'লে যে কথাটা ভোলা চলে না, সেটা এই যে—চিত্রকরের লক্ষ্য নয়, বাহ্য সৌন্দর্য্যের চাক্‌চিক্যে আমাদের চিত্তহরণ করা; তাঁর আবেদনের প্রকৃতি ভিন্নশ্রেণীর, তাঁর লক্ষ্য স্বতন্ত্র। তাই যদি ছবিটির কলাকারু সুন্দর হয়, অর্থাৎ যদি তা চিত্রকলার লক্ষ্যভেদ করে, তাহ'লে ছবিটির বিষয়টি সুন্দর কি না, তাতে খুব আসে যায় না।"

—এ কথা কে না মান্‌বে?—কেবল আমার মনে মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন ওঠে যে, ছবির বিষয়টি সুদর্শন হ'লে সেটা সৃষ্টিগরিমায় আরও উচ্চস্থান অধিকার কর্‌ত কি না?

—অবশ্য এমন শিল্প আছে, যা দৃশ্যতঃ সৌন্দর্য্য নিয়েই ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু সেইটিই তার লক্ষ্যস্থল নয়, এইটেই আমার বল্‌বার কথা। কারণ একটু গভীরভাবে ভেবে দেখ্‌লে কি এ সত্যটি সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না যে, কলাকারু অনেক সময়েই বাহ্য সৌন্দর্য্যকে অবলম্বন না ক'রেই বড় হ'তে চায়, এবং তা' হয়েও ওঠে?

—এ কথা আপনি আপনার 'বিচিত্র প্রবন্ধে' গীতগোবিন্দের সহজ পদলালিত্যের সঙ্গে কুমারসম্ভবের উচ্চতর কবিত্বের তুলনায় লিখেছেন।

কবিবর খুসি হ'য়ে বল্‌লেন:—"ঠিক্ কথা। আমি জয়দেবের সঙ্গে কালিদাসের তুলনায় লিখেছি যে, ইন্দ্রিয়ের আশু তৃপ্তিসাধনের মানে হচ্ছে আমাদের মনের দ্বারীকে নগদ বিদায়ের উৎকোচে প্রসন্ন ক'রে তাড়াতাড়ি মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করবার চেষ্টা। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ঘুষে এ অধিকার ক্ষণিকের জন্যে লাভ করা

গেলেও, কোনমতেই কায়েম করা যায় না। অবশ্য দ্বারীকে বখ্‌শিষ দিলে তার খুসি হওয়াটা আট্‌কানো যায় না। যেমন 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন-কোমলমলয়সমীরে' আবৃত্তি করলেই কানটা খুসি হ'য়ে ওঠা ঠেকানো যায় না। কিন্তু উল্‌টো দিকে আবার হয় এই যে, শ্রবণেন্দ্রিয় রূপ দ্বারীকে এ ভাবে প্রসন্ন করতে গিয়ে অনেক সময়েই আমরা তার এলাকা ছাড়িয়ে মনোজগতের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে না করতে রসবিলাসিনী অন্তঃপুরবাসিনীর কাছ থেকে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ ক'রে ফিরে আস্‌তে বাধ্য হই। ললিতলবঙ্গলতার অনুপ্রাসের আনন্দ ঐ কারণেই আমাদের মনের নিভৃত নিকুঞ্জে সে ফুল ফোটাতে পারে না—যে ফুল ফোটাতে পারে কালিদাসের 'পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রার' কবিত্ব। এ কবিত্ব আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে ঠিক ধ্বনি-লালিত্যের সে আবেদনটি দিতে পারে না, যেটা গীতগোবিন্দের মুখ্য লক্ষ্য। কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ মেলে আমাদের মনের তৃপ্তিতে। কোনও রাগের সুন্দর আলাপকে আমি চিনির পানার সঙ্গে, আর কোনও গানের মধ্যে দিয়ে রাগটির সুসম্বদ্ধ পরিণতিকে সন্দেশের সঙ্গে তুলনা ক'রেছি এই জন্যে। যদি বল 'রাগটি মিষ্টি লাগ্‌ল যে'—তবে তার উত্তর এই যে—'মিষ্টি লাগ্‌বে না কেন? মিষ্টত্বের উপাদানেই যে সে গড়া। চিনির পানা আবহমানকাল বিশ্বমানবের মিষ্টিই লেগে এসেছে, ও সকলের কাছেই মিষ্টি লাগ্‌বে। তাকে কারুর নোন্‌তা লাগ্‌তে পারেই না। কিন্তু সন্দেশের সার্থকতা শুধু মিষ্টত্বে নয়, এই হচ্ছে আমার বল্‌বার কথা। তাই রাগের আলাপ এক জিনিষ, একটি সুসম্বদ্ধ গান অন্য জিনিষ। এ দুইয়ের উপভোগের মানদণ্ড আলাদা, কারণ এ দুইয়ের মধ্যেকার রসটি ভিন্ন শ্রেণীর। কেননা গানটির মধ্যে একটি

বিশেষ individuality যেরকম মনোজ্ঞভাবে ফুটে উঠেছে, নিছক আলাপের মধ্যে সে individuality-টি সেরকম ভাবে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নি। তাই রাগালাপের আদর্শ গানটির উপর চাপালে, তাতে ক'রে গানটির individuality-কে খর্ব্ব করারূপ অত্যাচার করা হ'য়ে থাকে। এটা অনুচিত ব'লেই আমার মনে হয়, কারণ শিল্পকলার inevitable হ'য়ে ওঠার পথ এই দিকেই—অজস্র তানালাপের দিকে নয়। তাই প্রতি গানের রচনার individuality-কে যদি তুমি না মানো, তাহ'লে তাতে ক'রে আর্টের এই বড় আদর্শটির পরিণতির বিরুদ্ধেই দাঁড়ানো হবে না কি? কেন না সব আর্টই সেই অনুপাতে বরেণ্য হ'য়ে ওঠে—যে অনুপাতে সৃষ্টি inevitable হয়।"

—এ কথা আমারও সত্য বলে' মনে হয়, আর অনেক হিন্দুস্থানী ভজন বা অধুনাতন উচ্চশ্রেণীর ঠুংরি খেয়ালে তানসংযমের ক্রমবিকাশের দৃষ্টান্ত বোধহয় আপনার এ কথাটির সত্যতার পরিপোষকতা করবে। কেবল আমার মনে হয় যে, অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত বাংলা সঙ্গীত—দু'চারটি গানে ছাড়া—এই individuality-র দিকে যে ভাবে পরিণতি লাভ ক'রেছে, তাতে ক'রে সে সব-জড়িয়ে এমন মহনীয় হ'য়ে ওঠে নি, যার ফলে তাকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এই individuality-র দিকে বাংলা গান এ-অবধি যে-ভাবে ফুটে উঠেছে, তার প্রগাঢ় মহিমা এত নয়, যার বলে সে সঙ্গীতরাজ্যে সৃষ্টি-গরিমায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে একাসন পাবার দাবী করতে পারে। তাই হিন্দুস্থানী গানকে চিনির পানা

ও আধুনিক বাংলা গানকে সন্দেশের সঙ্গে তুলনা করাটা কোনো মতেই সমর্থনীয় মনে হয় না !

—এটা গেল তোমার সমালোচনার কথা, আদর্শের কথা নয়। আদর্শটা যদি তুমি মেনে নাও, তাহ'লে সমালোচনা সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই। কারণ সমালোচনার এক্তিয়ার ত' রসগ্রাহীর আছেই আছে। তাই বাংলা গানকে যদি তুমি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি বল্‌তে না চাও, ত' তোমার সে স্বাধীন মতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার কোনও পীনাল কোডই নেই। তবে একটা বিষয়ে তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ।

আমি বল্‌লাম—"কি বিষয়ে ?"

—সেটা এই যে, হিন্দুস্থানী 'গান'কে আমি চিনির পানার সঙ্গে তুলনা করি নি, ক'রেছি অবাধ অব্যাহত রাগালাপকে আর অসম্বদ্ধ তানবিস্তারকে। কারণ এরকম বাধাবন্ধহীন তানালাপ বস্তুতঃ সঙ্গীতের undifferentiated অবস্থায় আছে বলা যেতে পারে।

—কিন্তু বড় কলাবিৎ কি আলাপের মধ্যেও রাগের এমন একটা বিশেষ রূপ দেন না, যেটা কেবল তাঁতেই সম্ভব ? যেমন ধরুন সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী—যাঁর বাজনার আপনি এত ভক্ত ?

—দেন বই কি, এবং দেন ব'লেই ত আমি তাঁর এত ভক্ত। আসল কথা—সীমার উত্তরোত্তর inevitable পরিণতিই হ'চ্ছে সৃষ্টির উত্তরোত্তর বিকাশের একটা প্রধান সর্ত্ত, এইমাত্র। তাই যে-সব হিন্দুস্থানী গানে বা সুরের পরিণতিতে এই inevitability বা সুসম্বদ্ধতার ছাপ দেখ্‌ব, তাকে বড় বল্‌ব না কেন ?—আমি হিন্দুস্থানী গানকে ত বাংলা নয় ব'লে ছোট করতে চাই নে। আমি বল্‌তে চাই

এই কথাটি মাত্র যে, 'হে গুণি, তোমার প্রতি গানের মধ্যে দিয়ে তুমি সুরের বিশেষ একটা উজ্জ্বল ও সুসম্বদ্ধ পরিণতি দেখাও, কেন না সীমার মধ্যে ভূমা এইভাবে উত্তরোত্তর মহনীয় সুষমার সঙ্গে আত্ম-প্রকাশ করলে তবেই ললিত-সৃষ্টি বড় হ'য়ে ওঠে।' তাই আমার কথাগুলিকে শুধু আধুনিক বাংলা গানের ওকালতী ব'লে যেন মনে ক'রে বোসো না। কারণ তাহ'লে লোকের মনে স্বতঃই সংশয়ের এই কুটিল কীট প্রবেশ করবে যে, আমি নানা ছলে বুঝি বা শেষটায় আমার নিজের গানকেই সঙ্গীতরাজ্যের চরম বিকাশ ব'লে প্রচার করবার দুরভিসন্ধি পোষণ করছি।"

আমরা সকলে হেসে উঠ্লাম।

তখনই শান্তিনিকেতনের পান্থনিবাসে গিয়ে এই কথাবার্ত্তা যতদূর মনে ছিল লিখে ফেল্লাম। পরদিন প্রাতে গিয়ে কবিবরকে প'ড়ে শোনালাম। কবিবর দুইটি স্থান একটু সংশোধন ক'রে দিয়ে আমাকে হেসে বল্লেনঃ—"ওহে দিলীপ, তোমার এত মনে থাকে কেমন ক'রে বল ত? তুমি কাল আলিপুরে তোমার সঙ্গে আমার যে সব কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল সে-সব যখন প'ড়ে শোনাচ্ছিলে, তখন আমার মনে হচ্ছিল—কি আশ্চর্য্য! এই সব কথা আমি সত্যিই ব'লেছিলাম ত বটে!"

আমি হেসে বল্লামঃ—"আশ্চর্য্য কেন? যাকে শ্রদ্ধা করেন, তার কথা কি আপনার মনে থাকে না?"

—না হে, না। স্মৃতিশক্তিটা আমার একদম নেই। আমার মাঝে মাঝে এমনও হ'য়েছে যে, নিজেরই কোনও গান শুনে মনে হয়েছে

গানটি ত নেহাৎ মন্দ নয়! তারপরে কিন্তু গানটি কে লিখেছে জিজ্ঞাসা ক'রে আমায় কিরকম অপ্রতিভ হ'তে হয়েছে সেটা—”

আমরা সকলে হেসে উঠ্‌লাম। পরে আমি বল্‌লাম:—“যদি কিছু মনে না করেন তবে কথোপকথনটি আমি প্রকাশ করতে চাই; যদিও জানি যে, কাল আপনি কথাগুলি যত চমৎকার ক'রে ব'লেছিলেন, আমার পক্ষে সেরকম ভাবে লেখা সম্ভব নয়। তবু এ ধরণের রিপোর্টের যে একটা অন্যরকম মূল্য আছে—এ কথা স্বীকার করলে হয়ত আপনি অনুমতি দিতে অসম্মত হবেন না।”

কবিবর বল্‌লেন:—“অত ভণিতা কেন হে? ছাপাও না, বেশ ত। যে কথা তোমাদের পাঁচজনকে বল্‌তে পারি, সে কথা না হয় পঁচিশ' জনই শুন্‌লে। আর তুমি না লিখ্‌লে যখন এ বিষয়ে আমি নিজে থেকে আর লিখ্‌তুমই না, তখন তুমি এ সব কথা প্রকাশ করতে চাইলে আমি সম্মতি দেব না-ই বা কেন?”

কবিবরের অনুপম চিন্তাপূর্ণ কথাগুলির উত্তরে সংক্ষেপে দু'চারটি মন্তব্য এই সঙ্গে প্রকাশ করা দরকার মনে করছি। ভবিষ্যতে দৃষ্টান্ত দিয়ে এ আলোচনা বিশদভাবে করবার ইচ্ছা রইল। অবশ্য কবিবরের যুক্তিগুলির সারবত্ত অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য হ'তেই পারে না। আমি কেবল ললিতকলার বিকাশের ধারা সম্বন্ধে কবিবরের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে, বর্ত্তমান বাংলা সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কোথায় তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হ'তে পারছি নে, সে বিষয়ে আমার দু' একটি সংশয় আজ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে চাই—এই মাত্র।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

কাব্য জিজ্ঞাসা।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

(১)

তত্ত্বজ্ঞেরা বলেছেন আত্মাকে জান্‌তে হ'লে নেতি নেতি করে' আরম্ভ কর্‌তে হয়। বুঝ্‌তে হয় আত্মা দেহ নয়, প্রাণ নয়, মন নয়, বিজ্ঞান নয়; তবেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপের প্রতীতি হয়। কাব্যের আত্মার সন্ধানে আলঙ্কারিকেরাও এই নেতির পথ নিয়েছেন। কাব্যের আত্মা তার শব্দার্থময় কথা-শরীর নয়, তার বাচ্যের বিশিষ্টতা নয়, তার রচনারীতির চমৎকারিত্ব নয়, তার অলঙ্কারের সৌকুমার্য্য নয়। কাব্যের আত্মা এ সবার অতিরিক্ত আনন্দস্বরূপ বস্তু, অর্থাৎ রস। কিন্তু এ আত্মা নির্গুণ, নিরুপাধিক আত্মা নয়, যেখানে পৌঁছলে "নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি", দেখার, শোনার, কি জানার আর কিছু থাকে না; দগ্ধকাষ্ঠ আগুনের মত সব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। কাব্যের রস সেই সগুণ, সক্রিয় আত্মা, "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো, নামানি কৃত্বাভিবদন্‌ যদাস্তে", যা নানা রূপের সৃষ্টি করে', তাকে নামের গড়নে বেঁধে, নিজের সেই সৃষ্টির মধ্যেই আবিষ্ট হয়ে বিরাজ করে। কবির কাজ পাঠকের চিত্তে রসের উদ্বোধন। কিন্তু রস কবির মন থেকে পাঠকের মনে সোজাসুজি উপায়নিরপেক্ষ সঞ্চারিত হয় না। শব্দ ও অর্থের, বাচক ও বাচ্যের উপায়কে আশ্রয় করেই কবি এই উদ্দেশ্য সাধন করেন। সুতরা

যদিও কবির চরম লক্ষ্য পাঠকের মনের ভাবকে রসে রূপান্তর করা, তাঁর কাব্য-সৃষ্টি হচ্ছে এই উপায়ের সৃষ্টি।

"আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবাঞ্জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ॥"

(ধ্বন্যালোক। ১।৯।)

'লোকে আলো চায়, কিন্তু তাকে জ্বালাতে হয় দীপশিখা। কবির লক্ষ্য রস, কিন্তু তাঁকে সৃষ্টি কর্‌তে হয় কাব্যের শব্দার্থময় কথাবস্তু।' এই কথাবস্তু যদি সহৃদয় পাঠকের মনে অভিপ্রেত রস সঞ্চারের উপযোগী হয়, তবেই কবির কাজ শেষ হ'ল। এর অতিরিক্ত তাঁর সাধ্যের অতীত। কারণ কাব্য কোনও পাঠকবিশেষের মনে রসের উদ্রেক করবে কিনা, তা কেবল কাব্যের উপর নির্ভর করে না, পাঠকের মনের উপরেও নির্ভর করে। কবি যে ভাবকে রস-মূর্ত্তি দিতে চান, যদি পাঠকের মন সে ভাব সম্বন্ধে কতকটাও কবির মনের সমধর্ম্মী না হয়, তবে সে পাঠকের কাছে কাব্য ব্যর্থ। এই কারণেই কবি বররুচি অরসিকের কাছে রস-নিবেদনের দুঃসহ দুঃখ থেকে ইষ্টদেবতার কাছে মুক্তি চেয়েছেন; আর ভবভূতি অনন্তকাল ও বিপুল পৃথিবীতে সমানধর্ম্মী পাঠকের কাছে একদিন না একদিন কাব্য পৌঁছবে, এই ভরসায় আশ্বস্ত হয়েছেন। কাব্যে কেন সকল লোকের মনে রসের অভিব্যক্তি হয় না, আলঙ্কারিকেরা বলেছেন তার কারণ ভাবের 'বাসনার' অভাব। "ন জায়তে তদা স্বাদো বিনা রত্যাদি-বাসনাম্॥" (সাহিত্যদর্পণ)। 'বাসনা' হচ্ছে, অনুভূত ভাব বা জ্ঞানের সংস্কারলেশ, যাকে আশ্রয় করে' পূর্ব্বানুভূতির স্মৃতি মনে

জাগ্রত হয়। এই 'বাসনা' আছে বলেই কাব্যের ভাব চিত্র মনে রসের সঞ্চার করে। আর এ 'বাসনা' নেই বলেই বালকের কাছে চণ্ডীদাসের কাব্য নিষ্ফল। কাব্য যে ভাবকে রসে পরিণত করতে চায়, যে পাঠকের মনে তার 'বাসনা' নেই, তার বয়স যতই হোক, সে কাব্যসম্পর্কে শিশু; অর্থাৎ ও কাব্য তার জন্য নয়। ভাবের অনুভূতি, সুতরাং 'বাসনা' আছে, কিন্তু তার 'রসের' আস্বাদন নেই—এরকম লোক অবশ্য অনেক আছে। আলঙ্কারিকেরা বলেন তার কারণ 'প্রাক্তন', অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। 'রসাস্বাদশক্তির স্বাভাবিক অভাব' বললে ভাষাটা আধুনিক শোনায় বটে, কিন্তু কথা একই থেকে যায়।

কাব্যের লক্ষ্য রস; শব্দ, বাচ্য, রীতি, অলঙ্কার, ছন্দ তার উপায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য ও উপায়ের যে বিশ্লেষণ, সে হচ্ছে বুদ্ধির কাব্যপরীক্ষার বিশ্লেষণ। কবির কাব্যসৃষ্টিতে ও সহৃদয়ের কাব্যের আস্বাদে, 'রস' ছাড়া এ সব উপায়ের স্বতন্ত্র পরিকল্পনা কি আস্বাদন নেই। কারণ কাব্যের বাচ্য, রীতি, ছন্দ, অলঙ্কার—এই সব ভিন্ন ভিন্ন বস্তু একত্র হয়ে কাব্যের রসকে সৃষ্টি করে না। রসই নিজেকে মূর্ত্ত করে' তোলার আবেগে কাব্যের এই সব অঙ্গের সৃষ্টি করে। যেমন নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলনে জীবশরীরে প্রাণের সৃষ্টি হয় নি, প্রাণশক্তিই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করে' নিজেকে তার মধ্যে প্রকাশ করেছে। সুতরাং কাব্যের এ সব অঙ্গ তার রসের বহিরঙ্গ নয়, তারা রসেরই অঙ্গ। "তস্মান্ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ" (ধ্বন্যালোক, ২।১৭, বৃত্তি)। অর্থাৎ রসবাদী আলঙ্কারিকেরা হচ্ছেন কাব্যমীমাংসায় অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী। চেতনাচেতন এই জগৎ পরমাত্মা ব্রহ্ম নয়,

কিন্তু তা থেকে ভিন্নও নয়। কাব্যের এই সব অঙ্গ কাব্যের আত্মা, রস নয়, কিন্তু রস থেকে ভিন্নও নয়। কারণ কাব্যের রস এই সব কাব্যাঙ্গ থেকে "পৃথগ্ব্যপদেশানর্হ," পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশের অযোগ্য। এই আপাতবিরুদ্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ কি করে' সম্ভব হয়, তা' তর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠার বিষয় নয়; তত্ত্বদর্শী ও কাব্যরসিকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বস্তু।

রসবাদীদের এই সিদ্ধান্ত যে কাব্যের ভূমি ছেড়ে তত্ত্বের আকাশে উধাও হওয়া নয়, তার প্রমাণে তাঁরা বলেন মহাকবিদের শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রেই দেখা যাবে যে, তার ভাষা কি অলঙ্কার "অপৃথগ্‌যত্ন নির্বর্ত্য," অর্থাৎ তার জন্য কবির কোনও পৃথক্ যত্ন করতে হয় নি। (১) কারণ—

"রসবন্তি হি বস্তূনি সালংকারানি কানিচিৎ।
একেনৈব প্রযত্নেন নির্বর্ত্যন্তে মহাকবেঃ ॥"

(ধ্বন্যালোক, ২।১৭, বৃত্তি।)

'কাব্যের রসবস্তু ও তার অলঙ্কার মহাকবির এক প্রযত্নেই সিদ্ধ হয়।' কেননা যদিও বিশ্লেষণ-বুদ্ধির কাছে তাদের রচনাভঙ্গী ও অলঙ্কারপ্রয়োগের কৌশলনিরূপণ দুর্ঘট ও বিস্ময়াবহ, কিন্তু প্রতিভাবান কবির রস-সমাহিত চিত্ত থেকে তারা ভিড় করে' ঠেলা-ঠেলি বেরিয়ে আসে। ("অলংকারান্তরানি হি নিরূপ্যমাণদুর্ঘটনান্যপি রসসমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেরহংপূর্ব্বিকয়া পরাপতন্তি।" ধ্বন্যালোক, ঐ।)

---

(১) রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্যত্ন নির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ ॥ (ধ্বন্যালোক, ২।১৭।)

Canst thou not minister to a mind diseas'd ;
Pluck from the memory a rooted sorrow ;
Raze out the written troubles of the brain ;
And with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart ?

এই কাব্যাংশের অদ্ভুত কবিকর্ম্ম, এর পরমাশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও কৌশল, এর ভাষা ও অলঙ্কারের বিস্ময়কর প্রকাশ-শক্তি, যা প্রতি ছত্রে দু'টি একটি কথায় উদ্দিষ্ট 'আইডিয়ার' পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলেছে,—রসজ্ঞ সমালোচক এগুলির প্রতি যে বিশ্লেষণবুদ্ধি প্রয়োগ করবেন, কবিকেও যদি তেমনি বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে হ'ত, তবে এ কাব্যের সৃষ্টিই হ'ত না। কবির দৃষ্টি সমাহিত ছিল তাঁর নাটকের হৃদয়শোষী যন্ত্রণাক্লিষ্ট চিত্তের নিদারুণ চিত্রের দিকে; আর তাঁর মহাপ্রতিভা তার কাব্যোপকরণ আপনি উপহার এনেছে, বুদ্ধি দিয়ে অন্বেষণ করে' তাকে আনতে হয় নি।

আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন এমনটি যে ঘটে, তার কারণ কবি তাঁর কাব্যের বাচ্য দিয়েই রসকে আকর্ষণ করেন; এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভাষা ও অলঙ্কার তার বাচ্য থেকে স্বতন্ত্র বস্তু নয়, তারা বাচ্যেরই অঙ্গ। ("যুক্তং চৈতৎ। যতো রসা বাচ্যবিশেষৈরেবা ক্ষেপ্তব্যাঃ। তৎ-প্রতিপাদকৈশ্চ শব্দৈস্তৎ প্রকাশিনে বাচ্যবিশেষা এব রূপকাদয়োঽলং-কারাঃ।" ২।১৭)। কালিদাসের উপমার যে খ্যাতি, তার কারণ এ নয় যে, সেগুলির উপমান ও উপমেয়ের মিলের পরিমাণ ও চমৎকারিত্ব খুব বেশী। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, সেগুলি কাব্যের বাচ্যকে

সাজানোর জন্য কটককুণ্ডলের মত বাইরে থেকে আনা অলঙ্কার নয়। সেগুলি বাচ্যের শোভা,—যৌবন যেমন দেহের শোভা। বাচ্য থেকে তাদের প্রভেদ করা যায় না, কিন্তু কাব্যের বাচ্যকে তারা রস আকর্ষণের অদ্ভুত ক্ষমতা দেয়।

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥

এর বাচ্য ও উপমার মধ্যে কোনও ভেদরেখা টানা যায় না। এর বাচ্যই উপমা, উপমাই বাচ্য। এবং ফলে শম্ভুর চিন্তাতেও যে অধৃষ্য রূপ, যা দেখে মদনের হাত থেকেও ধনু ও শর খসে পড়েছিল, তার দীপ্ত-গম্ভীর রসে পাঠকের চিত্ত ভরে যায়।

সব শ্রেষ্ঠ কাব্যের অলঙ্কারের এই এক ধারা। মহাভারতের বিদুলার উপাখ্যানে বিদুলা তার শত্রুনির্জ্জিত, দীনচিত্ত, নিরুদ্যম পুত্রকে উত্তেজিত করছে,—

অলাতং তিন্দুকস্যেব মুহূর্ত্তমপি হি জ্বল।
মা তুষাগ্নিরিবানর্চ্চিধূমায়স্ব জিজীবিষুঃ॥
মুহূর্ত্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন তু ধূমায়িতম্ চিরম্।

'তিন্দুকের (২) অঙ্গারের মত এক মুহূর্ত্তের জন্যও জ্বলে ওঠ; প্রাণের মায়ায় শিখাহীন তুষের আগুনের মত ধূমায়মান থেক না। চিরদিন ধূমায়িত থাকার চেয়ে মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলে' ভস্ম হওয়াও শ্রেয়।' এর বাচ্য ও অলঙ্কারে ভেদ নেই, এবং সেই অভেদ এই দেড়টি শ্লোককে রসোদ্বোধনের আশ্চর্য্য শক্তি দিয়েছে। রামায়ণে হেমন্তের নিষ্প্রভ চন্দ্রের বর্ণনা,—

---

(২) গাব গাছ।

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারাবৃতমণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥

'তুষারাবৃত আকাশে নিঃশ্বাসান্ধ দর্পণের মত চন্দ্র প্রকাশহীন'—এ উপমা একটা উদাহরণ নয়; হেমন্তের বিলুপ্তজ্যোতি চন্দ্রের সমস্তটা রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের "পঁচিশে বৈশাখ",—

আর সে একান্ত আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয়-তলে ল'য়ে মোর প্রাণ দেবতার
স্বহস্তেসজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তা'রি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।

এর বাচ্য ও অলঙ্কারে প্রভেদ করবে কে? কারণ এর অলঙ্কার এর বাচ্যের শোভা নয়, রূপ। আর তাতেই এ কবিতার বাচ্যের পেয়ালা থেকে কাব্যের রস উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে।

(২)

আলঙ্কারিকেরা যখন বলেন কাব্যের 'বাচ্য' তার দেহ, 'রীতি' যেন অবয়বসংস্থান, 'অলঙ্কার' কটককুণ্ডলাদির মত আভরণ (৩)—তখন তাঁরা নিম্ন অধিকারীর জন্য কাব্যের বাহ্য তত্ত্ব বলেন, নিগূঢ় চরম তত্ত্ব নয়। কারণ কাব্যে তার বাচ্য, রীতি, অলঙ্কারের কোনও

(৩) "অলঙ্কারাঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ। রীতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষবৎ। দেহদ্বারেণেব শব্দার্থদ্বারেণ তমেব কাব্যস্যাত্মভূতরসমুৎকর্ষয়ন্তঃ কাব্যস্যোৎকর্ষকা উচ্যন্তে।" (সাহিত্যদর্পণ।)

স্বাতন্ত্র্য নেই, তারা একান্ত রসপরতন্ত্র। রীতি ও অলঙ্কার যদিও বাহ্যত বাচ্যের ভঙ্গী ও আভরণ, বস্তুত তাদের ভঙ্গীত্ব ও আভরণত্ব হচ্ছে কাব্যের রসের সম্পর্কে। যেমন অভিনব গুপ্ত বলেছেন, 'উপমা কাব্যের বাচ্যার্থকেই অলঙ্কৃত করে, কিন্তু বাচ্যার্থের তাই হচ্ছে অলঙ্কার, যা তাকে ব্যঙ্গ্যার্থের অভিব্যঞ্জনার সামর্থ্য দেয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কাব্যের আত্মা অর্থাৎ তার রসধ্বনিই হচ্ছে অলংকার্য্য। কটককেয়ূরাদি যে শরীরে পরানো হয়, তাতেও নিজের চিত্তবৃত্তি-বিশেষের ঔচিত্যসূচক বলে' চেতন আত্মাই অলঙ্কৃত হয়। সেই জন্যই চেতনাহীন শবশরীর কুণ্ডলাদির যোগে শোভাপ্রাপ্ত হয় না। কারণ সেখানে অলংকার্য্য বস্তুর অভাব। গৃহত্যাগী যতির শরীরে কটকাদি অলঙ্কার শোভা নয়, হাস্যাবহ। কারণ সেখানে অলংকরণের ঔচিত্যের অভাব। কিন্তু দেহের ত ঔচিত্য অনৌচিত্য কিছু নেই; সুতরাং বস্তুত আত্মাই হচ্ছে অলংকার্য্য।' ("উপময়া যদ্যপি বাচ্যোঽর্থোঽলংক্রিয়তে তথাপি তস্য তদেবালংকরণং যদ্ব্যঙ্গ্যার্থাভিব্যঞ্জনসামর্থ্যাধানমিতি। বস্তুতো ধ্বন্যাত্মৈবালংকার্যঃ। কটককেয়ূরাদিভিরপি হি শরীরসমবায়িভিশ্চেতন আত্মৈব তত্তচ্চিত্তবৃত্তি বিশেষৌচিত্যসূচনাত্মতয়ালংক্রিয়তে। তথাহ্যচেতনং শবশরীরং কুণ্ডলাদ্যুপেতমপি ন ভাতি। অলংকার্য্যস্যাভাবাৎ। যতিশরীরং কটকাদিযুক্তং হাস্যাবহং ভবতি। অলংকার্য্যস্যানৌচিত্যাৎ। ন চ দেহস্য কিংচিদনৌচিত্যমিতি বস্তুত আত্মৈবালংকার্যঃ।"—ধ্বন্যালোকলোচন, ২।৬)। অর্থাৎ কাব্যের যা কিছু, তার একমাত্র মাপকাঠি কাব্যের রস। কাব্যের 'গুণ' অর্থে, যা তার রসকে উৎকর্ষ দেয়; কাব্যের 'দোষ' আর কিছু নয়, যা তার রসের লাঘব ঘটায়। কাব্যের ভাষা, বাচ্য, রীতি ও অলঙ্কারের যে

দোষগুণ বলা হয়, সেটা উপচার মাত্র। "অপি ত্বাত্মভূতস্য রসস্যৈব পরমার্থতো গুণা মাধুর্য্যাদয়ঃ, উপচারেণ তু শব্দার্থয়োঃ।" (অভিনব গুপ্ত।) 'মাধুর্য্য প্রভৃতি যে গুণ, তা পরমার্থত কাব্যের আত্মাস্বরূপ রসেরই গুণ। শুধু ব্যবহারিক ভাবে তাদের শব্দ ও অর্থের গুণ বলা হয়।'

সুতরাং কাব্যের ভাষা, রীতি বা অলঙ্কারের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম অসম্ভব। কেন না রস ছাড়া এদের আর কোনও নিয়ামক নেই। পূর্ব্বিতন কবিদের কাব্যপরীক্ষায় যদি তাঁদের ব্যবহার থেকে কোনও সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারও করা যায়, নবীন কবির কাব্য-প্রতিভা হয়ত সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে চলে' সমান রসোদ্বোধক কাব্যের সৃষ্টি করবে। কাব্যের বাচ্য বা বিষয় সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। কোন শ্রেণীর বিষয়কে অবলম্বন করে' কবি তার কাব্য রচনা করবে, তার গণ্ডী এঁকে দেওয়া সম্ভব নয়। কবির প্রতিভা, অভিনব গুপ্ত যাকে বলেছেন 'অপূর্ব্ববস্তুনির্ম্মানক্ষমা প্রজ্ঞা', সে যে কোন অপূর্ব্ব কথা-বস্তুর সৃষ্টি করে' রসকে আকর্ষণ করবে, আগে থেকে কে তা নির্ণয় করতে পারে? সেই জন্য আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন, "তস্মান্নাস্ত্যেব তদ্বস্তু যৎ সর্ব্বাত্মনা রসতাৎপর্য্যবতঃ কবেস্তদিচ্ছয়া তদভিমতরসাঙ্গতাং ন ধত্তে"। (৪) 'এমন বস্তু নেই যা রসতৎপর কবির ইচ্ছায় তাঁর অভি-মত প্রকাশোপযোগী অঙ্গত্ব না ধারণ করে।' কারণ,

"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।" (৪)

বস্তুর জগতের মত কাব্যের জগতও সীমাহীন, এবং এ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হচ্ছেন কবি। সৃষ্টির কাজে নিজের প্রতিভার নিয়ম ছাড়া আর কোনও নিয়ম তাঁর উপর চলে না।

"ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া।" (৪)

কাব্যে কবির ব্যবহার স্বাধীন, কেননা এখানে তিনি স্বতন্ত্র,—বাইরের কোনও কিছুর পারতন্ত্র্য তাঁর নেই।

(৩)

কবিকে নিজের প্রতিভার যে নিয়ম মান্‌তে হয়, সুতরাং কাব্য-বিচারের যা একমাত্র নিয়ম, আলঙ্কারিকেরা তার নাম দিয়েছেন 'ঔচিত্য', অর্থাৎ অভিপ্রেত রসের উপযোগিত্ব।

"বাচ্যানাং বাচকানাং চ যদৌচিত্যেন যোজনম্।
রসাদি বিষয়েণৈতৎকর্ম্ম মুখ্যং মহাকবেঃ॥"

(ধ্বন্যালোক, ৩।৩২।)

'মহাকবির মুখ্য কবি-কর্ম্ম হচ্ছে রসের অভিব্যঞ্জনার উপযোগী করে' কাব্যের বাচ্য ও বাচকের উপনিবন্ধন।' সুতরাং কাব্যের কথা ও রীতি, ছন্দ ও অলঙ্কার, এদের বিচারের অদ্বিতীয় বিধি হচ্ছে—কাব্যের রসসৃষ্টিতে কার কতটা দান, তার বিচার করা; আলঙ্কারিকদের ভাষায়, এদের রসের 'অনুগুণত্বের' পরিমাণ নির্ণয় করা। এ ছাড়া আর কোনও নিক্তি এখানে অচল ও অপ্রাসঙ্গিক।

"অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎপরা॥"

(ধ্বন্যালোক, ৩।১০-১৪, বৃত্তি।)

---

(৪) ধ্বন্যালোক, ৩।৪২,৪৩ (বৃত্তি)।

'অনৌচিত্য ছাড়া কাব্যের রসভঙ্গের আর কোনও কারণ নেই। এই ঔচিত্যবন্ধই রসের উপনিষৎ, কাব্য-তত্ত্বের পরা-বিদ্যা।'

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশে তর্ক উঠেছে—শ্রীরামচন্দ্রকে রামায়ণ থেকে কতকাংশে ভিন্নচরিত্রের কল্পনা করে' চিত্রিত করবার অধিকার কোনও আধুনিক কবির আছে কিনা। এক দল পণ্ডিত বল্‌ছেন, ও অধিকার নেই; কারণ শ্রীরামচন্দ্রকে হিন্দুরা দেবতাবোধে পূজা করে; সে চরিত্রের বিকৃত অঙ্কণে হিন্দুর মনে, অর্থাৎ তাদের ধর্ম্মভাবে, আঘাত লাগে। প্রাচীন হিন্দু আলঙ্কারিকেরা বল্‌তেন, কাব্য-বিচারে ও-যুক্তি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। কাব্যের কোনও চিত্র বা চরিত্র কারও ধর্ম্মবিশ্বাসে ঘা দেয় কি না, কাব্যত্বের বিচারে সে প্রসঙ্গের কোনও মূল্য বা প্রসার নেই। হতে পারে সেটা সামাজিক হিসাবে দূষ্য। এবং আঘাতপ্রাপ্ত ধর্ম্মের ধার্ম্মিক লোকের গায়ের জোর যদি বেশী হয়, তবে তারা কবির মুখ বন্ধ করেও দিতে পারে; যেমন রাজনৈতিক হিসাবে দূষ্য বলে' রাজা কাব্যবিশেষের প্রচার বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু তা দিয়ে কাব্যের কাব্যত্বের ভালমন্দ কিছু বিচার হয় না। এ মতকে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মত বল্‌ছি, কেবল তাঁদের কাব্যবিচারের সূত্র থেকে অনুমান করে' নয়। কারণ, ঠিক এই প্রশ্নই তাঁরাও তুলেছেন এবং মীমাংসা করেছেন; কেননা আদিকবির পর বহু সংস্কৃত কবি রামচন্দ্রকে নায়ক করে' কাব্য ও নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের তর্ক ও মীমাংসা, এ দুয়েরই ধারা নবীন বাঙ্গালী হিন্দুর তর্ক ও মীমাংসা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের বিচারের ফল একটি পরিকরশ্লোকে সংক্ষেপ করা আছে।

"সন্তি সিদ্ধরসপ্রখ্যা যে চ রামায়ণাদয়ঃ।
কথাশ্রয়া ন তৈর্যোজ্যা স্বেচ্ছা রসবিরোধিনী ॥"

(ধ্বন্যালোক, ৩।১০-১৪, বৃত্তি।)

'রামায়ণ প্রভৃতি যে সব কাব্য সিদ্ধরসতুল্য, তাদের কথাতে এমন কথা যোগ করা চলে না, যা তাদের রসের বিরোধী'। 'সিদ্ধরস' কাব্য কাকে বলে, তা অভিনব গুপ্ত বুঝিয়েছেন,—"সিদ্ধ আস্বাদমাত্রশেষো ন তু ভাবনীয়ো রসো যেষু"; 'যে কাব্যের রস রসসৃষ্টির উপায়কে অতিক্রম করে' পাঠকের মনে আস্বাদমাত্রে পরিণত হয়েছে'। অর্থাৎ, যে কাব্য লোকসমাজে এতই প্রচলিত ও পরিচিত যে, তার রসের আস্বাদ যেন তার কথাবস্তুনিরপেক্ষ পাঠকের মনে লেগে আছে। তার কাব্য-কথা পাঠকের মনে যে রসের তারে গভীর ঘা দিয়েছে, তার বিশেষ সুর পাঠকের মনে বেজেই আছে। নূতন কাব্যের কোনও কথায় যদি সে সুরের বেসুর কিছু বাজে, তবে তার রসভঙ্গ অনিবার্য্য। সুতরাং তেমন কথা 'ঔচিত্যের' ব্যতিক্রম। কিন্তু এ 'ঔচিত্য' রসের ঔচিত্য—সমাজ বা ধর্ম্মের ঔচিত্য নয়।

আধুনিক কালের আর একটা তর্ক, 'রিয়ালিজ্‌ম্‌' ও 'আইডিয়া-লিজ্‌ম্‌', বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্রের বিবাদকে, আলঙ্কারিকেরা 'ঔচিত্যের' বিধি দিয়ে বিচার করেছেন। কাব্যের লক্ষ্য রস। রস ভাবের পরিণতি। কিন্তু ভাব নিরালম্ব জিনিষ নয়, বস্তুকে আশ্রয় করেই জন্মায় ও বেঁচে থাকে। কবি ভাবের এই বস্তুকে কথা-শরীর দিয়েই রসের উদ্বোধন করেন। সুতরাং কাব্যের কথা-বস্তু যদি ভাবের প্রাকৃত বস্তুর যথাযথ চিত্র না হয়, তবে রসোদ্বোধের বাধা ঘটে। আলঙ্কারিকেরা একে বলেছেন—'ভাবৌচিত্য' বা 'প্রকৃত্যৌচিত্য'।

আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন, 'সেইজন্য লৌকিক মানুষ নিয়ে যে কাব্য, তাতে সপ্তার্ণবলঙ্ঘন প্রভৃতি ব্যাপারের অবতারণা বর্ণনামহিমায় সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হলেও, কাব্যত্ব হিসাবে নীরস। এবং তার হেতু হচ্ছে 'অনৌচিত্য'। ("তথা চ কেবল্ মানুষস্য রাজাদের্বর্ণনে সপ্তার্ণব লঙ্ঘনাদি লক্ষণা ব্যাপারা উপনিবদ্ধমানাঃ সৌষ্ঠবভৃতোঽপি নীরসা এব নিয়মেন ভান্তি। তত্র ত্বনৌচিত্যমেব হেতুঃ।" ধ্বন্যালোক, ৩।১০—১৪, বৃত্তি।) ব্যাখ্যায় অভিনব গুপ্ত বলেছেন, 'বর্ণনা এমন হবে, যেন তাতে পাঠকের প্রতীতি খণ্ডন না হয়'। ("যত্র বিনেয়ানাং প্রতীতিখণ্ডনা ন জায়তে তাদৃগ্ বর্ণনীয়ম্।") কাব্যের জগৎ বস্তুর জগৎ নয়, মায়ার জগৎ—এ কথা সত্য। কিন্তু বস্তুনিরপেক্ষ মায়া হয় না; সুতরাং সম্পূর্ণ অবাস্তব কাব্য অসম্ভব। এবং কাব্যের কথা-বস্তুর বস্তুপরতার লাঘবতা যদি তার রস-আকর্ষণ শক্তির হীনতা ঘটায়, তবে সে লাঘবতা কাব্যের দোষ। কিন্তু কথা-বস্তুর লক্ষ্য বস্তু নয়, রস। কাব্য যে বস্তুকে চিত্রিত করে, সে তার বাস্তবতার জন্য নয়, রসাভিব্যক্তির জন্য। কাজেই উপায় যদি উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে যায়, তবে ঠিক বিপরীত অনৌচিত্যের দোষে কাব্যের রসভঙ্গ হয়। বস্তুর বাস্তবতা অনন্ত। কোনও কবিই তার সবটাকে কাব্যের কথা-বস্তুতে স্থান দিতে পারেন না। যদি পারতেন, তবে ফলে যা সৃষ্টি হ'ত, তা আর যা-ই হোক—কাব্য নয়। সুতরাং ঐ বাস্তবতার কতটা কোন কাব্যে স্থান পাবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই কাব্যের উদ্দিষ্ট রসের উপর, ও কবির প্রতিভার বিশেষত্বের উপর। বস্তুর বাস্তবতার যে অংশ কাব্যের রসকে অভিব্যঞ্জিত বা পরিপুষ্ট না করে, সে অংশ কাব্যের অঙ্গ নয়, কাব্যের বোঝা। আলঙ্কারিকেরা বলেছেন,—

"যস্মিন্ রসো বা ভাবো বা তাৎপর্য্যেণ প্রকাশ্যতে।
সংবৃত্ত্যাভিহিতং বস্তু যত্রালংকার এব বা।"

(ধ্বন্যালোক, ৩।৪২—৪৩, বৃত্তি।)

"শ্রেষ্ঠ কাব্যের রসই প্রধান হয়ে ব্যক্ত হয়, তার বস্তু ও অলঙ্কার যেন গোপন থাকে'। অর্থাৎ আলঙ্কারিকদের মতে, কাব্যে অলঙ্কারের আতিশয্য ও বাস্তবতার আতিশয্য একই শ্রেণীর দোষ। কারণ দুই আতিশয্যই উদ্দিষ্ট রসকে প্রধান না করে', উপায়কেই প্রধান করে' তোলে।

বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র রসসৃষ্টির দুই ভিন্ন কৌশল। কোন কবি কোন কাব্য-কৌশল অবলম্বন করবেন, তা নির্ভর করে তাঁর প্রতিভার বিশেষত্বের উপর। এই দুই কৌশলের সৃষ্ট রসের মধ্যে আস্বাদের প্রভেদ আছে, কিন্তু রসত্বের প্রভেদ নেই। সুতরাং কেউ কাউকে কাব্যের জগৎ থেকে নির্ব্বাসন দেবার অধিকারী নয়। এক আস্বাদের রসভোগে অরুচি হলে, হয় ত কিছুদিন কাব্য-পাঠকের অন্য আস্বাদের রসে একান্ত রুচি দেখা যায়। এই রুচিপরিবর্ত্তন দিয়ে কাব্যের কাব্যত্ব বিচার হয় না। শকুন্তলার বিদূষক বলেছিল,—পিণ্ড-খর্জ্জুরে অরুচি হ'লে তেঁতুলের দিকে রুচি যায়।

'শেষ-প্রস্তাব' উপরে লিখেই এ প্রস্তাব আরম্ভ করেছিলেম। কিন্তু বলার যা বাকী আছে, তা এখানেই লিখতে গেলে 'অনৌচিত্য' দোষ ঘটবে—রসের নয়, দৈর্ঘ্যের। আগামী প্রস্তাব শেষ প্রস্তাব হবে, আপাততঃ এই প্রতিজ্ঞা করে' এ প্রস্তাবের উপসংহার করা গেল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

সমালোচনা। *

আমরা যারা লিখি, আমরা সকলেই চাই যে, আমাদের লেখার অপরে সমালোচনা করুক। এর কারণও অতি স্পষ্ট। লেখক-মাত্রেই লেখেন পাঠকের জন্য। যদি আমাদের লেখা সম্বন্ধে সকলে নীরব থাকেন ত বুঝতে পারিনে যে, সে লেখা কেউ পড়েছেন কি না। অপরপক্ষে তার সমালোচনার সাক্ষাৎ পেলেই আমরা এই মনে করে কতকটা স্বস্তি অনুভব করি যে, অন্তত একজন পাঠকও তা পড়েছেন।

সমালোচনামাত্রেই যে স্তুতিবাচক হবে এমন কোনও কথা নেই; বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তার ঠিক উল্টো হয়। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, তাতে লেখকদের বড় বেশি আসে যায় না।

আমরা সকলেই অবশ্য প্রশংসালোভী; এবং একজন পাঠকও যদি আমাদের রচনার সুখ্যাতি করেন, তাহলেই আমরা হাতে স্বর্গ পাই। কিন্তু সমালোচকের মুখে প্রশংসার মত নিন্দারও একটা বিশেষ মূল্য আছে। নিন্দার প্রসাদেও আমাদের লেখা জনসমাজে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞাপন হিসেবে কোন বইয়ের নিন্দা ও প্রশংসার মধ্যে কোন্‌টি বেশী মূল্যবান বলা কঠিন। অনেক

---

* কল্লোলের জন্য লিখিত।

সমালোচক-নিন্দিত সাহিত্যও যে সমাজে দিব্যি চলে যায়, তার প্রমাণ দেদার আছে। একখানি সেকেলে কাব্যের নাম করলেই বুঝতে পারবেন যে, আমার কথা ঠিক। বিদ্যাসুন্দরকে অনেকদিন থেকেই লোকে অপাঠ্য বলে আস্‌ছে। অথচ আমার বিশ্বাস বিদ্যাসুন্দরের প্রচলন বাঙালী সমাজে মোটেই কম নয়। ইংরেজীশিক্ষিত সমাজে ও-কাব্যের নিন্দা ত বহুকালাবধি সকল শিক্ষিত লোকের মুখেই শোনা গিয়েছে, তৎসত্ত্বেও ভারতচন্দ্রকে কবি বলতে আজকের দিনে আমরা ভয় পাইনে। যে কারণে ভারতচন্দ্র নিন্দিত, সে কারণে আজকের দিনে যদি কোনও লেখক নিন্দিত হন, তাহলে সে নিন্দা তাঁর পক্ষে একটা মস্ত বিজ্ঞাপন হবে।

সে যাই হোক্, এ কথা নির্ভুল যে, আমরা লেখকরা চাই সমালোচকদের কাছ থেকে নিন্দা নয়—প্রশংসা। এ আমাদের জাতিধর্ম্ম। লেখকেরা আবহমানকাল প্রশংসার ভিখারী ছিলেন, আজও আছেন। "গুণী গুণং বেত্তি," "মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদা"—এ সকল সংস্কৃত বচন লেখকদের হাত থেকে বেরিয়েছে, সমালোচকদের হাত থেকে নয়।

সাহিত্যিকদের এ প্রবৃত্তির সঙ্গে ঝগড়া করে কোনও ফল নেই। এ প্রবৃত্তিকে দুর্ব্বলতা বললেও সে দুর্ব্বলতা আমরা ত্যাগ করতে পারব না, আর যিনি পারেন তাঁর পত্রপাঠ সমালোচকদের দলে গিয়ে ভর্ত্তি হওয়া উচিত।

কে না জানে যে, বাহবা না পেলে গাইয়ে বাজিয়েরা আসর জমাতে পারে না; এবং যে শ্রোতা যত বেশীবার "কিয়াবাৎ" "কিয়াবাৎ" লে, ওস্তাদেরা তাকেই তত বড় সমজদার বলে মেনে নেন। এর

কারণও স্পষ্ট। সাহিত্যের ফুল অনুকূল জলবায়ু না পেলে স্ব-রূপে ফুটে উঠতে পারে না। এই প্রশংসা জিনিষটে হচ্ছে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির একটি প্রধান সহায়। কাব্যের রস উপভোগ করবার অক্ষমতা সমালোচকদের একটা ক্ষমতার মধ্যে গণ্য নয়।

ইংলণ্ডের সর্ব্বাগ্রগণ্য মনীষী Bertrand Russell তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন বইয়ে লিখেছেন যে—

"Praise is less harmful. But it should not be given so easily as to lose its value, nor should it be used to over-stimulate a child."

উপরোক্ত child কথা থেকেই বুঝতে পারছেন যে, এ হচ্ছে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা সাহিত্যিকরা উকিল, মোক্তার, পলিটিসিয়ান, দোকানদারদের মতে কি সব শিশু নই? অন্তত সমাজ উপরোক্ত সেয়ানাদের তুলনায় আমাদের কি ছেলেমানুষ হিসেবে দেখেন না?—অতএব Russell-এর মতানুসরণ করে সমালোচকদের আমাদের প্রশংসা করাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমালোচকদের একটু বিপদ আছে। তাঁরা যদি রামের প্রশংসা করেন ত শ্যাম মনক্ষুণ্ণ হবে, এবং এ অবস্থায় শ্যামচন্দ্রকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে, রামচন্দ্রের প্রশংসার অর্থ শ্যামচন্দ্রের নিন্দা নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে কথাটা আর একটু পরিষ্কার করছি। গত মাসের কল্লোলে শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তিনখানি বইয়ের গুণ গেয়েছেন। তার মধ্যে একখানি হচ্ছে "গড্ডলিকা"। কিছুদিন পূর্ব্বে আমিও এ বইয়ের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছি।' আমার যতদূর মনে পড়ে, ঐ প্রশংসাসূত্রে এক

জায়গায় বলেছিলুম যে, বঙ্গসাহিত্যে এর তুলনা নেই। এই কথা শুনে বীরবল যদি ব্যাজার হতেন ত ভেবে দেখুন কি মুস্কিলেই পড়তুম। তখন তাঁকে গিয়ে বলতে হত যে, "গড্ডলিকার হাস্যরস আর তোমার হাস্যরস এক জাতীয় নয়।" এ কথা শুনে তিনি যদি প্রশ্ন করতেন যে, ও-দুয়ের প্রভেদটা কি? তাহলে উত্তরে আলঙ্কারিকদের এই বচন আওড়াতে বাধ্য হতুম—

ইক্ষুক্ষীরগুড়াদীনাং মাধুর্য্যস্যান্তরং মহৎ।
তথাপি ন তদাখ্যাতুং সরস্বত্যপি শক্যতে ॥

বীরবলের উদাহরণ দিচ্ছি এই কারণে যে, তিনি আমার ঘরের লোক, সুতরাং তাঁর নাম করায় আমার বিশেষ কোনও ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু বীরবল না হয়ে যদি কোন নির্ব্বল রসিক আমার উপর নারাজ হতেন, সেটা অবশ্য নিতান্ত আক্ষেপের কারণ হত। শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদের সমালোচনার উপর আপনারা যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাই পড়েই আমার মনে এই কথা উদয় হয়েছে যে, সমালোচকের পক্ষে এ যুগে কারও প্রশংসা করা তার নিন্দা করার চাইতেও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। এ যুগ ত আর বঙ্গদর্শনের যুগ নয়, যখন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে লেখকদের সরাসরি বিচার করতেন, ও খুসীমত তাদের তিরস্কৃত ও পুরস্কৃত করতেন, আর পাঠক-সমাজ তাঁর কথাই বেদবাক্য বলে মেনে নিত। এ যুগ যে সাহিত্যেরও ডিমোক্রাটিক যুগ। আপনারা জানিয়ে রেখেছেন যে, শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদের প্রবন্ধের স্বপক্ষেবিপক্ষে কোন কথাই আপনারা প্রকাশ করবেন না। তবুও আমি যে এ বিষয়ে দু-চার কথা

বলছি, তার কারণ উক্ত প্রবন্ধ আমার আলোচ্য বিষয় নয়, শুধু আলোচনার উপলক্ষ্য মাত্র। কোনও সমালোচকের কোনও মতামতের প্রতিবাদ কিম্বা সমর্থন করবার দিন এখন চলে গিয়েছে। কেন না এ যুগে সাহিত্য সম্বন্ধে শুধু ব্যক্তিগত মতামতেরই অর্থ ও সার্থকতা আছে।

এ যুগে নিজের মন ছাড়া অপর কোনরকম কষ্টিপাথর লোকের হাতে নেই, যার সাহায্যে সে সাহিত্যের দর কষে দিতে পারে। ইংরাজীতে যাকে বলে Canons of Criticism—এ যুগে সে সব বিলকুল বাতিল হয়ে গিয়েছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করে কেউ কস্মিনকালেও কাব্যরচনা করতে পারেন নি, এবং সেকালেও কবিরা সে শাস্ত্রের নিষেধ পদে পদে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যদেহের দোষের একটা লম্বা ফর্দ্দ আছে; অথচ আলঙ্কারিকরাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, দোষ হয়ে গুণ, হল কবির বিদ্যায়। "দৈব-বিধান" যে "শাস্ত্র-বিধানের" চাইতে প্রবল, এ কথাও তাঁরা স্পষ্টাক্ষরে বলে গিয়েছেন।

এ যুগে আমরা এ ক্ষেত্রে কোনরূপ শাস্ত্রবিধান গ্রাহ্য করতে পারি নে, ফলে উক্ত বিধান অনুসারে এ জিনিষ কাব্য নয়, এমন কথাও বলতে অধিকারী নই। কারণ দেখতে পাওয়া যায় যে, নিত্য নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, যা কোনও পুরোনো নিয়মের অধীন নয়। অতএব সাহিত্য-সমালোচনার জন্য সমালোচকেরা নিজের উপরেই নির্ভর করতে বাধ্য। এক হিসেবে এটি দুঃখের বিষয়, কারণ প্রতি ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র নিজের রুচির উপর নির্ভর করেন, তাহলে সামাজিক রুচি বলে কোনও জিনিষ জন্মাতে পারে না—ফলে এ ক্ষেত্রে যা জন্মায় তার নাম

critical anarchism। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ যুগে সমালোচকদের মেনে নিতে হবে যে, সমালোচনা করার অর্থ হচ্ছে আত্মপ্রকাশ করা। এতে যিনি ভয় পান, তাঁর পক্ষে সমালোচনা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। লেখকদলকে লালনপালন, শাসনসংরক্ষণ করবার দায়িত্ব এ যুগের সমালোচকদের নেই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পাবনার কথা।*

—∞*∞—

আমাদের দেশে হিন্দু-সন্তানমাত্রেরই বছরে একটা সময়ে, অর্থাৎ পূজার সময়ে, বাড়ীর কথা মনে পড়ে। বাড়ী মানে অবশ্য যে-কোনও বাসস্থান নয়; কিন্তু বিশেষ করে সেই বাসস্থান, যার সঙ্গে মানুষের নাড়ীর যোগ আছে। বাঙলায় যাকে বলে পৈতৃক ভিটে—অর্থাৎ যে বাড়ীর সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি জড়িত আছে, যার সঙ্গে মৃতের ও জীবিতের সমান সম্পর্ক আছে—পূজোর সময় আমাদের অধিকাংশ লোকের মনে সেই বাড়ীর কথাই উদয় হয়।

এ মনোভাব যে কতদূর স্বাভাবিক, তার স্পষ্ট প্রমাণ আমি প্রথম পাই, যখন আমার বয়স সবে চৌদ্দ বছর। সেকালে আমি বেহার প্রদেশের আরা সহরে বাস করতুম, এবং সেখানে খুব মনের আনন্দেও ছিলুম; কারণ সেকালে নিরানন্দ হবার আমার কোনও কারণ ছিল না, এবং থাকলেও বয়সের গুণে তা আমাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু সেখানে পূজোর সময় হঠাৎ আবিষ্কার করলুম যে, আমরা সকলে বিদেশে প্রবাসী হয়ে পড়েছি। বাঙলা দেশে, বিশেষতঃ বাড়ীতে, ফেরবার জন্য আমাদের সকলের মনে এক অপূর্ব্ব আকুলতা অকস্মাৎ জেগে উঠল। দাদা তখন বিলেতে ছিলেন, এবং তিনিও বাবাকে লিখেছিলেন যে, ঠিক সেই সময়ে তাঁর মনও বাড়ী ফেরবার

---

* আত্মশক্তির জন্য লিখিত।

জন্য নিতান্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। এ পারিবারিক কথা উল্লেখ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই সত্যটিকে স্পষ্ট করা যে, পারিবারিক স্মৃতি আমাদের সকলের মনের উপর অল্পবিস্তর প্রভুত্ব করে। অনেক সময়ে আমরা যখন এমন মনোভাব প্রকাশ করি যা বিজ্ঞ লোকের মতে rational নয়, তখন সে মনোভাবের মূল হয়ত পাওয়া যাবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মনের ভিতর। যাঁরা এ জাতীয় মমত্বকে একটা রোগ হিসেবে দেখেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, বহুবিধ শারীরিক রোগও স্বোপার্জ্জিত নয়, উত্তরাধিকারীসত্ত্বে প্রাপ্ত। আর ডাক্তারদের কাছে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন যে, এই জাতীয় রোগগুলি প্রায়ই দুরারোগ্য।

(২)

আমার বাড়ী হচ্ছে পাবনায়—পাবনা নামক সহরে নয় পাবনা জেলার কোনও পল্লীগ্রামে। আমার পারিবারিক স্মৃতি পাবনার সীমা অতিক্রম করে না। সুতরাং আজকের দিনে স্বভাবতঃই পাবনার কথা আমার মনে পড়ছে ; ও সে কথা যে আমি বাঙালী জাতির সুমুখে বলতে সাহসী হচ্ছি তার কারণ, গত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে পাবনা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই জেলার পল্লীসমূহের বর্ত্তমান অবস্থার পরিচয় দিলে অনেকেই দেখতে পাবেন যে, সম্ভবত বাঙলার অধিকাংশ জেলার অধিকাংশ পল্লী একই অবস্থা।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা বি, এল, কর্ত্তৃক সংগৃহীত পাবনার ইতিহাসের সদ্যপ্রকাশিত পঞ্চম খণ্ডে এ জেলার পল্লীসমূহের বর্ত্তমান

অবস্থার বর্ণনা পড়ে মনটা বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না। তার মধ্যে গুটিকতক পল্লীর পরিচয় নীচে দিচ্ছি :—

(১) মালঞ্চী। পাবনা হইতে প্রায় ৪ মাইল পূর্ব্বোত্তরে ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত মালঞ্চী গ্রাম একটি প্রাচীন বারেন্দ্র কায়স্থপ্রধান পল্লী বলিয়া পরিচিত।

পূর্ব্বে মালঞ্চী গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও মনীষী অধ্যাপকগণের বাস ছিল। এখানে কয়েকটি প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী ছিল বলিয়া জানা যায়।

কালে এখানে যে সমৃদ্ধিশালী লোকের বাস ছিল, এখানকার অদ্যাপি জঙ্গলমধ্যে পরিদৃশ্যমান ভগ্ন অট্টালিকাসমূহ ও জঙ্গলমধ্যে ইতস্ততঃ লুক্কায়িত দীর্ঘিকাদিতে তাহা সূচিত হইয়া থাকে।

(২) রহিমপুর ও পয়দা। পরস্পরসংলগ্ন দুইটি গ্রামই বারেন্দ্র কায়স্থপ্রধান প্রাচীন গ্রাম। রহিমপুর বর্ত্তমানে একেবারে জঙ্গলাকীর্ণ ও বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। নিকটবর্ত্তী পয়দা একটি কায়স্থ-জমিদারপ্রধান গ্রাম বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের বাটীতে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহমূর্ত্তির দৈনিক সেবা পূজা প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামে মাত্র ২।৩ ঘর কায়স্থ, দুই এক ঘর বৈশ্যসাহা, রাজবংশী এবং কতিপয় মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন লোকালয় বিদ্যমান নাই। নিকটবর্ত্তী সেখপুর গ্রামে এক সময়ে নন্দী উপাধিবিশিষ্ট বারেন্দ্র কায়স্থগণের বাস ছিল। ইহা এক্ষণে জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। মালঞ্চীর নীচে ইচ্ছামতী নদীর পূর্ব্বপারে রাজাপুর, মহেন্দ্রপুর আদি কয়েকটি জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীতে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বারুজীবী, ঘোষ প্রভৃতি বহু হিন্দু জাতির

বাস ছিল। এক্ষণে ২।৩ ঘর ব্রাহ্মণ ও কয়েকঘর বারুজীবী জাতিমাত্র রাজাপুরে বাস করে।

(৩) হাণ্ডিয়াল। প্রাচীন করতোয়া তীরে অবস্থিত হাণ্ডিয়াল একটি প্রাচীন পল্লী। ঘোষপাড়ার গোপীনাথের মন্দির, পোদ্দার পাড়ার বিগ্রহের সেবা, সাহাপাড়ার দোলমঞ্চাদি এখানে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঘোষপাড়ার মন্দির একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। পোদ্দার পাড়ার গোপীনাথের মন্দির এখনও জঙ্গলমধ্যে তৃণকণ্টকাকীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া নীরবে অতীত কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। নিবিড় জঙ্গলমধ্যে সুন্দর কারুকার্য্যখোদিত ও প্রাচীনকালের আদর্শে নির্ম্মিত বাঙালাদি দর্শনে দর্শকের মনে স্বতঃই এক অভিনব ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

গ্রামটি বর্ত্তমান সময়ে ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ। অনেক প্রাচীন দীর্ঘিকা জঙ্গলমধ্যে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহার জল ব্যবহারোপযোগী নহে। করতোয়া নদীর জল কথঞ্চিৎ ব্যবহার্য্য। পূর্ব্বে হাণ্ডিয়াল পোদ্দার উপাধিক সুবর্ণবণিক জাতির বাস ছিল, এবং এখনও কয়েক ঘরের বাস আছে। কোন কোন স্থানে সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের বংশধরসমূহ হীনাবস্থায় বাস করিতেছেন।

(৩)

এখানে যে কটি পল্লীর বর্ত্তমান অবস্থার পরিচয় দেওয়া গেল, পাবনার প্রায় সকল ভদ্রপল্লীরই সেই অবস্থা। সকলেরই দশা আজ ভগ্নদশা। সম্ভবতঃ সমগ্র বঙ্গদেশের অবস্থা একইরূপ। এই সব ভদ্রপল্লীর বিলোপ দেশের উন্নতির পরিচায়ক নয়। আর কিছু না

হোক্, এতে যে দেশের শ্রী নষ্ট হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষে যাকে শ্রী বলে, তা মানুষের শক্তিরই একটা বিশেষ বিকাশ। সুতরাং এই সব ভদ্রপল্লীর অধোগতি বাঙালী ভদ্রসমাজের শক্তিহীনতারই পরিচায়ক। আজকাল দেশে village re-construction বলে একটা কথা উঠেছে; তার উদ্দেশ্যই বা কি, উপায়ই বা কি, তা বক্তৃতা শুনে ও কাগজ পড়ে আমি ভাল বুঝতে পারিনি। এইমাত্র বুঝেছি যে, যে পল্লীর পুনর্গঠনের প্রস্তাব হচ্ছে, তা আর যাই হোক— ভদ্রপল্লী নয়। সম্ভবত অনেকের বিশ্বাস যে, ভদ্রপল্লীর পুনর্জ্জীবন অথবা নবজীবন অনাবশ্যক। কেন না এই সব প্রাচীন ভদ্রপল্লী ছিল সুধু জমিদার ও তাঁর পোষ্যবর্গের বাসস্থান। কিন্তু আসলে তা নয়। এই জমিদারদের পল্লী ছিল সব সেকালের শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের এক একটি কেন্দ্র। প্রতি গ্রামের একটি organic unity ছিল। এই এক একটি গ্রামের ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার শিল্প, বাণিজ্য ধ্বংশ হয়েছে, এবং বাঙালী ভদ্রসমাজ ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে।

যাঁরা ভদ্রপল্লীর দুর্দ্দশাতে দুঃখ বোধ করেন, তাঁদের মধ্যেও বেশীর ভাগ লোকের বিশ্বাস যে এদের পুনরুদ্ধার অসম্ভব। অনেকের ধারণা যে ম্যালেরিয়াই এর কারণ। এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। ম্যালেরিয়া কথাটা বিলেত থেকে এসেছে, কিন্তু ম্যালেরিয়া জিনিষটেও যে বিলেত থেকে এসেছে—তার কোনও প্রমাণ নেই। ও বস্তু ত' আর ম্যাঞ্চেষ্টরের ধুতি নয়। আমার বিশ্বাস দু'শ বৎসর আগেও এদেশে ম্যালেরিয়া ছিল, আর তা সত্ত্বেও এই সব প্রাচীন পল্লী গড়ে উঠেছিল। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে রোগ নেই, আর মানুষকে

আবহমানকাল রোগের সঙ্গে লড়াই করেই জীবন ধারণ করতে হয়েছে। আর একালে আমরা মশা মারতে ডাক্তারীর কামান পাত্‌তে পারি, যে কামান আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের হাতে ছিল না। সুতরাং মশার ভয়ে দেশসুদ্ধ ভদ্রলোক যে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, এ কথা নেহাৎ বাজে কথা। সত্য কথা এই যে, economic কারণেই দেশের এই দুর্দ্দশা ঘটেছে। সে ইক্‌নমিক্ কারণগুলি যে কি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তা অনুসন্ধান করা উচিত। রোগের কারণ জানতে পেলে তার প্রতিকারের উপায়ও আবিষ্কৃত হতে পারে।

Sentimentalism নামক মানসিক ম্যালেরিয়া থেকে আমি মুক্ত। সুতরাং স্বদেশের এই দুর্দ্দশার জন্য হা হুতাশ করা আমার ধাতে নেই। The old order changeth giving place to the new—এ জ্ঞান আমার আছে; সুতরাং যা ভাঙ্গে তার জন্য আমি বিশেষ দুঃখ করিনে, যদি দেখি যে সেই সঙ্গে নতুন কিছু গড়ে উঠছে। বাঙলার ভদ্রপল্লী সব হয় মৃত, নয় মুমূর্ষু। অপরপক্ষে বাঙলার কৃষকপল্লী সব কি সজীব ও সতেজ হয়ে উঠেছে? ভদ্রপল্লী থেকে যে প্রাণশক্তির শিকস্তি হয়েছে, তা কি কৃষকপল্লীতে পয়স্তি হয়েছে? মোটেই না। অবশ্য কতকগুলি নতুন ভদ্রপল্লী গড়ে উঠেছে, যাদের নাম হচ্ছে moffussil towns। এগুলি আগাগোড়া official towns; এ ঘরের ভাঙাগড়ার উপর আমাদের কোনও হাত নেই।

(৪)

মফঃস্বল সহর নামধেয় নতুন লোকালয়গুলি আসলে পল্লীও নয়, নগরও নয়,—ও দু'য়ের বহির্ভূক্ত একরকম অদ্ভুত সৃষ্টি। এ সব

সহরে কোনরূপ শ্রী নেই, কোনরূপ প্রাণ নেই; কিন্তু মশা যথেষ্ট আছে। এই সব জোড়াতাড়া দিয়ে খাড়া করা লোকালয়ের অন্তরে এমন কোনও সচেতন শক্তি নেই, যাতে করে এরা আমাদের নব সভ্যতার এক একটি কেন্দ্র হয়ে উঠবে। সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্বের অভাবই এ সব সহরের বিশেষত্ব।

যদি দেশের ইকনমিক্ অবস্থা সত্য সত্যই এই হয়ে থাকে যে, দেশে থাক্‌বে শুধু কৃষক, আর ভদ্রসম্প্রদায় বাস করতে বাধ্য হবে মফঃস্বল সহর নামক গুটিকতক সরকারী ছাউনিতে,—তাহলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতে কি অবস্থা হবে, তা ভেবে দেখবার বিষয়।

প্রথমত যে সম্প্রদায় দেশের ধন সৃষ্টি করে, সে সম্প্রদায়ের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায় একেবারে নিঃসম্পর্কিত হয়ে পড়বে; তদবস্থ হওয়াটা কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নয়। ফরাসী ভাষায় এ জাতীয় লোকদের বলে deraciné, অর্থাৎ মূলোৎপাটিত। এই শিকড়ছেঁড়া লোকদের মনের শিকড় যদি কোথাও থাকে ত' তা আছে ইংরাজী বইয়ের পাতার ভিতর। বলা বাহুল্য যে কাগজ—মনের জমি নয়। সে জমি হচ্ছে একালের মনস্তত্ত্ববিদরা যাকে বলেন মগ্নচৈতন্য—আর সে চৈতন্যের মূলে আছে স্বদেশ ও পূর্ব্বপুরুষ।

এই শিকড়ছেঁড়া লোকেরা নিজেরাও কোন সমাজ গড়ে তুলতে পারে না; কারণ দেহে মনে যারা নিকট অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তারা জীবজগতে-ভ্রাম্যমান পরমাণু মাত্র। যাঁরা বিশ্বাস করেন যে এ বিশ্বের মূল কথা হচ্ছে Fortuitous concourse of atoms, তাঁরাই আশা করতে পারেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তর

থেকে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নবীন সমাজ গড়ে উঠবে।—আমার দর্শন সৃষ্টির অত গোড়া ঘেঁসে যায় না। ফলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার আয়নায় ভবিষ্যতের যে চেহারা আমি দেখতে পাই, তাতে আমার মন প্রসন্ন হয় না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

গণেশ। *
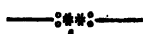
সর্ব্ববিঘ্নহর ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বলে' যে দেবতাটি হিন্দুর পূজা পার্ব্বণে সর্ব্বাগ্রে পূজা পান, তাঁর 'গণেশ' নামেই পরিচয় যে তিনি 'গণ' অর্থাৎ জনসঙ্ঘের দেবতা। এ থেকে যেন কেউ অনুমান না করেন যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজের যাঁরা মাথা, তাঁরা জনসঙ্ঘের উপর অশেষ ভক্তি ও প্রীতিমান ছিলেন। যেমন আর সব সমাজের মাথা, তেমনি তাঁরাও সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তিকে ভক্তি করতেন না, ভয় করতেন! 'গণেশ' দেবতাটির আদিম পরিকল্পনায় এর বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আদিতে 'গণেশ' ছিলেন কর্ম্মসিদ্ধির দেবতা নয়, কর্ম্মবিঘ্নের দেবতা। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মতে এঁর দৃষ্টি পড়্‌লে রাজার ছেলে রাজ্য পায় না, কুমারীর বিয়ে হয় না, বেদজ্ঞ আচার্য্যত্ব পান না, ছাত্রের বিদ্যা হয় না, বণিক ব্যবসায়ে লাভ কর্‌তে পারে না, চাষীর ক্ষেতে ফসল ফলে না। এই জন্যই 'গণেশের' অনেক প্রাচীন পাথরের মূর্ত্তিতে দেখা যায় যে, শিল্পী তাঁকে অতি ভয়ানক চেহারা দিয়ে গড়েছে; এবং গণেশের যে পূজা, তা ছিল এই ভয়ঙ্কর দেবতাটিকে শান্ত রাখার জন্য; তিনি কাজকর্ম্মের উপর কাল না দেন, সেজন্য ঘুষের ব্যবস্থা। গণ-শক্তির উপর প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কর্ত্তাদের মনোভাব কি ছিল, তা 'গণেশের' নর-শরীরের উপর জানোয়ারের মাথার কল্পনাতেই প্রকাশ।

---

* গণ-বাণীর জন্য লিখিত।

কিন্তু এ মনোভাব প্রাচীন হিন্দুর একচেটিয়া নয়। সকল সভ্যতা ও সমাজের কর্ত্তারাই জনসঙ্ঘকে "লম্বোদর গজানন" বলেই জেনেছেন। ওর হাতপা মানুষের, কিন্তু ওর কাঁধের উপর যে মাথাটি তা মানুষের নয়, মনুষ্যেতর জীবের। আর ওর উদর এত প্রকাণ্ড যে, তাকে যথার্থ ভরাতে হ'লে, যাদের কাঁধের উপর মানুষের মাথা, তাদের সুখসুবিধার উপকরণ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং সব দেশের যারা বুদ্ধিমান লোক তারা, ওর মগজে মানুষের বুদ্ধির পরিবর্ত্তে জানোয়ারের নির্ব্বুদ্ধিতা রয়েছে ভরসায়, ওর বিরাট উদরের যতটা খালি রেখে সারা যায়, সেই চেষ্টা করে' এসেছে। সেই জন্য কখনও তাকে অঙ্কুশে ক্লিষ্ট, কখনও বা খোশামোদে তুষ্ট করতে হয়েছে। কারণ আদি কাল থেকে এ কাল পর্য্যন্ত কোনও 'পলিটিশ্যানের পলিটিকাল' খেলা এ দেবতাটির সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয় নি। অথচ সে সাহায্য পেতে হবে বিশেষ খরচের মধ্যে না গিয়ে। অর্থাৎ গণদেবতার পূজায় ভোগের উপকরণের দৈন্য সকলেই মন্ত্রের বহরে পূরণ করেছে;—'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা,' 'গণবাণীই ভগবদ্বাণী,' "সুরাজ থেকে স্বরাজ শ্রেষ্ঠ" "জননায়ক হচ্ছে জনসেবক", ইত্যাদি। এবং সকলেই "লম্বোদর গজেন্দ্রবদনের" সৌন্দর্য্যবর্ণনায় শ্লোক রচনা করে' তাকে তোষামোদে খুসি করেছে।

যারা গণদেবতাকে খোশামোদে ভুলিয়ে নিজের কাজ হাঁসিল করতে চায় না, চায় ঐ দেবতাটির নিজের হিত—তাদের এ কথা মেনে নেওয়াই ভাল যে, এ দেবতার মানুষের শরীরের উপর গজমুণ্ডের কল্পনা একবারে মিথ্যা কল্পনা নয়। কোন শনির কুদৃষ্টিতে এ নরমুণ্ড খসে পড়েছে, সে ঝগড়া আজ নিরর্থক। কোন দেবতার শুভদৃষ্টি এর

মুণ্ডকে মানুষের মাথায় পরিণত করবে, সেইটি জানাই প্রয়োজন। কারণ খোশামোদীরা যাই বলুক, মানুষের কাঁধে হাতীর মাথা সুন্দর নয়, নিতান্ত অশোভন।

যে দেবতার সুদৃষ্টি এই অঘটন ঘটাতে পারে, তিনি হচ্ছেন বীণাপাণি, যিনি জ্ঞানের দেবতা। এক জ্ঞানের শক্তি ছাড়া গজ-মুণ্ডকে নরমুণ্ডে পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা আর কিছুরই নেই। সুতরাং গণদেবতার যারা হিতকামী, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এই দেবতাটির মাথার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের তাড়িৎ সঞ্চালন করা। জনসঙ্ঘকে সভ্যতার ভারবাহীমাত্র না রেখে, সভ্যতার ফলভোগী করতে হলে, প্রথম প্রয়োজন জনসাধারণকে জ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা। আকাশে বিস্তৃত বিশ্ব ও তার জটিল কার্য্যকারণজাল; কালে প্রসৃত মানুষের বিচিত্র ইতিহাস, ও এই দেশ ও কালের মধ্যে বর্ত্তমান মানুষের গতি ও পরিণতির জ্ঞান; আজকের দিনের পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের, এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ; ধন উৎপাদন ও বিতরণের অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান এমন অদ্ভুতজটিল ও বহুবিস্তৃত হয়ে উঠছে যে, অজ্ঞান জনসাধারণকে মাঝে মাঝে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে বুদ্ধিমান লোকের নিজের হিত খুব সম্ভব হলেও, জনসাধারণের হিত একেবারেই সম্ভব নয়। বাইরের পরামর্শে গড়া ঐ সব সাময়িক উত্তেজনার দল, সঙ্ঘের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে ক্রমাগত ভেঙ্গে যায়; আর যতদিন টিকে থাকে, ততদিনও ঐ পরামর্শদাতাদের ক্রীড়ণক হয়েই থাকে।

জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে তার নিজের হিতের পথ নিজেকে চিনতে শেখানো কেবল বহুকষ্টসাধ্য ও অনেক সময়সাপেক্ষ নয়,

ঐ দীর্ঘ ঘোরানো পথ ছেড়ে, খাড়া সরল পথে তার হিতচেষ্টার প্রলোভন দমন করাও দুঃসাধ্য। এই নিরন্ন বঞ্চিত মানুষের দলকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে, কেবলমাত্র সংখ্যার জোরে তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করিয়ে দিতে কোন জন-হিতৈষীর, না লোভ হয়! কিন্তু, মানুষের প্রকৃতি ও সমাজের গতির দিকে চেয়ে এ লোভ দমন করতে হবে। অজ্ঞান মানুষের খুব বড় দলও চক্ষুষ্মান মানুষের ছোট দলের বিরুদ্ধে অনেক দিন দাঁড়াতে পারেনা। এবং পৃথিবীর সব দেশে যে অল্প-সংখ্যক লোক জন সাধারণের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের বিরোধী মনে করে' তাকে চেপে রেখেছে, তারা আর যা-ই হোক, অতি কৌশলী ও বুদ্ধিমান লোক। এদের সঙ্গে লড়্‌তে হ'লে, ভেবে না বুঝলে একদিন ঠেকে শিখ্‌তে হবে যে, সরল পথই সোজা পথ নয়।

কিন্তু জন-সাধারণের শিক্ষার এইটিই একমাত্র, এমন কি প্রধান প্রয়োজন নয়। জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয়; জ্ঞানের চরম ফল যে তা চোখে আলো দেয়। জন-সাধারণের চোখে জ্ঞানের সেই আলো আন্‌তে হবে, যাতে সে মানুষের সভ্যতার যা সব অমূল্য সৃষ্টি,—তার জ্ঞান বিজ্ঞান, তার কাব্যকলা, —তার মূল্য জান্‌তে পারে। জন-সাধারণ যে বঞ্চিত, সে কেবল যে অন্ন থেকে বঞ্চিত বলে' নয়, তার পরম দুর্ভাগ্য যে সভ্যতার এই সব অমৃত থেকে সে বঞ্চিত। জন-সাধারণকে যে শেখাবে একমাত্র অন্নই তার লক্ষ্য, মনে সে তার হিতৈষী হলেও, কাজে তার স্থান জন-সাধারণের বঞ্চকের দলে। পৃথিবীর যে সব দেশে আজ জনসঙ্ঘ মাথা তুলছে, জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারেই তা সম্ভব হয়েছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে, শিক্ষার গুণে পৃথিবীর হালচাল বুঝতে

পেরে জন-সাধারণ জীবনযুদ্ধে জয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এর একটি প্রধান কারণ সংখ্যার অনুপাতে জন-সাধারণের সমাজে শক্তি লাভের যা গুরুতর বাধা, অর্থাৎ সভ্যতালোপের আশঙ্কা, শিক্ষিত জন-সাধারণের বিরুদ্ধে সে বাধার ভিত্তি ক্রমশই দুর্ব্বল হয়ে' আসে। জন-সাধারণের বিরুদ্ধে আভিজাত্যের স্বার্থের বাধা সভ্য মানুষের মনের এই আশঙ্কার বলেই এত প্রবল। এই আশঙ্কার মধ্যে যা সত্য আছে তা যতটা দূর হবে, জন-সাধারণের শক্তিলাভের পথের বাধাও ততটা ভেঙ্গে পড়্‌বে। উদরসর্ব্বস্ব গজমুণ্ডধারী গণদেবের অভ্যুত্থান স্বার্থান্ধ মানুষ ছাড়া অন্য মানুষের কাছেও বিপদ্‌পাৎ বলেই গণ্য হবে। গণদেবতা যেদিন নরদেহ নিয়ে আস্‌বে, সেদিন তার বিজয় যাত্রার পথ কেউ রুখ্‌তে পারবে না।

ভারতবর্ষের জন-সাধারণের মঙ্গলের পথে প্রধান বাধা তার অশিক্ষা। আজ যারা "গণবাণী" প্রচার কর্‌তে বসেছে, তাদের যেন এ মোহ না থাকে যে, আমরা যা প্রচার কর্‌ছি তা যথার্থই এদেশের "গণের"বাণী। এ কথা যেন না ভুলি যে, ভারতবর্ষের গণদেবতা বাগ্‌দেবীর কৃপার অভাবে আজ বাক্যহীন। আমাদের "বাণী" তার পক্ষের বাণী হতে পারে, কিন্তু তার বাণী নয়। আজ আমাদের কাজ "গণবাণী" বলে' আমাদের বাণী লোকদের শোনানো নয়; আমাদের প্রধান কাজ "গণদেবতাকে জ্ঞানের বাণী শোনানো"। কারণ ভারত-বর্ষের গণদেবতার মুখে যেদিন বাণী ফুটবে, সেদিন সে বাণী শোনাবার জন্য আর কারও সাহায্য দরকার হবে না।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

সাধুমা'র কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আজ (আমার বিবাহ) নতুন পথের পথিক হতে চললাম। আজ হতে আমার এই বাল্যজীবনের খেলা, আহার নিদ্রা, বসন ভূষণ, কথা চালচলন, সকলি পরিবর্ত্তন করতে হবে। এতদিন যে ভাবে চলেছিল, তা আর চলবে না; আজ হতে নতুন লোকের সঙ্গে মিলতে হবে, নতুন সংসারে ঘোরাফেরা। আজ সকলি অন্য লোকের আজ্ঞার উপর নির্ভর। আর সেদিন গেল,—প্রাতঃকালে গাড়ীতে ভ্রমণ, যখন যা ইচ্ছা খাওয়া, যেখানে ইচ্ছা বসে গান গল্প করা। তখন আমার কোন চিন্তা ছিল না, আমি চিন্তা করতে তখনও শিখিনি। কেবল যখন দুধ খেতে কি নাইতে যাবার সময় দুষ্টুমি করতুম, আর মা একদিন একদিন বক্‌তেন, তখন এই মনে হত যে, আমার বিয়ে হলে বাঁচি বাপু, আর কেউ বকবে না। সেই বিয়ে আজ হবে, এতে আনন্দ যে কত হচ্ছে, সে কথা আর লিখে কি জানাব। মনে মনে যা হয়েছিল তা একটু লিখব,—তাতে পাঠকপাঠিকারা যা মনে করেন করুন। আমি তখন ন' বছরের বালিকা, তাতে বিবাহব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ। মোটে দেখিনি যে, ছোট মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি করে, সে জীবন সুখে যায়, কি দুঃখে যায়। কাল হতে আমি শ্বশুরবাড়ী যাব, এইটি মনে মনে আন্দোলন করছি; সকালে উঠে তাঁদের পূজার ঘরে যাব, যেয়ে পূজা করব, আমাদের এখানে মন্দির আলাদা, তাই

বাড়ীতে দিদিমার ঘরে শিবপূজা করি, আর কেন শিবপূজা করব, দিদিমা ত ভাল বর পাব বলেই শিবপূজা করতে বলেছিলেন, ভাল বর তো হয়েছে, আর বোধহয় শিবপূজা করতে হবে না। আর বেশ মাথায় কাপড় দিয়ে বেড়াব; তাঁদের মস্ত বাড়ী, শুনেছি আমার মত ছোট বউ আরও আছে, আর তাঁদের বাড়ী শুনলুম বাগান পুকুর সব আছে, তাতে ফুল তোলাও হবে আর পুকুরে নাওয়াও হবে। এই সকল চিন্তায় আমার প্রায় আট দিন কাটে।

আমার পাকা দেখাশুনার ঠিক দুই দিন পূর্ব্বে আমার স্বামী আমাদের পুরোহিতকে বলেন যে, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, আপনি তার একখানি ছবি এনে দেখাতে পারেন? অবশ্য চুপি চুপি বলে-ছিলেন। তিনি দিদিমাকে এসে বলেন, দিদিমা আমার অষ্টম বছর বয়েসের একখানি, আর পাঁচ বছরের একখানি, এই দুইখানি ছবি দেন, আর বলে দেন যে, এ বছর ছবি তোলা হয়নি। ছবি দেখে তিনি কি বল্লেন, দিদিমা এ কথা ভট্‌চার্য্যি মশায়কে জিজ্ঞাসা করলেন। ভট্‌চার্য্যি বল্লেন—অমন মেয়ে, ও আবার কি বলতে হয়, ছবি দেখে মুখ মুচ্‌কে একটু হাসলেন, বল্‌বেন আর কি। এই সকল পূর্ব্ব ঘটনা সকলি লেখা হয়ে গেল। আজ আমার বিবাহ, বেলা সাতটার সময় আমি মুখ ধুয়ে, দুধ খেয়ে, দিদিমার কাছে কৌচের উপর গিয়ে বসলুম। দিদিমা হাত দিয়ে কপালের চুলগুলি গুছিয়ে দিলেন, পরে বল্লেন—দেখ, বর আসবে আজ; বরের দিকে যখন আমরা চাইতে বলব, তখন হাসিমুখে চেয়ে দেখো, আর এইরকম বরাবর বরকে হেসে কথা কইবে, কখন বরকে মুখভার দেখাবে না, কখন বরের কথায় রাগ কোরো না, বর যা বল্‌বে শুন্‌তে হয়, আর বরের কথা কারো কাছে গল্প কোরো না,

তাহলে বর রাগ করবে ;—কেমন সুন্দর বর আসবে। দিদিমা ত জানতেন না যে, আমি বর দেখে বসে আছি। আমারি দোষ কি, বিধাতার চক্র ; তাঁর যা বাসনা সেটি পূর্ণ হবেই। আমি চুপ করে ঘাড় হেঁট করে সব শুনে যাচ্ছি।• পরে দিদিমা আবার ধরলেন,—দেখ, কাল সকালবেলা শ্বশুরবাড়ী যাবে, তাঁরা কত আদর করে তোমায় নিয়ে যাবেন ; কত বাজনা হবে, কত হীরেমুক্তার গহনা, জরির সাড়ি পরিয়ে নিয়ে যাবেন ; দেখো যেন কিছু গহনা কোথাও পড়ে না যায়, তাহলে বড় নিন্দে হবে, বলবে যে ওমা ! এমন মেয়ে যে এসেই গহনা হারালে ; খুব সাবধান, কাপড় না ছিঁড়ে যায়, বেশ বউ হয়ে ঘোমটা দিয়ে থাকবে। তাঁরা যখন যা খেতে দেবেন, হাসিমুখে খাবে, দেখো যেন এ খাবনা কি এই খাব, এ কথা বলো না। শ্বশুর বাড়ী বেশ হাসতে হাসতে যেতে হয়। আর দেখো, সেখানে যে ঝি চাকর বামুন আছে, তাদের সঙ্গে কখনো কথা কয়োনা ; তোমার ননদ ঘরের গিন্নী, তিনি তোমার মা'র মত, দেখো যেন কখন আমি এ কথা না শুনতে পাই যে, আমার কথা এ মেয়ে শোনে না ; তাহলে আমি ও তোমার কর্ত্তামণি বড় দুঃখু করব। আর কাল তোমায় যে টাকা দেবে, তাকেই প্রণাম কোরো। এতগুলি কথা দিদিমা শেখালেন। কিন্তু নয়টার পর দেখতে দেখতে ঘোর করে মেঘ জমা হোতে লাগ্‌ল ; তাই দেখে সকলে মেঘের দিকেই দৃষ্টিপাত করছেন, আর নানা প্রকার মেয়েলি তুক্‌তাক্ করছেন। কেউ প্রদীপ পুঁতে দিচ্ছেন, কেউ বাটি পুঁত্‌ছেন, কেউ একা মায়ের ঝি, তাঁরাও সব কি করতে হয় করছেন ; কেবল দিদিমা রাধাকান্ত রাধাকান্ত বলে ডাকছেন। বেলা ১০টার সময় আমার অধিবাস এল। একটি সুন্দর পাঁচ বছরের ছেলে

এল, মাথায় এক মাথা কটাচুল, তায় আবার একটি বিননি করা, গাঁয়ে একটি সবুজ রংএর চীনাপোতের পিরাণ, আর লাল কিংখাপের ইজার, মাথায় ঐ সবুজে তাজ, চোখে কাজল, হাতে দুগাছি সোনার বটাকড়া বালা, গলায় মুক্তার কণ্ঠী। ছেলেটি পাল্কীতে এসেছে, সঙ্গে সওগাত মাছ, দৈ, ক্ষীর, সন্দেশ, অধিবাসের চেলী-ঢাকা একখানি থালা। ছেলেটির মানুষকরা পুরাতন ঝি সঙ্গে আছে, তার নাম তুলসী দাই, সেও হার তসর পরে সজ্জিত, আর যতগুলি লোক সকলেরই রংকরা কাপড়, তসর গরদ শাল, মায় পাল্‌কীবেহারাগুলিরও গোলাবী রংয়ের কাপড় উড়ানি; সঙ্গে জমাদার এসেছে, তার পরণে শাল, চাপ্‌কান, লাল সালুর মস্ত পাগড়ি, গলায় সোনার কদ্‌মা।

তারপর আমার অধিবাস হয়ে গেল, চন্দন-টিপ পরে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। একটু একটু টিপ্‌ টিপ্‌ করে জল পড়তে লাগল, খাওয়া দাওয়া ক্রমে ক্রমে চুকে গেল। তিনটের সময় কলাতলায় স্নান হয়ে গেলে, একেবারে আকাশ বুঝিবা ভেঙ্গে পড়ে এমন জোরে বৃষ্টি, আর তেমনি মেঘ ডাকতে লাগল, রাস্তায় খুব জল জমে গেল। সকলে ভাব্‌তে লাগল, কেমন করেই বা লোকজন আস্‌বে, আর কি করেই বা বর বেরবে। এক ঘর জলপান, দৈ ক্ষীর, লোক বেশী না এলে সব নষ্ট হবে। যাই হোক, মানুষ স্বভাববশতঃ ভাবে, ভেবে কিছু হয় না, তবু ভাবতেও ছাড়ে না, আজীবন এই বৃথা চিন্তায় দিন কেটে যায়। আসল চিন্তা আমাদের চিন্তামণি করছেন; আমরা সকল সময়ে পষ্ট তা' বুঝি, কিন্তু সেটি বলব না। আমি হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা সাজি, তাতেই নানারূপে প্রতি পদে পদে চিন্তাসাগরে পড়ে হাবুডুবু খাই; আর শান্তিপথ খুঁজতে চেষ্টাও করিনে। আমার গোধূলি

লগ্নে বিবাহ, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বর এল শুনলাম; অতি কষ্টে, পাল্কীর খুরাগুলি কাঁধে নিয়ে বেহারারা এসেছে।, যাই হোক, বিবাহকার্য্য কোনমতে সম্পন্ন হয়ে গেল, লোকজনও এসেছিল; তবে আয়োজন কিছু অধিক হয়, সেজন্য উদ্বর্ত্ত বড় বেশী হল। আমার বরকে আমি যে সাজে দেখেছিলাম, আজকেও সেই সাজ, কেবল দুচারটি হীরকাঙ্গুরী বেশী পরেছিলেন। যখন আমার বিবাহ হয় তখন আমার বয়ঃক্রম ৯ বৎসর, আর আমার বরের ১৮ বৎসর, কিন্তু বুদ্ধি কিছু পক্ক হয় নি। যখন আমার দানকার্য্য হয়, তখন আমার পিতার হস্তে তাঁর হাত আর তার উপরে আমার হাত, তিনি আস্তে আস্তে আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলীটি টিপ্‌ছিলেন। পরে বিবাহের দিন আমাদের ছাউনি-নাড়া বলে একটি স্ত্রী-আচার আছে, সে সময়ে শুভদৃষ্টি হয়, তা আর আমার ঠিক কৈ হল, আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ সময়েও শুভদৃষ্টি একপ্রকার ভালই হল।

যাই হোক, এই দুর্য্যোগের মধ্যেই কার্য্য একরকম ভালরূপ নির্ব্বাহ হয়ে সকলের উপরে আসা হল; যৌতুক খেলা, বরযাত্র কন্যাযাত্র সবার ভোজন সাঙ্গ হল। পরে বরের বাড়ীর লোকজন খাওয়ানো হল, তারপর বাড়ীর আত্মীয়স্বজন সব পান ভোজন সারলেন। এর পূর্ব্বেই আমাদের শুইয়ে দিয়েছিলেন, কারণ আমার ঘুম এসেছিল। পরে আমার বর আমায় প্রথম জিজ্ঞাসা করেন যে, এ ঘরে কে শোয়? আমি একেবারে উত্তর দিলাম না, পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে তখন আস্তে আস্তে বললাম যে, এ ঘরে কেউ শোয় না, এ ঘর রাত্রে চাবি দেওয়া থাকে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এ কার খাট? আমি বল্‌লাম, এ খাট নয়, এখানিতে চড়ে

আমার কর্ত্তামণিরা তিন ভাই একত্রে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি বল্লেন—তোমার কর্ত্তামণি, তিনি কে? আমি বল্‌লাম—বেশ, তুমি আমার কর্ত্তামণিকে চেননা? ঐ যে তুমি যাঁকে প্রণাম করলে, খুব সুন্দর বুড়মানুষ। (তিনি সকলই জানতেন, তবে আমার কথা শোনবার জন্যই ঐ সকল ছল হচ্ছিল)। পরে বল্লেন—ও, উনি বুঝি তোমার কর্ত্তামণি। তুমি পড়তে জান? আমি মহা গর্ব্বিতা, বল্‌লাম—বেশ, আমি পড়তে জানিনে? তিনি আমার এ উত্তরে হেসে ফেল্‌লেন, বল্‌লেন—কি পড় বল দেখি? আমিও হট্‌বার নয়, আমি বল্‌লাম চারুপাঠ, পদ্যপাঠ, মানসাঙ্ক, শিশুবোধ, বোধোদয়; আর দ্বিতীয়ভাগ শেষ হয়ে গেছে, তবে এখনও একেবারে ছেড়ে দিই নি, আমার দাদা ওতে জলছবি মেরে দিয়েছেন, আমি তোমায় কাল দেখাব, ও-বই দেখে আমি শ্লেটে লিখি। তিনি অতি ধীরস্বভাব, চুপ করে শুনে যাচ্ছেন; তারপর বলছেন—কাল তুমি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী যাবে, কেমন করে বই দেখাবে? আমি একটু ভেবে বলে ফেল্লুম—মা আমার কাপড়, বই, দু'চারটা বিবি-পুতুল, সব একটা বাক্সে গুছিয়ে রেখেছেন, আমি নিয়ে যাব। আর বেশী কথা হয়নি, আমার ঘুম এল। কিন্তু সেদিন একটু ঘুম পাতলা হয়েছিল, গাঢ় নিদ্রা হয়নি। পরে সকালে দিদিমা আমাদের ওঠালেন; মুখ ধুয়ে, খেয়ে, মা'র ঘরে বস্‌বার বিছানায় বসে রইলাম। মা যেন একটু গম্ভীর ছিলেন বোধ হল, কিন্তু আমার খুব খুসী, এম্‌নি শ্বশুরবাড়ী যাব, নতুন বাড়ী দেখ্‌ব, কত বাজনা আস্‌বে। তবু আমার বিয়েতে ইংরাজী বাজনা হয়নি, তাহলে আমার আহ্লাদ আরও বেশী হত; এখন বুড় হয়ে গেছি, তবু ইংরাজী বাজা কর্ণগোচর হলে অমনি ছুটব দেখবার

জন্য। যাই হোক, মনে মনে ভাবছি দিদিমা বলেছেন ঢের গহনা দেবে, বাবা! সেইটি ভয়ের কথা।

কিন্তু আমার হৃদয়ে আনন্দের তুফান বয়, সে চিন্তা কতক্ষণ, সে শীঘ্রই ভেসে গেল। আর আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে নিতে আস্‌ছেন, সে খবর এল। পুরুষরা বাজনদাররা সব এসে উপস্থিত হল, পাল্কী এখনও আসেনি। মা আমার খোঁপা বেঁধে, চন্দন পরিয়ে, মালা মাথায় দিয়ে বসিয়ে রেখেছেন; সকলকে জল খেতে দিচ্ছেন। দিদিমা, যে আস্‌ছে তার সঙ্গে কথা কইছেন, বসাচ্ছেন। আমার বরকেও দাদা, দিদিমার কাছে বসিয়েছেন, দিদিমা আমার বরের কপালে চন্দন দিয়ে, মালা পরিয়ে, দুধ খাইয়ে গল্প কর্‌ছেন। এদিকে তার সামনেই যাত্রার সব আয়োজন হচ্ছে, বাগবাজারের পিসিমা ছিলেন, তিনি সব গোছাচ্ছেন। এই সকল হতে হতেই খবর এল যে নিতে এসেছেন। মা অমনি নীচে নেবে গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন; তিনি এসে প্রথম দিদিমাকে প্রণাম করে, মা'র ঘরে এসে আমার কাছে এসে বসে পড়লেন। তিনি একখানি বেনারসী সাড়ী পরেছেন, মখ্‌মলের মের্জাই পরেছেন, আর হাতে হীরার ব্রেস্‌লেট, হীরার বালা, গলায় হীরার চিক, মুক্তার কণ্ঠী, কাণেও হীরামুক্তাযুক্ত মাক্‌ড়ি, আর পায়ে চার গাছি ডায়মণ-কাটা মল।

আমি চেয়ে দেখলাম, মা ইসারা করলেন, প্রণাম করে পায়ের ধূলা নিলাম। তিনি তখন বল্লেন—সময় বেশী নেই, শীগ্গির শীগ্গির নিয়ে যেতে হবে, গহনা কাপড় তবে পরাই? মা বল্লেন, হ্যাঁ। তখন সেই পূর্ব্বপরিচিত মধুসূদন খানসামা একটি পুঁটুলি নিয়ে বসেছিল, ধরে দিলে, তিনি আস্তে আস্তে রুমালটি নিয়ে, চাবি খুলে গহনা বার

করে; একে একে পরাতে লাগলেন। আমার গহনাগুলি কি নাম ধরে ধরে লিখব? পাঠকপাঠিকারা হয়ত বল্‌বেন যে, এ আবার কি, এত সময় নষ্ট কেন; অথবা এখনকার মার্জ্জিতরুচির পাঠিকারা এও বলতে পারেন যে, এটা যেন জাঁক দেখানো। কিন্তু আমার বিবেচনায় বাস্তবিক কথা লিখতে গেলে সকলি লিখ্‌তে হয়, তাতে আবার সেকেলে গহনা—নেক্‌লেস্‌ও নেই, টায়রাও নেই।

আমার মেজ জা, তিনিই আমায় নিতে এসেছেন, তিনি আমায় প্রথমে মাথায় হীরার সিঁথি পরালেন, তারপর হীরার তাবিজ, বাজু, বালা; দশগাছি চুড়ি, আংটি চারটি, গলায় হীরার চিক, মুক্তার কণ্ঠী, মুক্তার দোনর, মুক্তার সাতনহর; আর নাকে খুব বড় মুক্তার নথ, পায়ে অনেকগুলি রূপার অলঙ্কার পরালেন।

আমার একে স্থূল দেহ, তার উপরে গহনার ভার, সাড়ীখানি তাও বিষম ব্যাপার; আমার দাদাশ্বশুরমহাশয় হিন্দুস্থানী পছন্দমত সাড়ী করান, ২৫০৲ ব্যয় করে', সে সাড়ী খুব ভারী। আমার সাজ সজ্জা হয়ে গেল, প্রণামের জন্য কর্ত্তামণির কাছে গেলাম; আমায় দেখে তাঁর খুব আনন্দ হল, কিন্তু আমি আর তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারব না, আমি এখন অন্য লোকের হয়ে গেলাম, সেটি মনে করে' চোখ জলপূর্ণ হয়ে গেল, তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আর দাঁড়াতে পারলেন না। আমিও চলে এসে যাত্রা করবার পিঁড়ায় দাঁড়ালুম। আমার যাত্রা-মন্ত্রপাঠ সব হয়ে গেল; দিদিমা, মা, বাবা, আর আর সকল গুরুজনদের প্রণাম করে, ঠাকুরবাড়ী প্রণাম করে অমনি পাল্কীতে উঠলুম।

(ক্রমশঃ)

নটরাজের নৈবেদ্য।*

(১)

নটরাজের নৈবেদ্য সাজাইবার দিন আসিয়াছে,—দেখিতেছি আপনারা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এতদিন নটরাজের নিমন্ত্রণ আমাদের দেশে ছিল বক্তৃতামঞ্চে। সেখানে তাণ্ডব-নৃত্যও দেখিয়াছি, বাক্যের গম্ভীর নাদও শুনিয়াছি; শুধু সে নৃত্যে পাই নাই ছন্দের চিহ্ন, সে বাক্যে দেখি নাই রসের লেশ। তাই, চিরকালের মত নটরাজের নিমন্ত্রণ যদি বক্তৃতামঞ্চেই নিঃশেষিত হইত, তবে সাংবাদিকের যতই উদ্ব্যস্ততার কারণ থাকুক, রসিকজনের তাহাতে উৎকর্ণ হওয়ার কোনোই ওজুহাত থাকিত না। কেননা বক্তৃতামঞ্চের গুরুগর্জ্জন সাংবাদিকের কর্ণপটাহে আঘাত করিবেই, আর সে আঘাতকে তেমনি দারুণরূপে দেশের কর্ণে না পৌঁছাইয়া তিনি অন্ন-জল স্পর্শ করেন না; কিন্তু রঙ্গমঞ্চের মৃদু-গুঞ্জন পৌঁছাইতে পারে একমাত্র রসিকের প্রাণে। মাসের পর মাস এদেশের সাংবাদিক কখনো ইঙ্গ-রাজ, কখনো বা স্ব-রাজ, হালে কখনো হিন্দু-রাজ, কখনো বা মুস্‌লিম্-রাজ প্রভৃতি বহুবিধ 'রাজের' আচার-অনুষ্ঠান লইয়া এতটা চীৎকার করিয়াছেন যে, ভরসা হইতেছে মাঝে মাঝে হঠাৎ কোনো রূপছাত্র যদি নটরাজের নৈবেদ্য সাজাইতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে রসিকজন পরিতৃপ্ত হইবেন, এবং প্রাকৃতজনও রুচি পরিবর্ত্তনের সুযোগ পাইয়া পরিতুষ্ট হইবেন।—

---

* নোয়াখালী 'সবুজ-সঙ্ঘের' রূপদক্ষ-মণ্ডলে পঠন উদ্দেশ্যে লিখিত।

(২)

কবি, চিত্রকর বা কারুশিল্পী স্বাধীন; রসাত্মক বাক্যরচনা, বা রূপভেদপ্রমাণ ইত্যাদি কবি বা শিল্পীর নিজের নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু গায়ক এবং রূপদক্ষের (আজকাল যাহাদের আমরা বলি অ্যাক্টর, তর্জ্জমা করি অভিনেতা, তাহাদেরই প্রাচীন আখ্যা সম্ভবত ছিল রূপদক্ষ) আর্ট অনেক পারিপার্শ্বিক আয়োজনের অপেক্ষা রাখে। ভালো সঙ্গত না হইলে সুগায়কের গানও আজকাল জমিতে পারে না; নাট্যকার সুরসিক, সূত্রধার সুকৌশলী না হইলে, রূপদক্ষের অভিনয়-কলাও স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। কবির কলম ও চিত্রকরের তুলিকা যাহা-কিছু লেখে বা যাহা-কিছু আঁকে, তাহাকে সুবিবেচনার সহায়ে বিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত করিয়া তুলিবার মত অবসর কবির বা চিত্রকরের আছে। কিন্তু গায়ক বা অভিনেতার অসাবধানী মুহূর্ত্তের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে পরিশুদ্ধ করিবার মত কোনো সুযোগই তাহাদের নাই;—সে ত্রুটি সাধারণের কাছেও তাই মার্জ্জনীয় নয়। ইহা ছাড়া, বিদগ্ধ সমাজের সম্মুখে না হইলে কোনো কলাবিদের কণ্ঠেই ভারতী অধিষ্ঠিত হন না,—এ কথাটি রূপদক্ষের সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী খাটে। কারণ 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্' করিয়াও কবি বা শিল্পী ভাবী কালের অপেক্ষায় থাকিতে পারেন; কিন্তু রূপদক্ষ ও গায়কের বেলা সে সান্ত্বনালাভেরও অবসর নাই। যে শ্রোতৃ-পুঞ্জ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উৎকর্ষ দাবী করেন, তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে তাই দাবী মিটাইতে হইবে রূপদক্ষের সঙ্গে সহমর্ম্মিতা ও সমপ্রাণতা দেখাইয়া। রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ একই ছন্দে ছন্দিত না হইলে অভিনয়-কলায় ছন্দপতন অনিবার্য্য। নাট্য-

সাহিত্যের প্রভাব, প্রয়োগ-শিল্পের মিতাচার, শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত-সংযোগ, এবং সর্ব্বোপরি কঠিন অভিনয়-কলার পারদর্শিতা,—এত গুলি আয়োজনের সুসমঞ্জস সমাবেশ না হইলে নাট্য-রস সার্থক হয় না বলিয়াই গুণীগণ এই রসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩)

সংস্কৃত যুগের নাটক বা মধ্যযুগের যাত্রা ও কথকতার প্রাণ থেকে আমাদের আজকালকার অভিনয়-কলা উদ্ভূত হয় নাই। ইংরেজি সাহিত্যের সমুদ্রমন্থনে এই সুধা আমাদের পাওয়া। বাংলা নাট্য-কলা ও বাংলা নাট্য-সাহিত্যের যে ধারা আজও বহমান, তাহার ইতিবৃত্ত বেলগাছিয়ার বাগানের পূর্ব্বে পাওয়া যায় না। আধুনিক বাংলা নাট্যকলার ঐতিহাসিক অবশ্যই তাহার উৎস-মুখ আরো দূরে আবিষ্কার করিয়াছেন; কিন্তু সেখানেও আমরা,—সেই প্রথম অচেতন উন্মেষক্ষণেও,—পাশ্চাত্য নাট্য-কলার প্রেরণাকেই কার্য্য-করী দেখিতে পাই। আর, বেলগাছিয়ার বাগানে যাঁহারা বাংলা নাট্যকলার সচেতন প্রকাশকে সষত্ন অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, তাঁহারা যে কালিদাস বা ভাসের শিষ্য নহেন, শেক্‌সপীয়রের ভক্ত, এ কথা আমরা বিলক্ষণ জানি। সেই দিন হইতে আমরা যে নাট্যকলাকে বরণ করিয়াছি, তাহার উপাদান বৈচিত্র্যময় মানব-জীবন। এই নাট্য-কলার প্রাণ অ্যাক্‌শন্,—বাংলায় যাহাকে বলা চলে 'ঘটনা'। সংস্কৃত নাট্যকলার নিয়মপ্রণালীতে ঘটনার প্রাধান্য এতটা নাই; বরং তাহার বজ্রকঠিন গঠন-বিধানের শাসনে ঘটনাংশ বর্জ্জিত করিতেই কলাবিদ্ বাধ্য হন। কিন্তু, হয় রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,

নাহয় আমাদের রুচি ইংরেজি নাট্যকলায় পরিতৃপ্ত হইয়াছে। কারণ ঘটনাহীন নাটকে আজ আমাদের আসর জমিতেছে না। প্রমাণ, হালে অভিনীত 'সীতা' নাটকখানাই ধরিতেছি;—কারণ, লিপি-কুশলতায় ও অভিনয়-কুশলতায় বাংলার নাট্যরসলিপ্সুদের এই নাটকখানাই বোধহয় আজকাল বেশী তৃপ্তি দিয়াছে।—দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দিকে শম্বুক-বধে যাত্রার উদ্যোগের দৃশ্যাদিতে ঘটনা-হীনত্বে অভিনয় 'ঢিলা' হইয়া আসে; তৃতীয় অঙ্কে শম্বুকের বধ-দৃশ্যে তাহাকে ঝাঁকাইয়া জাগাইবার চেষ্টা হয় এবং সে চেষ্টা সার্থকও হয় (যদিও বধ-দৃশ্য সংস্কৃত নাট্য নির্ম্মাণনিয়মে রঙ্গমঞ্চে নিগর্হিত); চতুর্থ অঙ্কে রাম ও লবের প্রত্যভিজ্ঞার (recognition) আগে পর্য্যন্ত স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণের সমস্ত জল্পনা-কল্পনার মধ্যে ঘটনার অভাবে একটা জড়তা নামিয়া আসিতে চাহে। এই নাটকখানার সহিত শেক্‌সপীয়রের যে-কোনো একখানা বিয়োগান্ত নাটকের তুলনা করিলেই দেখিতে পাই, ঘটনাস্রোতের স্বচ্ছন্দ ত্বরিত গতিতে দর্শক ও শ্রোতার মন আদ্যন্ত কিরূপ সচেতন থাকে। অপরপক্ষে, দুই একখানি সংস্কৃত নাটক (যথা 'মৃচ্ছকটিক') কতকাংশে বাদ দিলে, স্বয়ং কালিদাসের মহানাটক কয়খানি লইলেই দেখিব, এককালে উজ্জয়িনীর রাজসভায় 'নাটয়তি'র যতই আদর হউক, এ যুগে বাংলার রঙ্গমঞ্চে তাহা আর নাট্য-রসিকদের তেমন তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। এ' জন্য এ' যুগের রুচিকেই সর্ব্বাংশে দোষী করাও বোধহয় সমীচীন নয়; কারণ কালিদাসের নাটকাবলীতে কবিত্ব-সুষমার প্রাচুর্য্য থাকিলেও জীবন-প্রগতির চিহ্ন নিতান্তই অল্প। কবিত্বের সৌন্দর্য্য সম্যক উপলব্ধি হয়

একমাত্র পাঠকের নিভৃত কক্ষে ; কিন্তু সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ গতির আনন্দে স্পন্দিত হইতে বাধ্য।

ঘটনা-সংস্থান আধুনিক নাটকের বস্তু হইয়া উঠাতে ঘটনা-বাহুল্য আধুনিক নাটকের আখ্যানকে অনেক সময় অনাবশ্যকরূপে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। গ্রীক নাট্য-শাস্ত্রে উল্লিখিত 'ঐক্য-ত্রয়' পরিত্যাগ করিবার পক্ষে সুযুক্তি যথেষ্ট আছে, এবং ইংরেজ নাট্যকার সে নিগড় ভাঙিয়া ফেলাতেই ইংরেজের মন তাহার নাটকের মধ্য দিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া ও সুন্দর করিয়া বিকশিত করিতে পারিয়াছে ; কিন্তু ঘটনা-বৈচিত্র্যের নামে 'ঘটনা-ঐক্যকে' বিসর্জ্জন দিয়া কোনো কোনো অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী নাট্যকার ঘটনা-বাহুল্যে আখ্যানভাগ সাজাইতে গিয়া মুখ্য ঘটনাকে যথোচিত প্রস্ফুটিত করিতে পারেন নাই; ফলে, নাটক শিথিল-গ্রন্থী ও লক্ষ্য-হারা হইয়া পড়িয়াছে। ঘটনা-বৈচিত্র্য কোনো একটি মুখ্য ঘটনাকে কেন্দ্রীভূত করিয়াই সংস্থান করিতে হইবে; বাংলার কোনো কোনো নাট্যকার এই তত্ত্বটির প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেন নাই। পাশ্চাত্য নাটকের পদ্ধতিকে যখন আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তখন পাশ্চাত্য নাটকের উৎস-মূল গ্রীক নাটকের পদ্ধতিকেও একটু অনুশীলন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত হইবে।

(৪)

নাট্যকলার প্রথম প্রয়োজন,—নাট্য-সাহিত্য। অভিনয়োপযোগী নাটক রসকে উৎসারিত করিবে, যুগের রুচিকে তৃপ্ত করিবে, অথচ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগ-শিল্পকে বিস্মৃত হইবে না। বাংলা নাট্য-সাহিত্য লইয়া বেশী গৌরব করা চলে না; বেশী আশা করা চলে কিনা, তাহা

বিবেচ্য। নাট্যকারের শিল্প নিরপেক্ষ নয়;—রঙ্গমঞ্চের ও প্রেক্ষাগৃহের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যদি যথেষ্ট সুরুচিবিকাশের অবসর না থাকে, তবে নাট্যকারের নিকটেও রুচির বা রীতির উন্নতি প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। ইহা ছাড়া, পাশ্চাত্য পদ্ধতির নাট্য-কলার পক্ষপাতী হইলেও, এ কথাটি ভাবিয়া দেখিবার মত যে, পাশ্চাত্য পদ্ধতির নাট্য-সাহিত্য গড়িবার মত মনোবৃত্তি বাঙালীর আছে কি না। বাঙালী প্রধানত ভাব-বিলাসী জাতি; তাই, তাহার জাতীয় মন স্ফূর্ত্তি পায় প্রায়ই লিরিক্-এ বা গীতি-কবিতায়। আমাদের সংস্কৃত নাটকে এবং প্রাচীন যাত্রায় তাই সঙ্গীতের ও কবিত্বের বাহুল্য। কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকে এরূপ কবিত্ব ও ভাব-বিলাস দুই-ই অসম্ভব। আমাদের কবিত্ব ঘটনা-স্রোতকে অবাধে বহিতে না দিয়া নাটকের গতিকে রুদ্ধ করে; আমাদের হৃদয়াবেগ নাট্যকারের নিরপেক্ষতা বা নির্লিপ্ততা নষ্ট করিয়া চরিত্র-চিত্রণের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। বোধহয় এরূপ কবিত্ব ও হৃদয়াবেগের তাড়নাতেই, আমাদের দেশের পরিপূর্ণ প্রতিভা সাহিত্যের অপরাপর ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে-কোনো মনীষার সমকক্ষ হইলেও, একমাত্র নাট্য-সাহিত্যে তাহাদের সমতুল্য হইতে পারে নাই। তথাপি আশা করা যাইতে পারে যে, যখন বাঙালী নাট্যরসিকের প্রাণ ঐরূপ নাটকের অভিনয়ে আনন্দিত হয়, তখন বাঙালী নাট্যকারের মনও ঐরূপ নাটক সৃষ্টি করবার মত শক্তি আয়ত্ত করিতে পারিবে।

খুব সম্ভবত আমাদের জীবন-যাত্রাপ্রণালীও আমাদের নাট্য-কলাকে বিকাশের উপযুক্ত পরিসর দেয় না। সমস্ত আর্টই, বিশেষতঃ নাটক,—জাতীয় জীবনের প্রাণ-স্পন্দনের অপেক্ষায় বসিয়া

থাকে; সে জীবন যখন শতমুখী ধারায় নাচিয়া উঠে, তখনই সূচিত হয় নাট্য-কলার সম্পদের যুগ। এ কথা, এথেনীয় নাটক সম্বন্ধেও সত্য, এলিজাবেথীয় নাটক সম্বন্ধেও সত্য। কিন্তু জীবন যেখানে শুকাইয়া আসিয়াছে, নাট্যকলা সেখানে প্রাণরস পাইবে কোথায়? আমাদের আধুনিক বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রা তাই নাটকের ঘটনা-বৈচিত্র্যের দাবী মিটাইতে পারে না; ফলে, আমাদের নাট্যকার আমাদের অধুনাতন জীবনকে ছাড়িয়া দিয়া অতীতের কুয়াসাচ্ছন্ন প্রেক্ষাপটের উপরে বিচিত্র ঘটনার সংস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের রঙ্গমঞ্চে আমাদের একালের জীবনের যে দৃশ্যটি আমরা নানা আকারে প্রতিফলিত করিয়াছি, তাহা আমাদের স্বদেশ-প্রেম। খুব সম্ভব, এরূপে সি-আই-ডি'র চোখে ধূলি দিয়া রঙ্গমঞ্চকে বক্তৃতামঞ্চে পরিণত করিয়া আমরা আর্টের দিক দিয়া লাভবান্ হই নাই। মনে হইতেছে, বাঙালী এরূপ স্বদেশী প্রচারের মোহ কাটাইয়া উঠিতেছে।

আমাদের জীবন-বিন্যাসের জন্য যে নাট্য-সাহিত্য সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার আর একটি প্রমাণ পাই আমাদের রঙ্গমঞ্চে রঙ্গরসের দৈন্যে। ৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায়কে বাদ দিলে আধুনিক কালে কোনো নাট্যকার সুপরিচ্ছন্ন রঙ্গরস ফুটাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর মনে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের অভাব নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সব সময়ে স্বচ্ছ নয়, বিশেষতঃ বাংলা রঙ্গমঞ্চের নটদের কৃপায় তাহা এমনি বিসদৃশ ও রূঢ় আকারে দেখা দেয় যে, অনেক সময়েই তাহা রুচিকর হয় না। যে শক্তিমান নাট্যপ্রতিভা হাসি ও অশ্রুর সমাবেশে হাসিকে করুণ ও অশ্রুকে আরো ঘনীভূত

করিয়া তুলিতে পারেন, বাঙালী তাহাদের অনুকরণে প্রায়ই অক্ষম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। অমার্জ্জিত রঙ্গ-চেষ্টা দ্বারা গুরু-গম্ভীর নাট্য-বস্তুকে বিশ্রামের অবসর দেওয়া অপেক্ষা বোধহয় গ্রীক্-নাট্যপদ্ধতি অনুযায়ী ঐরূপ নাটক হইতে রঙ্গকে একেবারে বর্জ্জন করাও অন্যায় হইবে না। আপনাদের পরিচিত 'সীতা' নাটক-খানার করুণ দৃশ্যাবলীর মধ্যে যে একটিমাত্র অর্থহীন উৎকট ভাঁড়ামির দৃশ্য আছে, তাহা বিসর্জ্জন দিলে কি বিশেষ ক্ষতি হইত? বরং ঐরূপ একটি নীচুদরের হাসির দৃশ্যের রেশটা পরবর্ত্তী দৃশ্যের করুণ ঘটনা-বলীর মধ্যেও জাগিয়া থাকিয়া শ্রোতার চিত্তে সে করুণ রস সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধির পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। গ্রীক-নাটকীয় 'রস-ঐক্য' ভাঙিতে পারে একমাত্র তেমনিতর প্রতিভা, যে প্রতিভা হ্যামলেট্-এর সমাধি-খনক, ম্যাক্‌বেথ্-এর প্রতিহারীদ্বয়, বা লীয়রের 'বিদূষকের' মত রঙ্গ-চরিত্রের অবতারণায় নাটকের দুঃখবস্তুকে আরও নিবিড় ও নিগূঢ় করিয়া তুলিতে পারে। তেমনিতর প্রতিভা বাঙালীর মধ্যে সুলভ নয়। এদেশে একদিকে 'ফার্স্' বা বিদ্রূপাত্মক তরল নাট্য ও 'অপেরা' বা গীতিবহুল নাটিকা, এবং অপরদিকে গম্ভীর মিলনাত্মক নাটকের পাশ কাটাইয়া নিছক হাস্যরসকে আশ্রয় করিয়া যে একখানি সুপরিচ্ছিন্ন কমেডি রচিত হইয়াছে,—'চিরকুমার সভা',—একমাত্র তাহার প্রতিভাবান্ কবিই কমেডির হাসিকে সকরুণ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বাঙালীর স্বাভাবিক এতগুলি অন্তরায় সত্ত্বেও, আমরা বিশ্বাস করি অদূর ভবিষ্যতে বাঙালী-মন নাট্য-সাহিত্যেও যথোপযুক্তরূপে তাহার ঐশ্বর্য্য সম্ভারের প্রমাণ দিতে পারিবে; কারণ বাংলার

রঙ্গমঞ্চ ও বাংলার জনসাধারণ তাহার সাহিত্য-সমাজকে এই জন্ত তাগিদ দিতে সুরু করিয়াছে।

(৫)

প্রয়োগ-শিল্প রূপদক্ষের দ্বিতীয় প্রয়োজন। নাট্যোক্ত ঘটনার উপযুক্ত আব্‌হাওয়া যদি রঙ্গমঞ্চে বিরাজ না করে,—দৃশ্যপটে, বেশ-বিন্যাসে, কুশীলবগণের আচরণে,—তবে সে অভিনয় প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতাদের হৃদয়ও অনেক সময় স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ নাটক 'দৃশ্যকাব্য',—শ্রাব্যকাব্য নয়;—মানুষের মনকে নাটক প্রধানত দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই ছুঁইতে চাহে। তাই নাটকে অ্যাক্‌সন্ বা 'ঘটনার' প্রয়োজন; এবং ঠিক এই কারণেই প্রয়োগ-শিল্প,—অর্থাৎ যথোচিত দৃশ্যপট, বেশভূষা, এবং কুশীলবগণের চলা-ফেরা আদব-কায়দা প্রভৃতির উপর নাট্যকলা অনেকটা নির্ভর করে। আধুনিক কালের ফুট্‌পাথের উপর দাঁড়াইয়া বাদ্‌শা আওরংজীব জাহানারার সঙ্গে কথা বলিতেছেন, অথবা আধা-মুসলমানী পরিচ্ছদ পরিয়া শ্রীরামচন্দ্র বা কোনো পৌরাণিক রাজা জম্‌কালো মুসলমানী কারুকার্য্যখচিত রাজসভায় মুনিদের সাদর আপ্যায়ন জানাইতেছেন,—এ দৃশ্য অনেক সহৃদয় দর্শকের সাধু-ইচ্ছাকেও আহত করে।

বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে শকুন্তলার অভিনয়ে গাছের গুঁড়িসুদ্ধ বৃক্ষান্তরালস্থ দুষ্মন্তকে রঙ্গমঞ্চে হাজির করিলে, তাহাতে দর্শকমণ্ডলীকে রস-বঞ্চিত ও অপমানিতই করা হইবে। রবীন্দ্রনাথের সেই কথাগুলি আজ আবার মনে করিবার সময় আসিয়াছে। একদিন এ বিষয়ে আমাদের রঙ্গমঞ্চে যেমন [illegible]

সর্ব্বব্যাপী ছিল, আজ মনে করিবার হেতু আছে যে, পার্শী থিয়েটারের চমকপ্রদ-দৃশ্য ও অর্থহীন ম্যাজিক্‌কে আদর্শ করিয়া, আমাদের রঙ্গাধ্যক্ষগণ কেহ কেহ তেমনি ঐশ্বর্য্যের বহরে ইতর সাধারণকে চমৎকৃত করিবার চেষ্টায় তৎপর হইয়াছেন। আবার এরূপও মনে হইতেছে যে, কোনো কোনো রঙ্গাধ্যক্ষ 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' নীতি অনুসরণ করিয়া, রঙ্গমঞ্চের পুঙ্খানুপুঙ্খ দ্রব্যে ও আবহাওয়াকে পরিস্ফুট করিয়া অভিনয়কলা থেকে সাধারণ দর্শকের মনকে প্রয়োগকলায় অতিরিক্ত মাত্রায় আকৃষ্ট করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ দুইই পরিত্যজ্য। প্রয়োগ শিল্পের মিতব্যবহারই সূত্রধারের লক্ষ্য হইবে;—তিনি দেখিবেন যেন শ্রোতৃমণ্ডলীর কল্পনাবৃত্তি ব্যাহত না হইয়া বা একেবারে সীমাবদ্ধ না হইয়া যথোচিত বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ছুটি পায়।—দর্শকের কল্পনা-বৃত্তিকে জাগাইয়া তোলাই প্রয়োগ-শিল্পের উদ্দেশ্য।

(৬)

শেষ কথা এবং সার কথা,—রূপদক্ষের নিজ কলা-নৈপুণ্য। শুনিয়াছি, ভরতের নাট্যসূত্রে রূপদক্ষকে ছায়াতুল্য বলা হইয়াছে। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের ছায়াকে বুকে প্রতিফলিত করিয়া কান্তিমান দেখায়, 'নাট্যসূত্রের' মতে রূপদক্ষও তেমনি আখ্যানস্থ কুশীলবগণের স্বরূপ নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করিয়া প্রকাশ করিবেন। এই কারণেই অলঙ্কারশাস্ত্র অভিনয়কে 'রূপক' বলিয়া সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছে। 'রূপারোপাত্তু রূপকম্'; নটে রামাদি স্বরূপ আরোপিত হয়, তাই অভিনয় 'রূপক'। এই রূপকত্বের বিকাশ চারিপ্রকারের অনুকৃতি সাপেক্ষ; যেমন 'আঙ্গিক' (কর্ণ-নয়নাদি ভঙ্গিমায়), 'বাচিক'

(কথার), 'আহার্য্য' (বেশ-বিন্যাসাদির), 'সাত্ত্বিক' (খেদাদি সাত্ত্বিক ভাবের)। এটি লক্ষ্য করিবার মত যে, প্রধানত রূপকলা বা হিস্ট্রিয়নিক্ আর্ট যে সব প্রণালীকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করে, এখানে মোটামুটি আলঙ্কারিক তাহার সন্ধান দিয়াছেন। কিন্তু সকল কালের সকল আলঙ্কারিক কলা-বিদ্যা বিবেচনা করিয়া যে কথাটি বিস্মৃত হন, সেটি এই প্রাচীন আলঙ্কারিকের দৃষ্টিও এড়াইয়া গিয়াছে। সে সত্যটি এই যে, রূপ অলঙ্কারসাপেক্ষ নয়, এমন কি সর্ব্বাংশে দেহ-কান্তির উপরও নির্ভর করে না। রূপদক্ষের নৈপুণ্য যতই নিখুঁত হউক না কেন, রূপদক্ষ যদি তাহার মধ্যে একটু 'প্রাণের পরশ' না দিতে পারেন, তবে তাহা বেখাপ্পা ঠেকিবেই। অপরপক্ষে আপনার ভূমিকার সহিত যে কলাবিদ প্রাণ মিশাইতে পারিয়াছেন, তাঁহার অভিনয় প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাণকে সেই তাড়িৎস্পর্শে সচল করিয়া তুলিবে। সকল কলাবিদেরই নিজ নিজ কলায় যে 'দরদ' ঢালিতে হয়, এই কথাটা আজ শুনিতে শুনিতে আমাদের কানে এক-ঘেয়ে লাগিলেও ভুলিলে চলিবে না যে, 'দরদ'-হীন আর্ট যান্ত্রিক ওস্তাদীতে গিয়া ঠেকিতে বাধ্য।

দরদ ফুটাইতে হইলে অভিনেতার শুধু অভিনয়শক্তির প্রাচুর্য্য থাকিলেই চলে না; তাঁহার কিছু আইডিয়াও থাকা দরকার। অর্থাৎ রূপদক্ষের মন যেমন সুপরিসর হওয়া চাই, তাঁহার কল্পনা বৃত্তিও তেমনি ব্যাপক হওয়া চাই। এক কথায়, 'হাটুরে' লইয়া অভিনয় চলে না; এবং এই কথাটি বাংলা দেশের রঙ্গ-রসিকদের ও রঙ্গালয়ের পরিচালকদের মনে রাখা এখন কর্ত্তব্য। শুনিয়াছি ফ্রান্স্ প্রভৃতি কোনো কোনো দেশে, যেখানে সরকার কয়েকটি রঙ্গালয়

পরিচালনা করেন, সেখানে অভিনেতাদের আর্ট বিষয়ে শিক্ষার এবং উপদেশের বন্দোবস্ত আছে। সেইখানে রূপকলা আয়ত্ত করিলে পর, সরকারী রঙ্গালয়ে প্রবেশের অধিকার তাঁহাদের জন্মায়। আমাদের দেশে বিদেশী সরকারের কর্তৃত্বে স্বদেশী নাট্যকলা গড়িয়া উঠিতে পারে কিনা সন্দেহ। সরকারের সহকারিতা আমরা এ ক্ষেত্রে যাচ্ঞাও করি না। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে, এবং অভিনেতৃগণ নিজেদের আচরণে ও কলাজ্ঞানে সেই পরিবর্ত্তনে সহায়তা না করিলে, সকল সময়ে সকলক্ষেত্রে আমাদের প্রার্থিত আদর্শানুরূপ রূপদক্ষ পাওয়া দুর্ঘট। এই কারণেই, বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পাশাপাশি সৌখীন নাট্য-পরিষদের স্থান রহিয়াছে; এবং এই কারণেই অনেকাংশে এ দেশের সহরে ও পাড়াগাঁয়ে এত অগণ্য 'সৌখীন থিয়েটার' ও 'এমেচর অ্যা কৃটরের' দর্শন মিলে। এই সব সৌখীন নাট্যপরিষদ নাট্যকলায় প্রায়ই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অনুকরণ করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। তথাপি ইহারি মধ্যে এমন দুই একটি মণ্ডলী আছেন, যাঁহারা বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে নবযুগের সূচনা করিয়াছেন— যেমন, কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিয়ুট্। সাধারণ রঙ্গালয়ের মত ইঁহাদের লাভলোকসানের খোঁজ লইতে হয় না; তাই ইতর সাধারণের রুচিকে প্রাধান্য না দিয়া কেবলমাত্র আর্ট হিসাবে নাট্যকলার অনুশীলনে ইঁহারা যত্নবান হইবেন,—বাংলার নাট্যরসিকগণ ইঁহাদের নিকট এরূপ দাবী করিতে পারেন।

গুণবান্ অভিনেতার প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহার রূপবান্ হওয়াও প্রার্থনীয়, এ কথাটি ভুলিলেও

চলিবে না। এই বিষয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ সজাগ হইয়াছেন, কিন্তু সৌখীন থিয়েটর কোম্পানিগুলি এখনো যত্নবান হন নাই। দৈহিক সৌন্দর্য্য অভিনেতার পক্ষে এক অপরূপ সম্পদ। পাশ্চাত্য দেশে এই সম্পদ যে কি দরে বিকায়, তাহা মাঝে মাঝে সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া সংবাদদাতারা যাঁহাদের ঘোষিত করেন, চলচ্চিত্রের কর্তৃপক্ষদের নিকট সে সব রূপসীদের কদর হইতেই আমরা জানিতে পারি। অবশ্য, ভূমিকার সহিত সঙ্গতি থাকিলে, যিনি রূপবান্ নন, তিনি কখনো কখনো আপনার রূপহীনত্বকেই সার্থক করিতে পারেন। ভুঁড়ি অভিনেতার পক্ষে বিঘ্ন হইলেও 'ফল্‌স্টাফের' ভূমিকা অভিনয়ে তাহা মানাইয়া যায়; কিন্তু কোনো ভুঁড়িওয়ালা কিরূপ 'রোমিও' হইবে, তাহা আর না নির্দ্দেশ করিলেও চলে।

সাধারণত শ্যামবর্ণের উপর আমরা প্রায়ই বিরূপ; আমাদের আদর্শ অনেকটা সাহেবী কটা রং। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের লেখায় পড়িয়াছি যে, শ্যামরূপ আসলে শ্বেতরূপের চেয়ে উৎকৃষ্ট,—কারণ, শ্বেতবর্ণে আছে মরুভূমির ঊষরতার চিহ্ন, শ্যামবর্ণে আছে প্রাণময়ী শ্যামলা ভূমির প্রাণের ছাপ। কথাটা সর্ব্বাংশে হয়ত কবির কবিত্ব নয়; তথাপি এ কথা ঠিক যে, অনেক ঘনশ্যাম নটবরের দেহে অঙ্গরাগের সমস্ত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিও ব্যর্থ হইয়া যায়। রুচিবিকারের জন্যই হোক্ বা যে কারণেই হোক্, রঙ্গমঞ্চে তাহাদিগকে 'সুন্দর' দেখিতে আমাদের দৃষ্টি অসমর্থ।

(৭)

বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে আজ আমূল পরিবর্ত্তনের ঢেউ আসিয়াছে; —নাচঘর আজ নাট্য-মন্দির হইতে সচেষ্ট। বাংলা দেশের সর্ব্বত্র

যে প্রাণের স্পন্দন পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহারই একটি কম্পন লাগিয়াছে আমাদের চির-ঘুমন্ত ভরতমুনির গায়ে। মনে হয় বৃদ্ধ ঋষির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

কিন্তু বাংলার নব রূপকলাকে সার্থক করিতে হইলে আরও দুইটি জিনিষ অদূর ভবিষ্যতে চাই। প্রথমত,—নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টি, যাহাতে রসকে আশ্রয় করিয়া ট্রাজেডি কমেডি প্রভৃতি রচিত হইবে, এবং নিতান্ত গতানুগতিক হাসি ও গানের স্বাদহীন খিচুড়ী পাকানো হইবে না; দ্বিতীয়ত, ভদ্র-সন্তানদের ন্যায় ভদ্র-মহিলাদেরও এই রূপ-কলার অনুশীলনে যোগদান। প্রথমোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। শেষোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রথমেই বিরোধ ঘটিবে। কারণ এ দেশ পর্দ্দার দেশ। পর্দ্দা সম্পর্কে আপনাদের কারো কোন মোহ না থাকাই ভালো। বাংলা দেশের জীবন এই পর্দ্দার দৌলতে অনেক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে; কিন্তু এই পর্দ্দার জবরদস্তি ঘুচাইয়া মহিলা-গণ ভারতীকে বিদ্যামন্দিরে যেরূপ বরণ করিতেছেন, নাট্য-মন্দিরেও সেরূপ বরণ না করিলে বাংলার নব রূপকলা পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইবে না।

এই পরিবর্ত্তনে আপত্তি হওয়ার আর একটি কারণ অবশ্যই এই যে, রঙ্গমঞ্চের আব্‌হাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। কোনো কালের কোনো রঙ্গশালার আব্‌হাওয়া স্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না। আর আজকালকার কথা ছাড়িয়া দিলাম,—এ যুগের চলচ্চিত্রের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বিবাহ-ভঙ্গ, বিবাহের চুক্তি-ভঙ্গ প্রভৃতি লীলাখেলার হিসাব রাখা, ঐ সব বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ

সতর্ক, তাঁহাদের পক্ষেও অসম্ভব। তথাপি বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে সুরুচির (সুনীতির না হউক) প্রসার বাঞ্ছনীয়। নাট্য-মন্দির এ বিষয়ে বিদ্যা-মন্দিরের শীলতা ও ভদ্রতার অনুকরণ করিলে, মহিলাদের পক্ষে যোগদান অসম্ভব হইবে না। উপযুক্ত অধ্যক্ষের নেতৃত্বে মাঝে মাঝে মহিলারা এরূপ যোগদান করিয়াছেন।

নাচঘর নাট্যমন্দির হইতে চাহিতেছে। সত্যসত্যই তাহার এ শুভ প্রয়াসে বাংলার সৌখীন নাট্য-পরিষদগুলি সহায়তা করিতে পারে। এইদিকে এরূপ কোনো কোনো নাট্য-সমাজ ইতিপূর্ব্বেই উপযুক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন; বাংলার অন্যান্য নাট্য-সমাজও তাহাদের অনুকরণে চেষ্টিত হউন।

সৌখীন নাট্য-পরিষদের আরো একটি কর্ত্তব্য আছে। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের মত নিতান্ত ঘটনা-বৈচিত্র্যময় নাটক লইয়াই ব্যস্ত না থাকিয়া, নব নব পদ্ধতির নাটক অভিনয় করিয়া দেশের রুচি ও মত গঠনে তাঁহাদের অগ্রসর হইতে হইবে। 'মৃচ্ছকটিক', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক বাংলা ভাষায় অভিনয় করিলে অনেক রসিক-চিত্তে আজকাল হয়ত উপভোগ্য হইবে। বিলাতী সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের মত প্রাচীন ও বিস্মৃত নাটকগুলিকে সঞ্জীবিত করিবার ভার আমাদের দেশের এ সব সমিতিই গ্রহণ করিবেন; কারণ, সাধারণের উপেক্ষা অনাদরে তাঁহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোনো কারণ নাই। গত যুগের নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকগুলিকে একবার এ যুগে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। নাট্য-সাহিত্যে যে নব নব পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে, তাহাও যাচাই করিতে হইবে আপনাদের স্থায় সৌখীন নাট্য-সমাজেরই। 'বাস্তব'-নাট্যের বাস্ত-

ঘটনার বাহুল্যকে উপেক্ষা করিয়া আধুনিক কালে নাট্য-সাহিত্য অন্তর্ম্মুখীন হইয়া উঠিতেছে;—কোথাও রহস্যনিবিড় কুয়াসার অস্পষ্ট ইঙ্গিত লইয়া তাহার কারবার, কোথাও বা মানব-অন্তরের অন্তর্লোকস্থ গোপন-চেতনার গতি ও ভঙ্গিমার রূপকে আভাষ দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য। এইরূপ বিদেশীয় নাট্যগুলিকে অনুবাদ করিয়া অভিনয় করা অসম্ভব হইলেও, স্বদেশীয় বিচিত্র সৃষ্টি-গুলিকে রঙ্গমঞ্চে কতদূর সার্থক করা যায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'গৃহপ্রবেশ' তাহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের আবেদন লইয়া উপস্থিত হইলেও গৃহীত হইবে না। কারণ এরূপ নাটককে উপভোগ করিবার মত সৌন্দর্য্য-বোধ, শিক্ষা ও সাধনা-সাপেক্ষ। কিন্তু সৌখীন নাট্য-সমাজের অভিনয়ে নির্ব্বাচিত রসিক জনের কাছে হয়ত 'রাজা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি সুকুমার নাট্য-সম্পদগুলি তৃপ্তিদায়কই হইবে,—'চিত্রাঙ্গদা', 'মুক্ত-ধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বাহ্যবস্তু-মূলক নাটকগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও।

কেবলমাত্র সাধারণ ও সচরাচরের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ না করিয়া বাংলার সৌখীন রূপদক্ষগণ অফুরন্ত আনন্দ ও অপরিসীম দুঃসাহসে ভর করিয়া লুপ্ত-রেখা অতীত যুগের পথে অথবা চিহ্ন-হীন নব-নব পথে কলালক্ষ্মীর অভিসারে যাত্রা করিবেন, ইহাই আজকার সন্ধ্যায় আপনাদের নিকটে আমাদের নিবেদন।

শ্রীগোপাল হালদার।

গীত-পঞ্চক।

——:•••:——

(১)

সকল বেলার আলোয় বাজে
　　　　বিদায়ব্যথার ভৈরবী,
　　　　আন্ বাঁশি তোর, আয় কবি॥
শিশির-শিহর শরৎপ্রাতে
শিউলি ফুলের গন্ধ সাথে
গান রেখে যাস্ আকুল হাওয়ায়;
　　　　নাই যদি রোস্ নাই র'বি॥
এমন উষা আসবে আবার
　　　　সোনায় রঙীন্ দিগন্তে,
　　　　কুন্দের ফুল সীমন্তে।
কপোত-কূজন করুণ ছায়ায়,
শ্যামল কোমল মধুর মায়ায়
তোমার গানের নূপুর-মুখর
　　　　জাগ্‌বে আবার এই ছবি॥

হ্যার্বর্গ, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬।

——

(২)

ভালো লাগার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ।
ভুবন জুড়ে রইল জেগে আনন্দ আবেশ ॥
দিনান্তের এই এক কোণাতে সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ ॥
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধহাওয়ার পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল দেহ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ ॥

ষ্টুটগার্ট, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬।

---

(৩)

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে স্রোতে
রঙের খেলাখানি।
চেয়োনা তারে মায়ার ছায়া হ'তে
নিকটে নিতে টানি ॥
রাখিতে চাহো, বাঁধিতে চাহো যারে
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে,
বাজিল যাহা প্রাণের বীণাতারে
সে তো কেবলি গান, কেবলি বাণী ॥

দিবসরাতি দেব-সভার মাঝে

যে সুধা করে পান,

পরশ তার মেলেনা, মেলেনা যে,

নাহি যে পরিমাণ।

নদীর স্রোতে, ফুলের বনে বনে,

মাধুরীমাখা হাসিতে, আঁখিকোণে,

সে সুধারস পিয়ো আপন মনে,

নিয়ো তাহারে জানি॥

কলোন, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬।

---

(৪)

আপন গানের টানে, তোমার

বন্ধন যাক্ টুটে।

রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে

কাঁদন জেগে উঠে

বিশ্ব-কবির চিত্ত মাঝে

ভুবনবীণা যেথায় বাজে,

জীবন তোমার সুধার ধারায়

পড়ুক সেথায় লুটে॥

ছন্দ তোমার ভেঙে গিয়ে

দ্বন্দ্ব বাধায় প্রাণে।

অন্তরে আর বাহিরে তাই

তান মেলে না তানে।

সুর-হারা প্রাণ বিষম বাধা,
সেই তো আঁধি, সেই তো ধাঁধা,
গান-ভোলা তুই গান ফিরে নে,
যাক্ সে আপদ ছুটে ॥

ড্যাসেলডর্ফ, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬।

---

(৫)

আপনি আমার কোন্‌খানে
বেড়াই যে সেই সন্ধানে।
নানান্ রূপে, নানান্ বেশে,
ফেরে যে জন ছায়ার দেশে,
তার পরিচয় কেঁদে হেসে
শেষ হবে কি, কে জানে ॥
আমার গানের গহন মাঝে
শুনেছিলেম যার ভাষা,
খুঁজে না পাই তার বাসা।
বেলা কখন্ যায় গো বয়ে,
আলো আসে মলিন হয়ে,
পথের বাঁশি যায় কী কয়ে
বিকালবেলার মূলতানে ॥

দার্জিলিং, ৬ই অক্টোবর ১৯২৬। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দশম বর্ষ, পৌষ, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ললিতকলার বিকাশের ফলে যে তার মধ্যে individuality-র উত্তরোত্তর বিকাশ হ'তে বাধ্য, এবং এ individuality-র বিকাশ সীমাকে উত্তরোত্তর স্বীকার ক'রে নিয়ে তবে আত্মপ্রকাশ করে, এ-বিষয়ে কবিবরের কথাগুলি খুবই সারগর্ভ ও গভীর মনে হয়। আমি কেবল বল্‌তে চাই যে, তাই ব'লে বলা চলে না যে আধুনিক বাংলা গানের মধ্যে শুধু সীমার দাবী বেশি হ'য়ে ওঠার দরুণই সৌন্দর্য্যে তার স্থান হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (কবিবর অবশ্য এ কথা বলেন নি—তিনি ব'লেছেন ললিতসৃষ্টি শ্রেষ্ঠ হবার কয়েকটি সর্ত্ত বা বিশেষ stage আছে; কিন্তু অনেকে হয়ত তাঁর কথাগুলিকে এই ভাবে নেবেন ব'লে গোড়াতেই এ কথাটা জোর ক'রে ব'লে রাখা আবশ্যক মনে করলাম।) তবে ভবিষ্যতে যে সঙ্গীত সুরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমাকেই স্বীকার ক'রে বড় হ'য়ে উঠ্‌বে, শুধু সুরের অবাধ লীলা-খেলার পথেই চল্‌বে না—তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী খুবই সম্ভব বলে মনে হয়। কেন না ইতিমধ্যেই কয়েকটিমাত্র গানের প্রকৃতি ও রস পর্য্যালোচনা ক'রে দেখ্‌লে দেখা যায় যে, তাদের গঠন-প্রকৃতির একটু এদিক-ওদিক করার ফলে প্রায়ই তারা হীনপ্রভ হ'য়ে ওঠে: (যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের "ধনধান্যপুষ্পভরা," "নীলাকাশের অসীম ছেয়ে," "ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর" প্রভৃতি গান; রবীন্দ্রনাথের "তুমি কেমন ক'রে গান কর যে গুণী," "আঁখি মোর ঘুম না জানে," "সফল জনম ভ'রে" "ও মোর দরদিয়া" প্রভৃতি গান; অতুলপ্রসাদের "এ মধুর

রাতে বল কে বীণা বাজায়," "কোথা লুকালে ভারতভানু" প্রভৃতি গান এবং আরও দুচারটি অন্যান্য রচয়িতার গান।) কিন্তু পক্ষান্তরে আবার অনেক গানের সুরই স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ভঙ্গীতে গাইলে উজ্জ্বলতর হ'য়ে ওঠে; এবং এমন বিস্তর গান আছে, (এইরকম গানের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী), যে সব গানের সুর হুবহু বজায় রাখ্‌লেও তাতে ক'রে তাদের রস খুব গভীর হ'য়ে ধরা দেয় না। অন্যান্য বেশির ভাগ চল্‌তি সুরের বাংলা গান একটু ক্ষণিক শ্রুতিমধুরতা ছাড়া কোনও নিবিড় রসস্ফূর্ত্তির দাবীদাওয়া রাখ্‌তে পারে না;—শ্রেষ্ঠ ঢঙের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের লীলাবিলাসের প্রেমোজ্জ্বল ও সংহত আবেদন মনের উপর যে প্রগাঢ় ছাপ রেখে যায়, সে ছাপের সিকিও এ সব গানে পড়ে না। কিন্তু এটা একটু অবান্তর প্রসঙ্গ ব'লে আপাততঃ স্থগিত রেখে, (পরে দৃষ্টান্ত দিয়ে এ আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল) বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সব গানের সুরকেই হুবহু বজায় রাখার বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে কবিবরের যুক্তিগুলি নিয়ে একটু আলোচনা করব।

কোনও গানের সুরকে একটু স্বচ্ছন্দ গতি দেওয়ার বিরুদ্ধে কবিবরের যে যুক্তিটি সব চেয়ে প্রণিধান যোগ্য, সেটি হচ্ছে এই যে, তাতে ক'রে গানের রস উজ্জ্বলতর হ'ল কি না, সে কথা এখনই মীমাংসা করা সম্ভব নয়। তাঁর কঠিন প্রশ্নটি এই যে—"এ বিষয়ে কার রায় চরম প্রামাণ্য ব'লে গণ্য করা যেতে পারে?" প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া শক্ত—নিছক্ যুক্তির দিক দিয়ে। কিন্তু তবু এ প্রশ্নের উত্তরে একটি সমান কঠিন প্রশ্ন করা চলে।

প্রতি-প্রশ্নটি এই যে, ললিতকলার আবেদনের সম্পর্কে শুষ্ক যুক্তির রায়ই বড়, না প্রেরণার ও আনন্দের গভীরতার সাক্ষ্যই বড়?

অর্থাৎ, কোন একটা সুর গাইতে গাইতে যদি গায়ক প্রেরণাবশে তার কমবেশি এদিক-ওদিক করেন, ও যদি তার ফলে অনেকগুলি রসগ্রাহী সহৃদয় লোকের হৃদয়তন্ত্রী বেজে ওঠে—সুরটি কাটাছাঁটা ভাবে গাইলে যা' বাজ্‌ত না—তাহ'লে কি "ভবিষ্যৎ যুগের লোকে হয়ত কাটাছাঁটা সুরটাই বেশি পছন্দ কর্‌বে" এ যুক্তি আমাদের প্রেরণাকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারে? এটা আমার কাছে কেবল কথার কথা নয়—বহু স্থলে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অনেক ভাল গান সাবলীল ভঙ্গীতে গাইলে কাটাছাঁটা ভাবে গাওয়ার চেয়ে মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। এরূপ স্থলে কি শুধু "হয়ত", "যদি", অথবা "ভবিষ্যৎ-যুগে এটা না হ'য়ে, ওটা হ'লে কি হ'তে পার্‌ত"-রূপ নীরস যুক্তি সত্যকার গুণীর আত্মপ্রকাশকে বাধা দিতে পারে, না বাধা দেওয়া উচিত?

তা ছাড়া নিছক্ যুক্তি দিয়ে অনেক সময়ই যুক্তির উত্তর দেওয়া যায় না। একজন বড় দার্শনিক ব'লেছেন যে, আজ স্থিরসিদ্ধান্ত ক'রে ব'সে আছি যে amœba থেকে philosopher-এর ক্রমো-বিকাশটা বিবর্ত্তনবাদে জীবের উন্নতির সূচনা করে, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে দেখা যায় যে, এটা মোটেই যুক্তিসিদ্ধ নয়; কেননা এ মতটা হচ্ছে philosopher-এর,—amœba-র নয়।

কথাটা খুব সত্য। কিন্তু তবুও আমরা বলি মানুষ সাপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব, এবং আমার মনে হয় কথাটা সত্য, যদিও নিছক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। কারণ এটা অনেকটা অনুভূতির এলাকার মধ্যে এসে পড়ে।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এ কথা অক্ষরে অক্ষরে খাটে। খেয়াল গজলের

চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায়, "কেমন ক'রে জান্‌লে যে ভবিষ্যৎ যুগের লোকে গজলকেই খেয়ালের উপরে স্থান দেবে না?" —তাহ'লে নিরুত্তর হ'য়েই পড়তে হয়।

আসল কথা, মানুষ সত্যনির্ণয়ের পথ অনুক্ষণই হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছে, এবং শত শত ভুলচুক হওয়া সত্ত্বেও সে আবহমান কাল থেকে এ পথ খুঁজে চলেছে—নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই। কারণ পদে পদে ভুল হওয়া সত্ত্বেও, নিজের জ্ঞান বিচার ও স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করা ছাড়া নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।

তাই গানের ক্ষেত্রে যেখানে মনে হয় যে, কোন সুরের নড়চড় হওয়ার ফলে তার আবেদন অতি প্রত্যক্ষভাবে সমৃদ্ধতর হ'য়ে উঠেছে*—সেখানে কেমন ক'রে মানুষ "পাছে-ভুল-হয়" মন্ত্র জপ করে নিজের সহজ প্রেরণার রশ্মি সংযম করে?

সুতরাং এ সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান মনে হয়—দুইরকম সুরই

---

* এখানেও সেই চিরন্তন প্রশ্ন ওঠে—কার কাছে সমৃদ্ধতর হ'য়ে উঠেছে? রসগ্রাহী কাকে বল্‌ব? আমার কাছে যিনি রসজ্ঞ, রবীন্দ্রনাথের কাছে হয়ত তিনি রসজ্ঞ নন; বা রবীন্দ্রনাথের কাছে যিনি সমজদার, আমার কাছে হয়ত তাঁর গানের মতের কোনও মূল্যই নেই। আর্ট সম্বন্ধে মতভেদ এত বেশী যে, রুচির ব্যাপারে শেষটায় individual ও সমপ্রকৃতি দু'চার জন সমজদারকে আলাদা আলাদা পথ খুঁজতেই হয়—সত্য রসসৃষ্টির। এ বিষয়ে কাল খানিকটা পথ নির্দ্দেশ করে বটে—কিন্তু যুগভেদে রুচিভেদও দেখা গেছে। কাজেই এ বড় কঠিন সমস্যা—যার সন্তোষজনক সমাধান কখনো হবে কি না কে জানে? এক সময়ে ডিকেন্স, স্কট, বাইরণ খুব বড় ব'লে গণ্য হ'তেন। পরে রুষ ঔপন্যাসিকের যুগ এল। এখন আবার চেস্টারটন প্রমুখ সমজদারগণ ডিকেন্সের মধ্যে নতুন রস পাচ্ছেন।

বজায় রাখা। যাদের কল্পনা অল্প, অনুভবশক্তি ক্ষীণ ও প্রেরণাশক্তি নিবিড় নয়—তারা প্রচলিত সুরেরই হুবহু নকল করুক। কিন্তু যাঁরা সত্যই গুণী, তাঁদের কমবেশি স্বাধীনতা দেওয়া হোক্ তাঁদের প্রেরণাকে মূর্ত্তিমতী করতে। বেশ তো দেখা যাক্ না খতিয়ে এতে সুর-সমৃদ্ধির লাভই হয়, না লোকসানই হয়। কালের দরবারে সে বিচার হয়, হোক্। দু'রকম গানের ভঙ্গীই চলুক না কেন, দেখা যাক্ শেষে কে জয়ী হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—তাহ'লে সুরের inevitability-র দিকে ক্রমোবিকাশের সত্য সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হ'ল? এ প্রশ্নটির উত্তর দিয়েই এ প্রবন্ধের সমাপ্তি টান্‌ব।

এ সম্বন্ধে একটা কথা ভুল্‌লে কোনমতেই চল্‌বে না। সে কথাটি এই যে, যেমন সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সব ললিত-কলাতেই inevitable সৃষ্টি খুবই কম, সঙ্গীতেও তাই। অর্থাৎ সঙ্গীতেও উচ্চতম inevitable সৃষ্টি ঝাঁকে ঝাঁকে হয় না, বা কখনও হয়নি। উচ্চদরের গুণী এ কথা সহজেই প্রমাণ করতে পারেন যে, খুব কম গানই আছে যার সুর গুণীর হাতে পড়লে উজ্জ্বলতর ক'রে তোলা না যায়। যেহেতু এ কথা সত্য মনে করার কারণ আছে, (বড় সৃষ্টি সর্ব্বত্রই বিরল ব'লে), সেহেতু বলা যেতে পারে যে, খুব কম গানের ক্ষেত্রেই সুরের গরিমা ন্যায়তঃ inviolability-র দাবীদাওয়া রাখ্‌তে পারে। (এ ক্ষেত্রে কাব্য ও চিত্রকলার উপমা দেওয়া অসঙ্গত মনে হয়; কারণ পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখেছি যে, উপমা কখনও যুক্তির স্থান অধিকার করতে পারে না।) তাই পরিশেষে আমার বক্তব্য এইটুকুমাত্র যে, এক কথায় অধিকাংশ গানের সুরই গুণীর

হাতে পড়লে মনোজ্ঞতর হ'য়ে উঠ্‌বে—এ ধারণা অসঙ্গত নয়, যদি গুণীর সহজ সঙ্গতিজ্ঞান থাকে। নইলে অবশ্য গানটির রসের হানিই হবে। কিন্তু কোনও দাবীর সত্যতা অপ্রমাণ করবার জন্য অযোগ্যকে সে ভার দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়। যিনি সত্য গুণী হবেন, তিনি সে-সব ক্ষেত্রে সুরের নড়চড় করবার প্রয়োজনই বোধ করবেন না, যে-সব ক্ষেত্রে সুর এক রমণীয় বিকাশে সুসমঞ্জস ও গরীয়ান হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সুরের মহৎ বিকাশ যে-সম্মান ও inviolability-র দাবী করতে পারে, সামান্য বিকাশ সে দাবী করতে পারে না। অধুনাতন অধিকাংশ চল্‌তি বাংলা গানই স্বরসমৃদ্ধিতে বড় নয়, অথচ গুণীর হাতে পড়লে যথাযথভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। অথচ এমন বাংলা গানও আছে, যার সুরের মধ্যে বৈচিত্র্য আন্‌লে তাতে করে' তার রস বিশেষ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে না। অধিকাংশ স্থলেই এরূপ গানের ও সুরের গঠনভঙ্গীর মধ্যে মৌলিকতা থাক্‌তে পারে—কিন্তু কোনও গভীর স্বরসম্পদই থাকে না। এরূপ অধিকাংশ গানই যাকে বলে কেবল কানের মধ্যেই যায়, মরমে পশে না। এজন্য আমার মনে হয়, বর্ত্তমান বাংলা সঙ্গীতে সেই সব গানই সব-জড়িয়ে শ্রেষ্ঠতর, যে-সব গানের মধ্যে গায়কের নিজের personality বিশেষরূপে ফুটিয়ে তোল্‌বার অবকাশ বেশি থাকে। ভবিষ্যতে কি হবে জানিনে—কিন্তু বাংলা সঙ্গীত আজ অবধি যতটুকু বিকাশলাভ ক'রেছে, তাতে তাকে এর চেয়ে বেশি উঁচুতে চড়ালে হয়ত বাংলা মার প্রতি ভক্তি দেখানো হ'তে পারে—কিন্তু যথার্থ সঙ্গীতে রসবোধের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় না।

শ্রী দিলীপকুমার রায়।

কথা-সাহিত্য।

—✽০✽—

আজ বছর চার পাঁচ থেকে পূজোর সময় গল্প লেখবার ফরমায়েস আমি নিয়মিত পাই। প্রতিবারই আমি এ অনুরোধ কি ক'রে রক্ষা করব ভেবে পাইনে। আমি প্রবন্ধলেখক, গল্পলেখক নই। আমি অবশ্য পূর্ব্বে দু'চারটি গল্প লিখেছি; সে কারণ যদি আমি গল্পলেখক হয়ে উঠি, তাহ'লে আমি কবি ব'লেও গণ্য—কেননা আমি পদ্যও লিখেছি। কিন্তু কি গল্প, কি পদ্য, আমি যে অবলীলাক্রমে লিখিনে, তার প্রমাণ আমার ও-জাতীয় লেখার পরিমাণ অতি সামান্য। সে যাই হোক্, এডিটার মহোদয়দের বোঝা উচিত যে, প্রবন্ধলেখকদের গল্প লিখতে আদেশ করা, বক্তাদের গান গাইবার আদেশ দেওয়ার তুল্য। এর ফলে অনেক লেখক, যাঁরা সুপাঠ্য প্রবন্ধ লিখতে পারতেন, তাঁরা আজ অপাঠ্য গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছেন।

এডিটাররা যে কেন গল্প চান, তা আমি সম্পূর্ণ জানি। পাঠকরা, বিশেষতঃ পাঠিকারা গল্প চান, কাজেই এডিটাররাও লেখকদের কাছে তাই চাইতেই বাধ্য। গল্পে রুচি বাঙ্গালী পাঠকদের একচেটে নয়—ও রুচি বিশ্বপাঠকসামান্য। একজন ফরাসী সমালোচক লিখেছেন যে, তিনি বৎসরে কম-সে-কম ছশ'খানি নতুন নভেল পড়তে বাধ্য হন, তার সমালোচনা করবার জন্য। অর্থাৎ দিনে দুখানি নভেল গলাধঃকরণ করতে হয়। ভদ্রলোক এত নভেল পড়বার

সময় কোথেকে পান, বুঝতে পারিনে। কারণ Duhamel শুধু সমালোচক নন, তিনি ফরাসীদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখক, উপরন্তু তাঁর ব্যবসা হচ্ছে ডাক্তারী। এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এ যুগের পাঠকদের গল্প পড়বার লালসা কত বেশি। এ এপিডেমিক থেকে মুক্ত শুধু নিরক্ষর লোক—যেমন বেরি-বেরি থেকে মুক্ত শুধু নিরন্ন লোক।

কিন্তু একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি সকল যুগেই মানুষের সর্ব্বপ্রধান মানসিক আহার হচ্ছে গল্প। পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-ভাগের কথা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায়, সে অতীত গল্পপ্রাণ। এ দেশে পুরাকালে যত গল্প বলা হয়েছে ও লেখা হয়েছে, অন্য কুত্রাপি তার তুলনা নেই। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি ব'লে বিশ্বে পরিচিত। কিন্তু যুগ যুগ ধ'রে আমাদের ধর্ম্মের বাহন হয়েছে, মুখ্যতঃ গল্প। রামায়ণ মহাভারত বাদ দিলে হিন্দুধর্ম্মের পোনেরো আনা বাদ প'ড়ে যায়, আর জাতক বাদ দিলে বৌদ্ধধর্ম্ম দর্শনের কচকচি মাত্র হয়ে ওঠে। রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ছাড়াও এ দেশে অসংখ্য গল্প আছে, যা সেকালে সাহিত্য বলেই গণ্য হ'ত। এ দেশের যত কাব্যনাটকের মূলে আছে গল্প। তা ছাড়া আখ্যায়িকা ও কথা নামে দুটি বিপুল সাহিত্য সেকালে ছিল, এবং একালেও তার কতক অংশের সাক্ষাৎ মেলে। আখ্যায়িকাই বলো আর কথাই বলো, ও দুই হচ্ছে একই বস্তু—অন্ততঃ সেকালের আলঙ্কারিকরা অনেক তর্ক-বিতর্ক ক'রে শেষটা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,—

তৎ কথাখ্যায়িকা হেকা জাতিসংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা।
অত্রৈবান্তর্ভবিষ্যন্তি শেষাশ্চাখ্যানজাতয়ঃ ॥
(কাব্যাদর্শ—প্রথম পরিচ্ছেদ, ২৮ শ্লোক)।

অর্থাৎ ও দুই এক জাতি, শুধু নাম আলাদা। ইংরাজী লজিকের ভাষায় যাকে বলে genus এক, species আলাদা। এই species'ও বহুবিধ ছিল। তার মধ্যে পাঁচটির তাঁরা নাম উল্লেখ করেছেন :—

আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা।
কথালিকেতি মন্যন্তে গণ্যকাব্যঞ্চ পঞ্চধা ॥

এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে "কথা"ও চাররকম ছিল, যথা—"কথা", "খণ্ডকথা", "পরিকথা", "কথালিকা"। আর এই কথা-সাহিত্য সর্ব্বভাষাতেই রচিত হ'ত, সংস্কৃত ভাষাতেও। দণ্ডী বলেছেন যে,—

কথা হি সর্ব্বভাষাভিঃ সংস্কৃতেন চ বধ্যতে।

এর থেকে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের লৌকিক অলৌকিক সকল সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে কথা-সাহিত্য।

কথা-সাহিত্য এ দেশে বিলেত থেকে আমদানী-করা নূতন সাহিত্য নয়। বরং সত্য কথা এই যে, পুরাকালে ও সাহিত্য ভারতবর্ষে রচিত হয়ে, তারপর দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এককালে পঞ্চতন্ত্র ও জাতকের প্রচলন য়ুরোপের লোকসমাজে যে অতি বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উপরন্তু বহু পণ্ডিতের মতে আরব্য উপন্যাসের জন্মভূমিও হচ্ছে ভারতবর্ষ।

আজ যে আমরা সকলেই গল্প শুনতে চাই, তার কারণ এ প্রবৃত্তি আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। এ ত গেল শ্রোতা অথবা পাঠকের কথা।

এখন মুস্কিল হয়েছে লেখকদের। সমাজ যত গল্প চায়, তত গল্প আমরা জোগাই কোত্থেকে? কথা-বস্তু আমরা সংগ্রহ করব কোন্ জগৎ থেকে, সেই হয়েছে আমাদের ভাবনার বিষয়। আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বাচার্য্যরা যেখান থেকে তা সংগ্রহ করেছেন, আমাদেরও সেখান থেকে সংগ্রহ করতে হবে,—অর্থাৎ বই থেকে।

গল্পের উপাদান হয় জীবনের বই, নাহয় ত কাগজের বই থেকে আমদানী করতে হয়; এ দুই ছাড়া এমন কোন তৃতীয় বই নেই, যার থেকে আমরা গল্পের মাল-মসলা সংগ্রহ করতে পারি।

জীবন-গ্রন্থ থেকে কথা-বস্তু সংগ্রহ করা এক হিসেবে অতি সহজ। কেননা, এ গ্রন্থ সকলের সুমুখেই প'ড়ে রয়েছে। এ গ্রন্থ পড়বার জন্য কারও পক্ষে কোনরূপ ব্যাকরণ কি অভিধান মুখস্থ করবার প্রয়োজন নেই, কোনরূপ শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আর এক হিসেবে, এ বই পড়া অতি কঠিন। আমাদের অধিকাংশ লোকের এ পুস্তকের শুধু মলাটের সঙ্গে পরিচয় আছে। সে মলাট আমরা খুলতে ভয় পাই—কেন না আমরা জানিনে যে, জীবনের সামাজিক আবরণ উদ্‌ঘাটিত করলে তার ভিতর থেকে সাপ ব্যাং কি বেরিয়ে পড়বে।

অপরপক্ষে কাগজের বই থেকে কথা-বস্তু সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এক হিসেবে মামুলি। বড় বড় লেখকদেরই উদাহরণ দেওয়া যাক্। তাঁরা অনেকেই ও-বস্তু বই থেকেই সংগ্রহ করেছেন।

কালিদাস 'শকুন্তলার' কথাবস্তু নিয়েছেন মহাভারত থেকে, ভবভূতি 'উত্তররামচরিতের' কথাবস্তু নিয়েছেন রামায়ণ থেকে। অপর পক্ষে কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রের' কথাবস্তু কতক সংগ্রহ করেছিলেন ইতিহাস থেকে, আর কতক বানিয়েছিলেন নিজে। আর ভবভূতির 'মালতী-মাধবের' কথা সম্ভবতঃ আগাগোড়া তাঁর মনগড়া।

'শকুন্তলার' সঙ্গে 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র আর 'উত্তররামচরিতের' সঙ্গে 'মালতী-মাধবের' প্রভেদ যে কি, তা সকলেই জানেন। উপরি-উক্ত নাটকসমূহের তারতম্যের কারণ নির্ণয় করতে হ'লে বলতে হয় যে, লেখকরা পাকা হাতে কথাবস্তু সংগ্রহ করেন বই থেকে, আর কাঁচা হাতে জীবন থেকে। ভারতবর্ষ ছেড়ে বিলেতে গেলেও এই একই সত্যের পরিচয় পাই। Shakespeare-এর সব বড় নাটকের কথাবস্তু তাঁর মনগড়া নয়—তা তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী গল্পলেখকদের কথামালা থেকে সংগৃহীত।

আসল কথা, সাহিত্য-জগতে চুরি ব'লে কোনও জিনিষ নেই। রামের কথা শ্যাম আত্মসাৎ করতে পারলেই, তা শ্যামের কথা হয়ে ওঠে। এই আত্মসাৎ ক্রিয়াটাই প্রতিভাসাপেক্ষ। যে পরের জিনিষ নিজের মনের উত্তাপে গলিয়ে নিতে পারে না, সাহিত্য-রাজ্যে সে-ই চোরদায়ে ধরা পড়ে।

আর এক কথা, কাগজের বই থেকে গল্পের উপাদান সংগ্রহ করা যদি চুরি হয়, তাহ'লে জীবনের বই থেকে তা সংগ্রহ করাও চুরি। সত্য কথা এই যে, মানুষের সুমুখে দুটি জগৎ প'ড়ে রয়েছে—তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রকৃতির হাতে গড়া, অপরটি মানুষের হাতে গড়া।

এই উভয় জগৎ থেকেই মনের খোরাক সংগ্রহ করবার আমাদের সমান অধিকার আছে।

তাই যখন দেখতে পাই যে, সমালোচকরা গল্পলেখকদের প্রতি এই দোষারোপ করেন যে, তাঁরা তাঁদের কথাবস্তু বিদেশী সাহিত্য থেকে চুরি করেন, তখন অবাক হয়ে যাই। এ অপবাদ সত্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, কোন্ য়ুরোপীয় লেখকদের কোন্ গল্প বাঙ্গলা লেখকরা হস্তান্তর করেছেন, সে সন্ধান সমালোচকরা আমাদের দেন না। কিন্তু এ কথা যদি সত্যই হয়, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, সাহিত্য-জগতে চুরি ব'লে কোনও পাপ নেই। আর আমরা যদি য়ুরোপীয় সাহিত্যের দ্রব্য না ব'লে গ্রহণ করি, তাহ'লে সে কার্য্য নৈতিক হিসেব থেকে হেয় ব'লে গণ্য হয় না। সেকালে ভারতবর্ষ যদি দেদার কথাবস্তু বিদেশে রপ্তানী ক'রে থাকে ত একালে বিদেশ থেকে দেদার আমদানী করবার অধিকার আমাদের আছে। এ হচ্ছে আমাদের পিতৃঋণ পরকে দিয়ে শোধ করানো।

এ ক্ষেত্রে আসল বিচার্য্য হচ্ছে, য়ুরোপীয় কথাবস্তু আমরা যথার্থ আত্মসাৎ করতে পারি কি না। পঞ্চতন্ত্রের কথামালা যে য়ুরোপের অধিবাসীরা বেমালুম আত্মসাৎ করতে পেরেছিল, তার কারণ—সে সব কথা হচ্ছে বাঘ-ভাল্লুক, শেয়াল-কুকুর ইত্যাদির কথা। আর ও সব জীব পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একই ধরণের; অন্ততঃ সব দেশেই তাদের ভাব ও ভাষা একই ছাঁচে ঢালা। আর আরব্য উপন্যাসের কথা-কাহিনীর কোনও স্বদেশ নেই। ও পুস্তকের বর্ণিত ব্যাপার সব ভারতবর্ষেও যেমন অলৌকিক, আরবদেশেও তেমনই, য়ুরোপেও তাদৃশ।

কিন্তু একালের কথাবস্তু সবই লৌকিক, আর তার পাত্রপাত্রী সব মানুষ। এক দেশের লৌকিক আচারব্যবহার আর এক দেশের লৌকিক আচারব্যবহারের সঙ্গে মেলে না। তা ছাড়া য়ুরোপের স্ত্রীপুরুষ, শুধু চর্ম্মে নয়, মর্ম্মেও এ দেশের স্ত্রীপুরুষ থেকে অনেক তফাৎ। সুতরাং য়ুরোপের লোকদের বাঙ্গালীতে রূপান্তরিত করা তেমনই কঠিন, বাঙ্গালীকে ইংরাজ করা যেমন কঠিন। ও কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করবার মত হাত-সাফাই সকলের নেই।

এখন আমার প্রস্তাব এই যে,—এসো, আমরা সকলে সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের খনির ভিতর প্রবেশ করি, তাহলেই সেখান থেকে এমন সব রত্ন উদ্ধার করতে পারব, যা বঙ্গসরস্বতীর গায়ে অনায়াসে পরাতেও পারব, এবং তার ফলে বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য্য অপর্য্যাপ্তরকম বেড়ে যাবে।

এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করতে অনেকে ইতস্ততঃ করবেন। অনেকে বলবেন যে, সংস্কৃত ভাষা তাঁরা জানেন না। তাতে কিছু আসে যায় না। সত্য কথা বলতে গেলে ইংরাজীও আমরা জানিনে; সুতরাং ইংরাজীর আশ্রয় নিতে যদি আমরা রাজী থাকি, তাহ'লে সংস্কৃতের আশ্রয় নিতে নারাজ হবার কোনই কারণ নেই। এ কথা শুনে যাঁরা চম্‌কে উঠবেন, তাঁদের কাছে নিবেদন করি যে, যেরকম ইংরাজী তাঁরা জানেন, সেরকম সংস্কৃত তাঁরা সবাই জানেন। বাঙ্গালী লেখকমাত্রেই ত সাধুভাষা জানেন, আর সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের ভাষা প্রায় ঐ গোছের। এমন কি, অনুস্বর-বিসর্গ দেখে যাঁরা ভড়কান না, তাঁরা দু'দিনেই বুঝতে পারবেন যে, সে ভাষা সাধুভাষার চাইতে সহজবোধ্য।

কেউ কেউ হয়ত এই আপত্তি করবেন যে, সেকেলে গল্পে আমাদের মন উঠবে না। কেননা, তাতে একেলে গল্পের মত psychology নেই। এর উত্তরে বক্তব্য যে, একালের বহু ইংরাজী গল্পে গল্প নেই, আছে শুধু psychology। বিলেতের একটি বড় নভেলিষ্টের উদাহরণ নেওয়া যাক্। H. D. Wells-এর নভেলে কথাবস্তু ব'লে কোনও জিনিষ আছে কি? তাঁর নভেলের পাত্র-পাত্রীরা কি বড় বড় বক্তৃতা ঝোলাবার আলনামাত্র নয়? এখন এ কথা জোর ক'রে বলা যায় যে, নভেলই লেখো আর ছোট গল্পই লেখো, ভাষান্তরে আখ্যায়িকাই লেখো আর খণ্ডকথাই লেখো, ও দুয়েরই প্রাণ হচ্ছে "কথা", ওরফে গল্প। কথা-ছুট কথাসাহিত্য দর্শন, বিজ্ঞান, পলিটিক্‌স্ যা খুসি তাই হ'তে পারে, কিন্তু তা গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়। শিক্ষালাভ করতে আর কেউ থিয়েটারে যায় না— যায় স্কুলে। সংস্কৃত গল্পলেখকদের এ জ্ঞান ছিল যে, তাঁরা স্কুলমাষ্টার নন। সকল বিলেতি লেখকের তা নেই। সে যাই হোক্, সংস্কৃত গল্পে যে psychology নেই—এ আশঙ্কা অমূলক। নাটককার দর্শকমণ্ডলীকে পুতুলনাচ দেখান না—ছায়াবাজিও দেখান না; রক্ত-মাংসের দেহধারী নরনারী নিয়েই তাঁর কারবার। নাটকের পাত্র-পাত্রীরা অবশ্য ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন চিত্রপুত্তলিকার মত তটস্থ হয়ে থাকেন না; তাঁরা নড়েন চড়েন, কথা কন, হাসেন, কাঁদেন, এবং মাঝে মাঝে হাত-পা ছোঁড়েন। বলা বাহুল্য যে, এ সব ক্রিয়ার জন্মভূমি হচ্ছে মননামক দেশ।

গল্পের নায়ক-নায়িকারাও একেবারে নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বাক্ নন। সুতরাং গল্প-সাহিত্যের ভিতর থেকেও আমরা মানব-মন ও মানব-

চরিত্রের অসংখ্য বৈচিত্র্যের পরিচয় পাই। সংস্কৃত কথা-সাহিত্য এ ধর্ম্মে বঞ্চিত নয়।

আমাদের দেশের বহু নাটকের কথাবস্তু যে কথা-সাহিত্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সে সত্য তাঁর কাছেই সুবিদিত—যাঁর রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে পরিচয় আছে। আর পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি যে, সংস্কৃত ভাষার বড় বড় পদ্য-কাব্যের মূলও ঐ কথা-সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়।

সুতরাং নব্য গল্পলেখকদের ইংরাজী ছেড়ে সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের আঁচল ধরবার পরামর্শ দিয়ে আমি তাঁদের বিপথে নিয়ে যাবার কুপরামর্শ দিচ্ছি নে।

এ কাজ করায় আমাদের মৌলিকত্বাও নষ্ট হবে না। পরের জিনিষ আপন ক'রে নেবার ভিতর একটা মস্ত মৌলিকতা আছে। প্রকৃত গুণী ব্যতীত অপর কারও দ্বারা তা সুসাধ্য নয়। একটু আধটু বদ্‌লে জিনিষ যে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে যায়, তার প্রমাণ দেখতে চান ত অতি বড় সুন্দরী রমণীর নাসাবংশ এক ইঞ্চি বাড়িয়ে দেখুন, সে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে কি না?—সত্য কথা এই যে,

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।

বাঙ্গলার গল্পলেখকরা যদি আমার পরামর্শ প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করেন ত আস্‌ছে বছর পূজোর সময় তাঁরা দেশ গল্পে ছেয়ে দিতে পারবেন।

শ্রী প্রমথ চৌধুরী।

ভারতের শিল্পী।

—:*:—

আজ হতে ২২০০ বৎসর আগে পাটলিপুত্রে সম্রাট অশোকের রাজপুরীর তোরণদ্বারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দুন্দুভি বাজছে বিরামহীন। সম্রাটকবি প্রিয়দর্শী, ভগবান তথাগতের উদ্দেশে রাজ্যে এক অপরূপ স্তূপ নির্ম্মাণ করতে চাইলেন। তাই দিকে দিকে দূত ছুটলো, উজ্জয়িনীতে, বিদিশায়, তক্ষশিলায়, চম্পায়, স্থপতি আর শিল্পীকে আহ্বান করতে; তাই রাজধানীতে রাজপুরীর তোরণদ্বারে দুন্দুভি বাজতে লাগলো অবিরাম।

দিগ্বিদিক্ থেকে স্থপতি আর শিল্পীর দল পাটলিপুত্রে এসে মিলিত হল। বিদিশা থেকে এল তীক্ষ্ণধার টঙ্ক নিয়ে শিল্পী, যারা পাথর কেটে অশোকতরু আঁকে; উজ্জয়িনী থেকে এল স্থপতি, যারা বিশ্বকর্ম্মার বংশধর, যারা পলক ফেলতে অলকাপুরী তৈরি করে; চম্পা থেকে এল চিত্রকর, কন্দর্পের মত যাদের রূপ, কন্দর্পের কুসুমসায়কের মত কোমল যাদের তুলিকা। রাজপুরীর সিংহদ্বারে দুন্দুভি বেজে চল্ল দিনের পর দিন।

ভোরের আলো তমালবনের মাথায় পরশ দিয়েছে, এমন সময় প্রিয়দর্শী এলেন সেইখানে শিল্পীসঙ্ঘকে আদেশ দিতে। সঙ্গে এলেন সন্ন্যাসী উপগুপ্ত। সিংহদ্বারে দুন্দুভি দ্রুততালে বেজে উঠলো। তমালতলে শিল্পীর দল মাথা নুইয়ে প্রণাম করলো। তখন সেই

শিল্পীসঙ্ঘকে প্রিয়দর্শী ধীরে সম্বোধন করলেন—হে ভারতের শিল্পী! ভগবান তথাগতের পুণ্যময় স্মৃতি বুকে রাখবার উপযুক্ত এমন এক অপরূপ স্তূপ আজ রচনা করতে হবে, চিরকাল যা হয়ে রইবে বিশ্বের এক পরম বিস্ময়। ভগবানের আসন রচনা করবার জন্যে আমি তোমাদের আহ্বান করেছি, তোমরা সেই আসন রচনা কর,—শতদলের চেয়ে তা সুন্দর হোক। প্রিয়দর্শীকে ঘিরে হাজার শিল্পী জয়ধ্বনি করে উঠলো।

পাটলিপুত্রের শতযোজন দূরে বরদাবতী নামে এক জনপদ। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে সেখানে বনেবনান্তে নবকেশর ফুটে ওঠে, শরতে বন্ধুক ফুলে ভূমি অরুনাভ হয়ে যায়, বসন্তে অশোকতরু মূল পর্য্যন্ত ফুলে ফুলে রাঙ্গা হয়ে ওঠে। এমন যে বরদাবতী জনপদ, সেইখানে প্রিয়দর্শী স্তূপ নির্ম্মাণের আদেশ করলেন।

নবোদিত রবি যখন গগন-ললাটে স্বর্ণললাটিকার মত জ্বলছে, তখন সম্রাটের সেই শিল্পীসঙ্ঘ স্তূপনির্ম্মাণ সুরু করলো। পলাশের তলেতলে মঙ্গল-বাদ্য বাজতে লাগলো, নরনারীর আনন্দকোলাহলে দিক মুখরিত হয়ে উঠলো, ভিক্ষু সন্ন্যাসী মন্ত্রপাঠ করলো।

দিনের পর দিন যায়, বরদাবতী জনপদে কর্ম্ম-কোলাহলের বিরাম নেই। অগণিত শিল্পীর কুশলহস্ত অবিশ্রাম ইঁটের উপর ইঁট বসিয়ে, পাথর কেটে, পাথর খুদে চলেছে। যেখানে কেবল সবুজ তৃণ আর নবমালতীর ঝাড় ছিল, সেখানে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠলো এক নিটোল প্রস্তরস্তূপ। বৃত্তাকার সেই বিরাট স্তূপ তমালতরুর মাথা ছাড়িয়ে উর্দ্ধে উঠলো, বিশ্বজনের দৃষ্টি বিস্ময় মানলো। ফাল্গুন-পূর্ণিমার চাঁদ যেমন মেঘের বুক চিরে আধখানা উঠে থমকে থাকে, তেমনি এই

অর্দ্ধচন্দ্রাকার শিলাস্তূপ পৃথিবীর বুক চিরে প্রকাশ পেয়ে থমকে রইল।

তখন সেই স্তূপশিখরে নিপুণ শিল্পী নির্ম্মাণ করলো পরম সুন্দর হর্ম্মিকা। সম্রাটের শিরে রতনমুকুট যেমন শোভা পায়, স্তূপশিখরে শিলাময় হর্ম্মিকা তেমনি শোভা পেল। হর্ম্মিকার উপরে প্রতিষ্ঠিত হল মনোহর ছত্র।

মাস গেল, বৎসর গেল, স্তূপনির্ম্মাণ তবু সমাপন হল না। মুহূর্ত্তে যার সৃষ্টি, মুহূর্ত্তেই তার লয়; তাই ভারতের শিল্পী বছরের পর বছর ধরে এমন এক বস্তু সৃজন করতে চলেছে, যা যুগের পর যুগ অমর হয়ে রইবে। তারা পাথরকে উপাদানরূপে গ্রহণ করেছে,— কঠিনতায় যার জুড়ি নেই, যা ঝড়ঝঞ্ঝাকে তুচ্ছ করে অটুট হয়ে থাকে। তারা শুধু কালের সঙ্গে সংগ্রাম সুরু করেনি, তারা স্থানের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম ঘোষণা করেছে; তাই তাদের সৃষ্টি পর্ব্বতের মত বিরাট হয়ে স্থানকে পূর্ণ করতে চায়।

স্তূপমূল বেষ্টন করে গঠিত হল সুউচ্চ মেধী, আর সেই মেধী থেকে নেমে এল শিলাময় এক অপূর্ব্ব সোপান। দক্ষিণমুখী এই সোপান বেয়ে উঠে নরনারী মেধীর পরে চলে' স্তূপকে প্রদক্ষিণ করবে। উপাসিকা, ভিক্ষু, অর্হৎ আর বোধিসত্বের চরণধুলায় যে মেধীপথ ধন্য হবে, শিল্পীরা তাকে পরম যত্নে সমাপন করলো। কণ্ঠকে কনককণ্ঠী যেমন বেষ্টন করে রয়, তেমনি এই মেধী স্তূপকে বেস্টন করে রইল।

মেধীকে ঘিরে ভূমির পরে রচিত হল আর একখানি পরিক্রমণের পথ। এই পথকে বেষ্টন করে গড়ে উঠলো সুদৃঢ় প্রস্তর

বেদিকা। তখন সেই বেদিকার স্তম্ভে, পরিচক্রে, উষ্ণীষে, সূচীগাত্রে, একের পর এক করে ভারতের সেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীসঙ্ঘ ভগবান তথাগতের জন্মজন্মান্তরের কাহিনী ছবির অক্ষরে লিখতে লাগলো।

কোন স্তম্ভপরিচক্রে তারা উৎকীর্ণ করলো প্রস্ফুটিত পদ্ম, কোন পরিচক্রে পুষ্পগুচ্ছ, মঞ্জরিত তরু। দক্ষিণের বেদিকার এক স্তম্ভ পরিচক্রে শিল্পী উৎকীর্ণ করলো মায়াদেবীর স্বপ্নের ছবি। রাজ-প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে রত্নপালঙ্কে রাজমহিষী নিদ্রারতা। পরিচারিকার আঁখি তন্দ্রালস, চামর হাতে হেলে পড়েছে। রাত্রি গভীরতর হতে চলেছে। স্বর্গ হতে এক অপূর্ব্ব শ্বেতহস্তী লীলাভরে নেমে আসছে। জননীর অধরে হাসির রেখা। শয্যাপ্রান্তে প্রদীপ-শিখা কম্পনহীন।

পূর্ব্বদিকের বেদিকার এক স্তম্ভপরিচক্রে, প্রভাত আলো বেণুবনের ফাঁক দিয়ে এসে প্রথম যাকে রাঙ্গিয়ে তোলে, তাতে নিপুণ শিল্পী নিখুঁত করে আঁকলো জেতবনের ছবি। অশোক, পলাশ আর নীপ রাজার আদেশে কাটা গেছে—চন্দনতরু শুধু দাঁড়িয়ে আছে। অনাথপিণ্ডদের কোষাগার থেকে গোযানে করে অগণিত স্বর্ণমুদ্রা এসেছে। সেই অগণিত মুদ্রা অনাথপিণ্ডদের কোষাধ্যক্ষ আর অনুচর সারা বনভূমিতে একটি একটি করে সাজিয়ে চলেছে। স্বর্ণ-বাহী ক্লান্ত পশু দুটি বিশ্রামরত। অদূরে অনাথপিণ্ডদ ধ্যানমগ্ন।

যারা পূবের আকাশে আলোর শতদল ফোটার সঙ্গে সরোবরের নীল জলে শ্বেত শতদলের দল-মেলা দেখেছে, তারা বেদিকার স্তম্ভে, স্তম্ভপরিচক্রে, উষ্ণীষে, সূচীগাত্রে বাটালি দিয়ে খুদে সরোবর আঁকলো, যক্ষিণীর বাহুর মত লীলায়িত মৃণাল আঁকলো, আর

আঁকলো পূর্ণবিকশিত কমলপুঞ্জ। যারা আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নীপের মূলে দাঁড়িয়ে মেঘের গুরুগর্জ্জন শুনেছে, কেকারত শিখীর নৃত্যচপল ভঙ্গী দেখেছে, তারা স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ করলো নর্ত্তনশীল ময়ূর ও ময়ূরী।

এমনি করে সেই শিল্পীসঙ্ঘ বছরের পর বছর ধরে পাথরের পর বাটালী দিয়ে ছবি এঁকে চল্ল। নৃপতি চলেছেন ভগবানের পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করতে। চার ঘোড়ার রথে নৃপতি চলেছেন, নিজের হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে। মানুষ ছুটে চলেছে—কেউ চলেছে পায়, কেউ চলেছে অশ্বে। কোথায় কোন বিহারতলে কে এল দশদিক আলো করে, তাই ঐ মানুষের দল বিপুল আগ্রহে ছুটে চলেছে—ঘোড়ার মুখ ফিরেছে সেই দিকে, মানুষের মন ছুটেছে সেই দিকে, আর সেই দিকে যে বাতাস ছুটেছে তারই স্পর্শে ঘোড়সোয়ারের উত্তরীয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়ে পশু হতে মানুষ, মানুষ হতে দেবতা হতে পেরেছে যে, সে-ই আজ বিশ্বকে আকর্ষণ করেছে—তাই এই অবিরাম এগিয়ে চলা।

ব্রহ্মদত্ত যখন কাশীর নরপতি, তখন ভগবান তথাগতের যে ষড়দন্ত হস্তীরূপ হিমালয়ের পদপ্রান্তের দেবদারু আর চন্দনবন আলো করে ছিল—শিল্পীরা তা আঁকলো পরম যত্নে। নলিনীর বেড়া দিয়ে ঘেরা যে সরসী, তারই তীরে বিশালকায় বটবৃক্ষ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পর্ব্বতের মত বিশাল, রজতের মত শুভ্র, ঐরাবতের মত বলশালী যে গজরাজ, ছয় শ্বেতদন্ত যার ন্যগ্রোধশাখার আড়াল-দিয়ে-আসা রৌদ্রপ্রভায় চমক দিচ্ছিল—সে দৃপ্তভঙ্গিতে বটমূলে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ব্বজন্মে যে গজরাজের রাণী ছিল, ঈর্ষ্যার বিষে

আত্মবিস্মৃত হয়ে যে দেবতার কাছে বর চেয়ে জন্মান্তরে কাশীরাজের মহিষী হ'ল—সে পাঠালো সনুত্তর ব্যাধকে গজরাজের দন্তরাজি কেটে আনতে। বন অতিক্রম করে, পাহাড় পার হয়ে, ধনুর্ব্বাণ হাতে নিয়ে সনুত্তর হিমালয়ের পদমূলে এসে পৌঁচেছে। নিষ্ঠুর ব্যাধের ধনুক থেকে এক বিষাক্ত বাণ ছুটে এসে গজরাজকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করেছে। মরণ ঘনিয়ে এসেছে, হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে তবু তার দ্বিধা হয় নি। যাকে সে অনায়াসে পায়ের নীচে দলে ফেলতে পারে, মাথা নুইয়ে তাকেই গজরাজ ধীরে বলছে, "বন্ধু! এই যে সেই অমূল্য দন্ত, যার অভাবে কাশীর মহিষীর রজনী বয়ে যায় অনিদ্রায়—একে কেটে নিয়ে যাও।" হিমালয়ের পাদদেশে শাল, তমাল আর দেবদারু বিস্ময়স্তব্ধ।

বেদিকার সূচীগাত্রে ফুল ফুটে উঠলো,—তারা কেউ পদ্ম, কেউ চাঁপা, কেউ অশোক, কেউ নবমালতী; শিল্পীর কল্পকুঞ্জ হতে শুক, শারি, কোকিল, মরাল আর চক্রবাক ডানা মেলে উড়ে এসে সেই ফুলের রাজ্যে বাসা বাঁধলো। বেদিকার উষ্ণীষগাত্রে খোদিত হ'ল মৃগোদ্যানে প্রথম ধর্ম্মপ্রচারের চিহ্ন ধর্ম্মচক্র, সম্বোধীর চিহ্ন বোধিদ্রুম, জাতকের চিহ্ন ভদ্রঘট, মহাপরিনির্ব্বাণের চিহ্ন স্তূপ।

উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রস্তুত হ'ল চারিটি দ্বার, আর অপূর্ব্ব চারিটি তোরণ। চারি তোরণের পাশে প্রতিষ্ঠিত হ'ল চারি দিকপাল যক্ষ আর যক্ষিণী। উত্তর দুয়ারে করযোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কুবের, দক্ষিণ দুয়ারে রইলেন বিরুদ্ধক, পশ্চিম দুয়ারে বিরূপাক্ষ, আর পূর্ব্ব দুয়ারে ধৃতরাষ্ট্র।

পাটলিপুত্রে সম্রাট অশোকের রাজপুরীর তোরণদ্বারে সকাল

থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দুন্দুভি বেজে চল্ল বিরামহীন। সম্রাটের স্বপ্ন আজ গ্রহণ করলো রূপ, ভারতের শিল্পীর সমাপন হ'ল মহাযজ্ঞ। দিকে দিকে দুন্দুভিনিনাদ এই বার্ত্তা প্রচার করলো, দিকে দিকে নরনারী চঞ্চল হয়ে উঠলো।

বরদাবতীর পথে অগণিত পথিক চলেছে। শুঁড় দুলিয়ে হস্তী চলেছে, ঘাড় বাঁকিয়ে অশ্ব চলেছে, ধ্বজা উড়িয়ে রথ চলেছে।

বেণুবনের আড়াল দিয়ে সূর্য্য যখন সবেমাত্র উঠেছে, তখন বরদা-বতীর শালবনে অশোকের শ্বেত হস্তী এসে থামলো। শালনির্য্যাসের সুগন্ধে বাতাস সুরভিত হয়ে উঠলো। প্রভাতের আলো মহামাতঙ্গের গ্রীবাশৃঙ্খলে চমক দিয়ে উঠলো।

সম্রাট প্রিয়দর্শী সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে পার্শ্বে নিয়ে সেই অপরূপ স্তূপকে প্রদক্ষিণ করলেন, পশ্চাতে এল নরনারী, শিরে তাদের পুষ্প-সম্ভার। পথের ধুলি পুষ্পপরাগে ঢেকে গেল, বেণু বীণা মৃদঙ্গ বাজতে লাগলো, শঙ্খধ্বনিতে আকাশ মুখর হয়ে উঠলো।

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত।

সাধুমা'র কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরে বাড়ী পৌঁছিলাম। সব রীতিনীতি সারা হল। যৌতুকাদিও হয়ে গেল। আমার বড় জা তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে গহনাগুলি শিখ্‌লে দিলেন। আবার সোনার গহনা পরাতে লাগলেন। বাউটির স্যুট সকলরকম বাঁধা গহনা পরালেন, পায়ে পাঁইজোড় মল রইল, গলায় ঝিলদানা সাতনহর, নীচ-কানে ফুলঝুমকো, উপর-কানে পিপুলপাত, আর ফুলপাড় চেলীর সাড়ি। পরে তেতলায় ৺গোপালজীর মন্দির, সেখানে ও লক্ষ্মীদেবীর ঘরে প্রণাম হল। পরে চেলীখানা ছেড়ে একখানা লাল ঢাকাই কাপড় পরে আমার বড়দির ঘরে বসে মিষ্টান্ন খেতে লাগলুম। সেখানে আমাকে ঘিরে বসে গেলেন ঠাকুরঝি ও জা'রা—তা ছাড়া ঝিগুলো ত আছেই।

আমার শ্বশুরবাড়ীর আসল কথা অট্টালিকাখানার পরিচয় দেওয়া হয়নি। এটা দরকার, কারণ সেখানে আমার সারাজীবন বাস করতে হবে। যদিও আমি অশিক্ষিতা, তবে যতটুকু পারি। বাড়ীখানা অতি সুন্দর প্রণালীতে প্রস্তুত করানো হয়েছিল। সম্মুখে প্রকাণ্ড সবুজ রং-দেওয়া ফটক, তার দুপাশে দুটি গ্যাস্-লাইট্ আছে। সম্মুখে পাথরের সিঁড়ি; একপাশে দারোয়ানের ঘর, আর একপাশে কালীপূজার চণ্ডী-মণ্ডপ—পাঁচখিলানযুক্ত। পরে পশ্চিম চকে ফরাসখানা, দপ্তরখানা ও আরও তিনচারখানা ঘর। দক্ষিণ চকে আমার বড় শ্বশুরমশায়ের

ঘর ও কোণের দিকে কাঠের সিঁড়ি তেতলা পর্য্যন্ত গিয়েছে। আর পূর্ব্ব চকে তোষাখানা ও অন্দরে প্রবেশ করবার দরজা, পাল্কি থেকে আমাদের ওখানে নাম্‌তে হয়। উত্তরে কেবল চণ্ডীমণ্ডপের পাশে চালের গুদাম। মাঝে বড় উঠান। দোতলার দুইদিকে সাতখানা ঘর ও একটি বড় নাচ-ঘর। পশ্চিম দিক্‌টায় খাবার জন্য একটি বারান্দা আছে। এই বাড়ীর ভিতরের দিকেও জোড়া থাম, বাইরের দিকেও তদ্রূপ। তেতলায় চারখানা ঘর ও বারান্দা, চণ্ডীমণ্ডপের উপরে তিনটি ঘর। বাড়ীর ভিতরে মেয়েরা যেখানে থাকে, সেটাও দুই মহল। খড়খড়ি ঘর থেকে নেমেই কোণে উত্তর দিকে তিনখানা ঘর। আর পশ্চিমের দিকে দুইখানা ঘর—একখানা ভাঁড়ার আর একখানা লক্ষ্মীমাতার ঘর। দক্ষিণে বড় দু'টি ও মাঝারি দু'টি ঘর। আর কোণের দিকে স্নানঘর তিনখানা আছে। উত্তরে একটি বড় দালান; এখানে বিয়ের সময় বরণ, বাসিবিয়ে, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদি হত। এ ছাড়া এখানে বসে নিত্য গল্প-গুজবও হ'ত; গরমী-কালে সন্ধ্যাবেলায় সকলে মিলে মাদুর পেতে বসে গল্প করা, আবার শীতের দুপুরে রোদ পোয়ানোও হত। বড় পরিবারে দাসদাসীর বহরও খুব, আবার ঝগড়ার ধুমও খুব। যখন ঝগড়া বাধে, তখন আর সহজে মিট্‌তে চায় না। চারদিকেই ঘর; একদল বেরুচ্ছে, দুকথা বলে যাচ্ছে, আবার একদল এর পাল্‌টা জবাবও দিচ্ছে। পূবের দিকেও সিঁড়ি ছিল তেতলা পর্য্যন্ত। এখানে দুটি বড় ঘর ছিল। তার একটায় আমি থাকতুম, ও অন্যটায় আমার ঠাকুরঝি থাকতেন। আর উত্তর দালানে দুটি দরজা দিয়ে আর একটি মহলে যাওয়া যেত; সেখানে দুখানা ঘর, চারপাশে বারান্দা,

উঠান ও কোণে সিঁড়ি। আর ত্রিতলে সিঁড়ির উপরে ছোট একটি ঘর। সেখানে আমাদের ৺গোপালজীর ভাণ্ডার ছিল। ছাতের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গোপ্‌লার ভোগ-মন্দির ছিল, আর উত্তর-পশ্চিম কোণে পূজার দালান ও শয়নমন্দির ছিল। বাড়ীর পশ্চিম ও দক্ষিণ কোণে গোপালদেবের পূজার ফুলবাগান ও পুষ্করিণী। কোণের দিকে গোশালা আর বাগানের প্রবেশদ্বার, তার পাশেই বেশ বড় আস্তাবল। এর উপরে দ্বারোয়ান ও বেহারাদের থাকবার ঘর ছিল। গাড়ীবারান্দার পাশ দিয়ে তেতলা পর্য্যন্ত একটা সিঁড়ি উঠে গেছে। সেখানে আমার শ্বশুরের খুড়ামশায়, আমার ছোটদাদামশায় থাক্‌তেন। আমি সমস্ত বাড়ীটা দেখে খুব খুসী হয়েছিলাম।

যাহোক, সব কুটুম্বভোজনাদি শেষ হয়ে গেল। একে একে যে যার বাড়ী যেতে লাগলেন। তখনকার দিনে খাওয়া হলে ঝি'রা হাত ধোবার জল দিত, তারপর পান দিত। যাঁর তখন যাবার ইচ্ছে ঝি'রা গিয়ে পাল্কিবেহারাদের খবর দিত; আর যাঁর একটু বসবার ইচ্ছে, তিনি বলে দিচ্ছেন—যা, অমুককে ছেড়ে আয়, আমার যাবার দেরী আছে। তখনকার দিনে শামু দামু নামে দুই যমজ ভাই সর্দ্দার-বেহারা ছিল। তাদের হেপাজতে পাঁচখানা পাল্কি ছিল, তারাই ঠিকা বেহারা আনতো। যাঁর ক্রিয়াকর্ম্ম আছে, তিনি তাদের সঙ্গে ফুরণ করতেন প্রত্যহ দু'টাকা ক'রে এক একখানি সওয়ারি পাবে। এইরকম পাঁচখানা কি ছ'খানা যা' দরকার হ'ত, তার ব্যবস্থা করে নেওয়া হ'ত।

আমাদের বিয়ের আটদিন দুবেলা মাছভাত খেতে হয়, না খেলে দোষ। ঐ আটদিন কোন বিধবাকে ছোঁবেনা, আবার চুলে কালো

ফিতে পরা হবে না, লাল ফিতে পরতে হবে। এ ছাড়া আরও এক প্রথা আছে—মাথার চুলগুলি পাক দিয়ে বাঁধতে হবে, বিননি করা চলবে না।

আজ আমার ফুলশয্যার দিন। নরনারীমাত্রেই বিবাহ-প্রথা আছে। আর বিশেষতঃ আমাদের ব্রাহ্মণকুলে বিয়ের সময় বর-বধূকে রাজা-রাণীর পদে অভিষিক্ত করা হয়। এ সময়টি অতি মধুর। সে মধুর ভাব আজও প্রাণে জাগ্ছে। সেই নবপ্রণয়ের মধুর আমোদ মনে করলে আজও নতুন! হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে, নয়নে আনন্দ-অশ্রু ফুটে ওঠে। সে আজ ৩৩ বছর হ'ল, কিন্তু সবই মনে আছে, এক-দিনের কথাও ত ভুলিনি। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এল, সকলে দেখতে লাগলো। যদিও তখনকার কালে ফুলশয্যার তত্ত্ব দেবার প্রথা যেরূপ ছিল সেরূপ কিছুই নয়, তবুও সবাই বললে খুব দিয়েছে। শিল্পদ্রব্যাদি কিছু বিশেষ দেননি। দিয়েছিলেন ভারে ভারে খাবার, ফল, মসলা ইত্যাদি, তা' দেখে সবাই খুসী হলো। এ ছাড়া বড় বড় রুই, কাত্‌লা, কলসি কলসি তেল ইত্যাদিও এসেছিল। আমাদের প্রথা, ফুলশয্যার-রাত্রে যাহা মেয়ের বাপের বাড়ী থেকে আসে, সেই কাপড় ও গহনাগুলি পরা। পরে ফুলশয্যা হবার পূর্ব্বে ফুলের গহনা, লাল ঢাকাই কি শান্তিপুরে ও লালপেড়ে দেশী ধুতি বর-কনেকে পরতে হয়। পরে সধবাগণ, তাদের যে ঘরে শয্যা প্রস্তুত থাকে, সেখানে নিয়ে যায়। ঐ বিছানাও ফুল ও ফুলমালা দিয়ে সাজানো হয়। পরে বর ও কনেকে সেই বিছানায় শোয়ানো হয়। তারপর উলুধ্বনি ও মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি করতে করতে তাঁরা সকলে ফিরে আসেন। একটা কথা বলতে ভুল হয়েছে—যে যেমন

অবস্থাপন্নই হোক না কেন, সে রাত্রে আমোদ করবেই। আজকাল গানবাজনা হাসিঠাট্টা যেমন সে রাত্রের একটা অঙ্গ, আমাদের সময়ে সেটা ছিল না।

দু'দিন পর আমার পাক-স্পর্শ হবার দিন। সেদিন ধুমধামের সহিত বৌ-ভাত সমাপন হ'ল। পরদিন জোড়ে (আমি ও আমার স্বামী) গেলুম আমার পিত্রালয়ে, সেখানেও খুব ধূমধাম হলো। তার পরদিন আমার স্বামী বাড়ী গেলেন ; আমি চার দিন থাকলাম। পাঁচ দিনের দিন ৫টার ঠিক পরেই মধু খানসামা দেখা দিল ও বল্'লে— আমাদের ঘরের লক্ষ্মী ঘরে চল। ঘর দুয়ার সব কদিন ফাঁকা ছিল। এবার গিয়ে ঘর আলো করবে চল।—দিদিমা বললেন, "লক্ষ্মী ত এখন এ ঘর ছেড়ে চল্লেন। এখন লক্ষ্মী তোমাদের, তোমরা লক্ষ্মী নিয়ে যাও, জন্ম জন্ম ঐ ঘর আলো করুন।" আমাদের হিন্দু মহিলাদের কামনা যেন মেয়ের পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা হয়, আর এই পতিকে ভক্তিরূপ রজ্জুদ্বারা বেঁধে সে যেন দাম্পত্য প্রেমের সুখে পরম সুখী হয়, এমন কি স্বামীর সংসারের কর্ত্রী ও তার হৃদয়রাজ্যের রাণী হতে পারে। তাহলে মেয়েরও চিরজীবন সুখের হবে, আর তার আত্মীয়-স্বজনও সুখী হবে। আবার শ্বশুরবাড়ীরও মঙ্গলদায়ক হবে, কেননা ছেলের সঙ্গে বৌয়ের প্রণয় না থাকলে সংসার বিশৃঙ্খল হয়।

আমার শ্বশুরঘর খুব ভালই লেগেছিল। বেশ নতুন ভাব কিনা। আর আমাকে সবাই ভালবাসতো ও যত্ন করতো। আমার শ্বশুর কখনও বাড়ীর ভিতর আসতেন না। বাইরে একতলায় তাঁর ও আমার স্বামীর ঘর ছিল। দক্ষিণ দিকে পুকুর ও বাগানের ধারে আমার জ্যেঠশ্বশুরমশায়ের ঘরও ছিল। ওঁরা নীচের দক্ষিণ দিকেই

থাকতেন। আমি দোতলায় খড়খড়ি ঘরে বসে বাইরে দেখতুম বাবামশায় ঘুরে বেড়াতেন। বাইরের রোয়াক পাখীতে পূর্ণ ছিল। নানারকম রংবেরংয়ের খাঁচায় তারা থাকতো, শ্যামাপাখীর শিষ্ শুনতাম। আবার বউ-কথা-কও রব যখন উঠতো তখন আমার খুব ভাল লাগতো, আবার হাসিও পেত। এ ছাড়া পাপিয়া, দোয়েল, বুলবুল, টিয়ে ইত্যাদি হরেকরকমের পাখী ছিল। টিয়েটী অনেক কথা বলতো, সে গানবাজনায় বেশ সমঝদার ছিল। বাবামশায় যখন সেতার বাজাতেন, তখন আমাদের ওস্তাদ পাখীটিও ঘাড় ও মাথা নেড়ে নেড়ে ঝুঁটিটি ফুলিয়ে তাল রাখতো, আর আপনার ভাবে আপনি বিভোর হয়ে যেত। পাখীটি আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

আমার বড়দিদির ঘরেই আড্ডা ছিল, কারণ সেখান থেকে পুকুর ও বাগান দেখা যেত। আমার ঠাকুরঝি আমাকে ঠিক মায়ের মত যত্ন করতেন। কিন্তু তিনি বড় অভিমানিনী ছিলেন। কোনরকমে একটু কিছু হলেই তাঁর ক্রোধের উদ্রেক হতো।

এইরকমে আমার ১৪ বছর পর্য্যন্ত কেটে গেল। চৈত্র মাসে আমার বাপের বাড়ীর ঝি বিলাসী তারকেশ্বর দর্শন করতে যাবে, রাস্তায় আমাকে দেখতে এসেছিল। ঠাকুরঝি তাকে পাঁচসিকার পয়সা দিলেন, আর চুপি চুপি কি বলে দিলেন। বিলাসী ফিরে এসে বাবা তারকনাথের চরণামৃত ও দুটি আম দিলে, আর বল্‌লে আম দুটি যেন সব সমেত খাওয়ানো হয়। তার পরদিন ভোরে ঠাকুরঝি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আম দুটি খাওয়ালেন। কাঁচা আমটি অতি ছোট ছিল; বহুকষ্টে আগে সেটা গেলা হ'ল। তারপর পাকা আমটি হাতে করে ভয় হ'ল কেমন করে এটা গিল্‌বো। তখন আমি

কাতরপ্রাণে ডেকেছিলাম—বাবা তারকনাথ, তুমি আমার সহায় হও, নাহলে এত বড় আমটি গেলা আমার সাধ্য নেই। আমি তাঁকে স্মরণ করে সাহসে ভর করে মুখে দিলাম। তখন ঠাকুরঝি ভয়ে কাতর হয়ে বাবা তারকনাথকে,ডাক্‌তে লাগলেন—বাবা! ভালোয় ভালোয় গলায় নাবিয়ে দাও; বাবা! কোন বিপদ যেন না হয়। সে আমটির গায়ে পাকা কলা চট্‌কে মাখানো হয়েছিল। একরকম গলা চিরে নাবালুম। পরে বুক ব্যথা করতে লাগলো। ঠাকুরঝি বুকে হাত বুলাতে লাগলেন, বহুকষ্টে নেবে গেল। দু'তিন দিন বুকে ও গলায় ব্যথা ছিল। এ কথা আমরা ছাড়া আর বাড়ীর কেউ জান্‌তে পারলে না।

বাবা তারকনাথের অসীম দয়া। আমরা গর্ব্বশূন্য হয়ে ভাবে ও ভক্তিতে যা ভিক্ষা চাই, তাই পেতে পারি। কিন্তু আমাদের সে ভাব কৈ? আমরা সর্ব্বদাই অহং ভাবে থাকি। তবে ডাক্‌তে হয় তাই ডাকি, তাঁরও অতুল অসীম দয়ার ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায়। যাহোক, আমার কাতর ক্রন্দন বাবার কর্ণগোচর হ'ল। কৃপাপূর্ব্বক করুণাময় আমাকে একটী কন্যা দিলেন। বৈশাখ মাসে সবাই জানলে যে আমার মেয়ে হবে। এ কথা মা শোনবামাত্রই নিত্য নতুন জিনিষ আসতে লাগলো। আমার সাত মাসে পঞ্চামৃত হলো, তা'তে খুব ধুমধাম হ'ল। তখন থেকে ঠাকুরঝি আমাকে আরও বেশী স্নেহ করতেন।

পরে আমার দশ মাসে অর্থাৎ মাঘ মাসের ১৯ তারিখে ভোর ৬টায় এক বেশ সুন্দরী কন্যা হয়। আমার ঠাকুরঝি খুব আনন্দিত হন। আমার মা বলেন, যা হয়েছে বেশ হয়েছে। আর বাড়ীর

ঝি চাকর সবাই আশা করেছিল ছেলে হবে, কর্ত্তামশায়দের খবর দিয়ে কিছু আদায় করবে, তা'রা এতে বেশ একটু দমে গেল। আমার স্বামীর মনে কি হ'ল তিনিই জানেন। তিনি একদিনও দেখতে আসেন নি। এতে আমার মনে একটু দুঃখ ও অভিমান হয়েছিল। আমি গোপনে একটু কেঁদেওছিলাম। পরে আবার ভেবেচিন্তে নিজেই চুপ করে গেলাম। আট দিনের দিন আমার পিতামহী এসে যৌতুক ও আটকৌড়ে করেন। আমি ১১ দিনের দিন বেলা ১০টায় সুতিকা-ঘর থেকে বেরিয়ে স্নানাদি সেরে আমাদের উত্তর দিকে যে বড় দালানটি আছে, সেখানে উঠি। সেখানে সবাই খুকিকে খুব আদর করতে লাগলেন। সেদিন রবিবার, স্কুল ছিল না। তিনি খাবার পর বেলা ১টায় এলেন। আস্‌তেই দিদিমা খুকিকে কোলে দেবার জন্য ওঠেন। শেষে দেখি দিদিমাও যত দেবার জন্য ঘোরেন, উনিও তত ঘোরেন; এই চক্‌টা দুবার প্রদক্ষিণ হল। তারপর ঠাকুরঝি ধমক দিয়ে বললেন—ওকি, কোলে নাওনা? দিদিমা যে হয়রাণ হয়ে গেলেন। তখন লজ্জায় লাল হ'য়ে তিনি খুকিকে কোলে নিলেন। সে মূর্ত্তি আজও আমার মনে গাঁথা। সুখের স্মৃতিই মনুষ্য জীবনের আনন্দ ও বল। মেয়েটি খুব সুশ্রী হয়েছে বলে আমার স্বামী খুব খুসী হন। সেদিন হ'তে রোজ সন্ধ্যাকালে খুকিকে কোলে করে ঘুম পাড়াতেন। মেয়েটির এক অভ্যাস হয়ে গেল, সে ওঁর কোল ছাড়া আর ঘুমোতে চাইত না; নাহলে ঘুমোবার সময় বায়না করতো।

পরে আমার বড়দিদির হঠাৎ খুব অসুখ হয়ে পড়ে। অবস্থা তাঁর খুব খারাপই হয়েছিল। আমাকে তিনি খুব ভালবাসতেন। খুকিকে

দেখে বলেন—আহা, আমার লালুর চমৎকার চাঁদের মত খুকি হয়েছে। আমার শক্তি নেই, বোধহয় আর বেশীদিন বাঁচবো না; নইলে আমি ওকে মানুষ করতুম। হঠাৎ একদিন রাতদুপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। আমরা তাঁকে অতি যত্নের সহিত আন্তরিক ভক্তিপূর্ব্বক যথাসাধ্য সেবা করেছিলাম। তিনিও খুব আমাদের আশীর্ব্বাদ করে যান। আর যাকে যা দেবার ইচ্ছে আমার স্বামীকে দিয়ে লিখিয়ে যান। তারপর তাঁর স্বামীর হাতে হাত রেখে জীবনের সুখদুঃখের কত কথাই বলেন। নারীকুলে জন্মগ্রহণ করে যেন এইরকম মৃত্যুই হয়। সে মৃত্যু দেখলে আনন্দাশ্রু আসে। তিনি স্বামীকে বলেন—দেখ আজ আমার শেষ দিন, আর আমার বিলম্ব নেই। আমার যাকে যা দেবার ইচ্ছে লিখে গেলাম। আর আমার দাদাশ্বশুরমশায়দের, শ্বশুরমশায় ও কাকামশায়কে আমার প্রণাম জানাবে। ৺গোপাল-জীকে একবার আমার সম্মুখে আন, আমি একবার তাঁকে দেখবো। আর আমার শেষ অনুরোধটুকু রেখো যেন, তুমি আবার বিয়ে ক'র। তা নাহলে তোমার কায়িক বড় ক্লেশ হবে।—আমি তাঁকে শেষ প্রণাম করলাম ও শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কাছেই ছিলাম। তাঁকে ধরে নাবানো পর্য্যন্ত দেখলাম, ও সেই সুখময় ছবিটুকু হৃদয়পটে এঁকে নিলাম আর মনে মনে ভাবলাম—আমার যেন দিদির মতই সুখ-মৃত্যু হয়। হা পরমেশ্বর! আমি পাতকী, আমার কি আস্পর্দ্ধা। দিদি স্বর্গের দেবী, তাঁর সুখ-মৃত্যু দেখে সে সাধ নিজের অন্তরে স্থান দেওয়া কি মূর্খতা নয়?

(ক্রমশঃ)

মনের পথে।

—— ⁂ ——

জর্ম্মানীর জমিতে যে নিত্যনতুন দর্শন জন্মায়, তা আমরা সকলেই জানি। সম্প্রতি সে দেশে ফ্রয়েড নামক জনৈক ডাক্তার এক নূতন দর্শনের আবিষ্কার ও প্রচার করেছেন, এবং তাঁর প্রভাব জীবনের সকল ক্ষেত্রে, এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে; এ কথা বহুকাল থেকে শুনে আসছি। এ দর্শনের পরিচয় লাভ করবার লোভ আমার বরাবরই ছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তা করবার কোনও সুযোগ ঘটেনি।

জর্ম্মান ভাষা আমাদের দেশে বেশির ভাগ লোক জানে না, আমিও জানিনে। আর এ বয়েসে ও ভাষা আয়ত্ত করা যে আমার শক্তিতে কুলোয় না, তা বলাই বাহুল্য। ফ্রয়েডের গ্রন্থের অবশ্য ইংরাজী অনুবাদ আছে। কিন্তু সে ত বই নয়, একটা লাইব্রেরি বিশেষ। তার এক এক ভল্যুম ওজনে প্রায় Webster-এর Dictionary-র তুল্য। এ হেন দশ ভল্যুম বই ঘেঁটে যদি ফ্রয়েড দর্শনের মর্ম্ম উদ্ধার করতে হয়, তাহলে আমাদের মত দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকের ভাগ্যে, এ জন্মে আর উক্ত দর্শনের দর্শনলাভ করা অসাধ্য ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলুম।

সম্প্রতি "মনের পথে" নামক একখানি পুস্তিকা ফ্রয়েড দর্শনের সংক্ষিপ্ত সার আমাদের চোখের ও মনের সম্মুখে ধরে দিয়েছে।

বইখানি প্রথমত বাঙলা ভাষায় লেখা, দ্বিতীয়ত খুব ছোট্ট। এই পুস্তকের প্রসাদে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এক ঘণ্টার ভিতর ও দর্শনের পারদর্শী হতে পারবেন।

এ গ্রন্থের লেখক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ, ; পরিচায়ক, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন পি, এইচ, ডি ; ও প্রকাশক পাবনার সৎসঙ্ঘ। বিশ্ব-বিদ্যালয় ও আশ্রম এক সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে দর্শন মন্থন করে তার ননী তুলে দিয়েছেন, তা যে অমৃত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

(২)

ফ্রয়েড-দর্শনের ইউরোপে নাম হয়েছে New Psychology (নূতন মনস্তত্ত্ব)। সে দেশে এ জিনিষ নতুন হতে পারে, কিন্তু এ দেশে পুরোনো। গ্রন্থলেখক ফ্রয়েড-দর্শনকে সম্বোধন করে বলেছেন,—আমরা নির্লজ্জস্পর্দ্ধায় ঘোষণা করিব—

"আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনি"!

এর কারণ তিনি ধরে ফেলেছেন যে, "ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতারই বিশিষ্ট ধারা আজ প্রতীচ্যে ফ্রয়েডপ্রমুখ মনীষীগণের মধ্য দিয়া উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে"। ভারতবর্ষ ও জর্ম্মানীর দেহ পৃথক হলেও আত্মা যে এক, এ কথা ত গত যুদ্ধের সময় সকলেই সমঝেছিলেন। সুতরাং গ্রন্থলেখকের উক্তি আমরা নির্ভয়ে গ্রাহ্য করতে পারি। তবে তাঁর দু' একটি কথায় পাঠকের খট্‌কা লাগতে পারে। ফ্রয়েড-দর্শনকে "বিদেশিনী" বলবার সার্থকতা কি? "মনের পথে" একটু অগ্রসর

হলেই বুঝতে পারবেন যে, ও দর্শন স্ত্রীলিঙ্গ, বাদবাকী ইউরোপীয় দর্শনের মত ক্লীবলিঙ্গ নয়। আর লেখক যে বলেছেন যে তিনি "নির্লজ্জস্পর্দ্ধায় ঘোষণা করবেন", তার কারণ লজ্জার তোয়াক্কা রাখলে এ দর্শন তারস্বরে ঘোষণা করা যায় না। তা যে যায় না তার প্রমাণ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন পাঠকদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে,—"ফ্রয়েডের মতবাদ অনেকের নিকট অশ্লীলতাপূর্ণ মনে হইবে, কিন্তু ঐ একই কারণে অনেকের কাছে আবার তা প্রীতিকর মনে হইবে"। এ কথা ঠিক, কিন্তু না বললেও চলত। বিজ্ঞানের কাছে শ্লীল অশ্লীল বলে কোন জিনিষ নেই; ও শাস্ত্র সুশীল দুঃশীল নিয়ে মাথা বকায় না, সত্যমিথ্যা নিয়েই ওর কারবার। নরেন্দ্রবাবু যে বলেছেন—"সত্য যে ভাবেই আসুক, তাহা যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাহাকে মানিয়া লইতেই হইবে"; এই কথাই কাজের কথা। সুরুচি কুরুচি মিথ্যার গুণাগুণ। এ কথা যিনি মানেন না তাঁরও "মনের পথে" ঢুকতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়, কেননা নরেন্দ্র বাবু ভরসা দিয়েছেন—"গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে সুপাঠ্য ও সুরুচি-সঙ্গত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন"। সে চেষ্টায় তিনি কৃতকার্য্য হয়েছেন কি না, তা পাঠকের বিবেচ্য, লেখকের নয়। লেখক মাত্রেরই কথা হচ্ছে—"যত্নেকৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"।

(৩)

ফ্রয়েড-দর্শনের মহাগুণ এই যে, এ বস্তু সেকেলে জর্ম্মান দর্শনের মত দুর্ব্বোধ্য নয়। কাণ্ট্ কিম্বা হেগেল্ দর্শনের এমন নির্য্যাস কেউ বার করতে পারেন, যা এক নিমেষে গিলে ফেলা যায়? আমার

বিশ্বাস তা করবার সাধ্য কোনও দার্শনিক কমপাউণ্ডারের নেই। অপরপক্ষে ফ্রয়েড-দর্শন সহজ দর্শন ও একরকম সহজিয়া দর্শন, এবং এত জলবত্তরলং যে ও-বস্তু যে-কেউ অবলীলাক্রমে গলাধঃকরণ করতে পারবেন। এবং সকলেরই তা করা কর্ত্তব্য, কারণ ও-বস্তু হচ্ছে একরকম মহৌষধ; আর তা ও যে-সে মহৌষধ নয়, হকিমী ভাষায় যাকে বলে তাগদ্‌কা দাওয়াই তাই,—অর্থাৎ যেমন মুখরোচক তেমনি বলকারক।

(৪)

এখন সংক্ষেপে তার পরিচয় দিই। "মনের পথে" দু-পা না এগোতেই পাঠক একেবারে মনের ঘরে গিয়ে ঢুকে যাবেন। এ ঘর কি রকম জানেন? ইংরাজিতে যাকে বলে haunted house—তাই। গ্রন্থলেখকের ভাষায় "আমাদের মন একটি চারতলা ভূতের বাড়ীর মত। তাহাতে কত অশরীরী ভাব ভূতেরই মত সূক্ষ্মদেহে পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া বসবাস করিতেছে"। এই চারতলা বাড়ীতে কে কোথায় বাস করে, তার সন্ধান এখন নেওয়া যাক। সব উপরের তলায় থাকে চেতন ভাব (conscious); তেতলায় থাকে উপ-চেতন (sub-conscious); দোতলায় প্রাক্‌-চেতন (pre-conscious); আর সব-নীচের তলায় অচেতন (un-conscious)। যাঁর বোধোদয় হয়েছে, অর্থাৎ যিনি বোধোদয় পড়েছেন, তিনিই চেতন-অচেতনের প্রভেদ জানেন। এখন এই উপ-চেতন ও প্রাক্‌-চেতনের ভিতর পার্থক্য কি? উপ-চেতন হচ্ছে সেই অচেতন, যা চেতন হবে; আর প্রাক্‌-চেতন হচ্ছে সেই চেতন, যা অচেতন হয়েছে। অর্থাৎ উপ-চেতন হচ্ছে আগত চেতন, আর প্রাক্‌-চেতন গত চেতন। ভাষান্তরে

একটি হচ্ছে ভাবী-চেতন, অপরটি ভূত-চেতন। সংক্ষেপে চেতন হচ্ছে ব্যক্ত, আর তার পূর্ব্বে অ, উপ, প্রাক্ প্রভৃতি উপসর্গ জুড়ে দিলেই তা অব্যক্ত হয়ে পড়ে। আর চৈতন্যের ধর্ম্মই হচ্ছে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হওয়া, আর ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত হওয়া। ফলে একদল মনের ভাব যখন মনের ঘরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে, আর একদল তখন উপর থেকে নীচে নাম্‌ছে। যারা চারতলায় গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, তাদেরও কোনও উৎপাত নেই; আর যাদের একতলায় গোর হয়েছে, তাদেরও কোন উৎপাত নেই—যত গণ্ডগোল, যত হুটোপাটি ঐ সিঁড়িতে। ঐ সিঁড়ির ভাবগুলোই সব ভূত, আর আর ঐ ভূতগুলোই মানুষকে তুর্কি-নাচন নাচায়; কিন্তু মানুষ ভাবে সে চেতন ভাবের হুকুমে কাজ করছে। এই সত্যকে ফ্রয়েড অন্ধকার থেকে আলোকে এনেছেন।

(৫)

উপচেতন ও প্রাক্‌চেতন কি করে ভূত হয়, এবং ভূত হয়েই বা কি করে মানুষের স্কন্ধে ভর করে, সে ব্যাপার তিনি আমাদের জল বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রাক্‌চেতন-ভাবগুলি অবরোহণের সময় দল বাঁধে; এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রাক্-চেতনের নাম গ্রন্থী,—ইংরাজিতে যার নাম complex। এই জটিল প্রাক্ চেতন আবার চারতলায় উঠতে চায়। কিন্তু সে ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে দেখে, দুয়োর আগ্‌লে একটি "প্রহরী" দাঁড়িয়ে আছে—সে সেই জটিল প্রাক্-চেতনকে ঘরে ঢুকতে দেয় না। কারণ এই জটিল নেহাৎ কুটিল; সে সভ্যভব্য চেতন ভাবের সঙ্গে এক ফরাসে বসবার উপযুক্ত নয়। অমনি গ্রন্থীর সঙ্গে প্রহরীর দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। এ যুদ্ধে জেতে প্রহরী। সে গ্রন্থীকে

গলাধাক্কা দিয়ে নীচে পাঠিয়ে দেয়। কেননা প্রহরীর নীতি হচ্ছে দমন-নীতি (repression); সুতরাং সে উক্ত নীতি অনুসারে গ্রন্থিগুলিকে দোতলায়, তেতলায় intern করে। প্রহরীর এই চাপের চোটে তারা সব রেগে ভূত হয়ে যায়, আর ভূত হবামাত্র তাদের সূক্ষ্ম শরীর নানা ছদ্মবেশে মনের খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। আমরা যাকে স্বপ্ন বলি, তা এই ভৌতিক প্রাক্-চেতনের ছদ্মবেশী রূপ। আর মানুষে যাকে মানসিক বিকার বলে—সে বিকারও ঘটায় এই দুর্দ্দান্ত ভূত। আমাদের ধারণা কোনও প্রবৃত্তিকে দান্ত করতে পারলেই তা শান্ত হয়। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে, ব্যাপার ঠিক উল্টো। দান্ত মনোভাবই সব চেয়ে অশান্ত মনোভাব; আর মানুষের যত অশান্তির মূলে আছে প্রহরীর ঐ দমন-নীতি। অশ্বত্থামা রাতদুপুরে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখেন যে, প্রবেশদ্বার আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং শিব। শিব অশ্বত্থামার প্রবৃত্তি নিরোধ করবামাত্র কি-সব বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল, তা ত সবাই জানেন। মনের পথেও শিব কর্ত্তৃক গ্রন্থী নিরোধের ফলে মনোরাজ্যে যত বিভীষিকার সৃষ্টি হয়।

এতক্ষণ শুধু প্রাক্-চেতনের নাম করেছি। পাঠক জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, উপচেতন কি তবে উপে যায়?—মোটেই না। "মনের পথে" উপচেতন উহ্য রয়ে গিয়েছে বলে আমি তার ক্রিয়া কলাপের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করতে পারি নি। কিন্তু তার ধর্ম্মকর্ম্ম যে কি, তা অনুমান করতে পারি। আর এ ক্ষেত্রে অনুমানই প্রমাণ, কারণ অন্ধকারে কোন জিনিষই দেখা যায় না, সবই আন্দাজে ধরতে হয়।

(৬)

উপচেতন হচ্ছে হবু-চেতন। সুতরাং চেতন ভাবের ফুল উপ-চেতনের কুঁড়ি থেকেই ফুটে ওঠে; আর সেই ফুল ঝরে গেলেই তার ঝরা-পাপড়ি হয় প্রাক্-চেতন। সুতরাং প্রাক্-চেতন উপ-চেতনের বংশধর ও স্বগোত্র। প্রাক্-চেতন যখন মনের সিঁড়ি দিয়ে নামছে, উপ-চেতন তখন উঠছে; পথিমধ্যে তাদের মিলন হয়, আর তখন উপচেতন প্রাক্-চেতনের কোমর জড়িয়ে ধরে' আবার তাকে উপরে টেনে তোলে, ঐ চারতলার ঘরে ঢোকবার জন্য। অমনি চারতলার প্রহরী এসে পথরোধ করে।

এ প্রহরীটি কে?—এ প্রহরীর দার্শনিক নাম হচ্ছে ব্যক্তি। এখন ব্যক্তি বলতে আমরা কি বুঝব? "মনের কথার" লেখক বলেছেন—"এখানে ব্যক্তিত্ব বলিতে গ্রন্থীটি ছাড়া আমরা বাকী সবটাকেই বুঝিব"। মনের বাকী সবটা গ্রন্থী নামক তার অব্যক্ত অংশের উপর সদাসর্বদা খড়্গহস্ত হয় কেন?—এই প্রশ্নের উত্তরই হচ্ছে ফ্রয়েড-দর্শনের সারমর্ম্ম।

ফ্রয়েডের মতে জীবনের মূলে আছে একটি আদিম প্রবৃত্তি—যার নাম Libido। আর গ্রন্থলেখক বলেন—"আমাদের যত কিছু গ্রন্থী এই Libido-রই রূপান্তর।" Libido শব্দটির বাঙলায় এমন কোন প্রতিবাক্য খুঁজে বার করা কঠিন, যা সাহিত্যে অবাধে প্রচলিত করা যায়। আর তা ছাড়া কোনও ভাষাতেই ওর প্রতিবাক্য নেই, কারণ ও শব্দটি অমরকোষ, কিম্বা বিশ্বকোষ কোন কোষেই নেই; ছিল আগে ফ্রয়েডের মস্তক-কোষে, এখন আছে শুধু তাঁর পুস্তক কোষে। তাই আমি অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি কথার সাহায্যে ওকে চিনিয়ে দিতে

চেষ্টা করব। Libido হচ্ছে মধুর রস। ফ্রয়েড বলেছেন যে Libido হচ্ছে মানবের আদিম প্রকৃতি। মধুর রস যে আদিরস, এ সত্য আলঙ্কারিকরা বহুকাল পূর্ব্বে আবিষ্কার করেছেন।

(৭')

বোধোদয়ে পড়েছি যে, পদার্থ পৃথিবীতে মাত্র তিন প্রকার আছে,—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ। সুতরাং প্রাক্-চেতন ও উপচেতন যখন চেতনও নয়, অচেতনও নয়, এবং দুয়ের মাঝামাঝি একটা অনাসৃষ্টি; তখন তা নিশ্চয়ই উদ্ভিদ। আর সকলেই জানেন যে রস হচ্ছে উদ্ভিদের প্রাণ, ফ্রয়েডের ভাষায় জীবনের মূল উৎস। আর রস যেমন বৃক্ষলতার গা বেয়ে উপরে ওঠে, Libido-ও তেমনি মানুষের মনের গা বেয়ে উপরে ওঠে।

তার পর আমরা সবাই জানি যে, রসকে তাড়না করলেই তা তাড়ি হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তার মাধুর্য্য তেজে পরিণত হয়। তখন তার মুখ দিয়ে ওঠে ফেনা। তাড়ি হচ্ছে রসের তেজস্বী বিকার, তার থেকেই আসে তার মাদকতা। গাছের আপাদমস্তক রস যদি তাড়ি হয়ে যায়, তাহলে গাছের যে অবস্থা হয়—নিরুদ্ধ অতএব বিকৃত Libido মানুষেরও সেই অবস্থা ঘটায়।

যত প্রকার মানসিক বিকার আছে, সবই উক্ত প্রহরীকর্ত্তৃক Libido দমনের কুফল।

মানুষে যে স্বপ্ন দেখে, সেও ঐ বিকৃত Libido-র মূর্ত্তি। তবে প্রহরীর ভয়ে Libido ছদ্মবেশে দেখা দেয় বলে অবৈজ্ঞানিক লোকে সে স্বপ্নকে Libido বলে চিনতে পারে না। তরল মধুর রস যখন

স্থূল হতে পারে না, তখন তা বাষ্পের আকার ধারণ করে। তাই Libido দমনের ফলে যে রোগ জন্মায় তাকে আমাদের শাস্ত্রে বায়ুরোগ বলে, ভাষায় যার নাম বাতিক। এই দুর্দ্দান্ত Libido মানুষের কতরকম বাতিকের সৃষ্টি করে, "মনের পথ" থেকে সংগৃহীত তার কতকগুলি উদাহরণ দিচ্ছি। ফ্রয়েড না বলে দিলে কেউই বুঝতে পারতেন না যে, বক্ষ্যমান রোগগুলি সবই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের বর্ণচোরা বিকাশ। উদাহরণ:—

(ক)

"রাজনীতিক্ষেত্রে কখন কখন নেতৃগণ এইরূপ গ্রন্থীর বশে ঘোরতর কর্ম্মবীর হইয়া উঠেন, দেশের কত কাজ ভীষণ উৎসাহে আরম্ভ করিয়া জন-সাধারণকে চমৎকৃত করিয়া দেন। কিন্তু প্রায়ই আত্ম-প্রতিষ্ঠা, প্রতিশোধ বা ঐরূপ কোন গ্রন্থী তাঁহাদের ঐ ইচ্ছার মূলে কাজ করে। তাঁহারা গ্রন্থীর ফাঁদে এতই ঘুরপাক খাইয়া থাকেন যে, তাঁহাদের কিছুতেই বুঝিবার আর সাধ্য থাকে না যে তাঁহাদের কর্ম্ম ঐরকম কোন গ্রন্থীর সাময়িক বিকৃত উচ্ছ্বাস মাত্র।

(খ)

কেহ কেহ নিরুদ্ধ গ্রন্থীর উপদ্রবে লোকসমাজ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনতার আশ্রয় লন, হয়ত অরণ্যবাসী হইয়া উঠেন, কিংবা নিরুদ্ধ প্রবৃত্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে গিয়া কৃচ্ছ্রসাধন অবলম্বন করিয়া থাকেন। জগতে সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেরই অতীত জীবন খোঁজ করিলে বহু অপ্রীতিকর গ্রন্থীর নিরোধের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হইবে।"

আমরা জন-সাধারণ যে সব লোক্‌কে দেখে চমৎকৃত হই, যাঁদের মহাপুরুষ বলে মান্য করি, যাঁদের শত মুখে গুণগান করি, যাঁদের আদর্শ অনুসরণ করতে ছেলেদের প্ররোচিত করি, তাঁদের কর্ম্ম যে "কোন গ্রন্থীর সাময়িক বিকৃত উচ্ছ্বাস মাত্র" এবং "তাঁদের অনেকেরই অতীত জীবন খোঁজ করিলে" যে "বহু অপ্রীতিকর গ্রন্থীর নিরোধের ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইবে", এ তথ্য কি নূতন নয়? ফ্রয়েড-দর্শনের বিশেষ আবিষ্কারই হচ্ছে এই সব লোক-ঠকানো বহুরূপী ছদ্মবেশী প্রবৃত্তিগুলোকে স্বরূপে ধরিয়ে দেওয়া। ফ্রয়েডের এ মত জন-সাধারণ সহজে মানতে স্বীকৃত হবে না, কেননা জন-সাধারণের অবৈজ্ঞানিক চোখ অনুবীক্ষণ নয়, আর জন-সাধারণের বুদ্ধি ডাক্তারের হাতের ছুরির মত ধারালো নয়। "মনের পথে"র প্রদর্শক বলেছেন যে "হিষ্টিরিয়া, শুচিবাই, স্বপ্নভ্রমণ সমস্তই মনের ব্যাধি"। হিষ্টিরিয়া যে একটা রোগ, সে বিষয়ে অবশ্য দ্বিমত নেই। স্বপ্নভ্রমণকে মানুষে সুস্বপ্ন বলে না, ওরকম স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন বলেই পরিচিত। তবে শুচিবাই সম্বন্ধে লোকের মতভেদ আছে। ওর নামেই প্রকাশ যে, ও জিনিষ একটা বাতিক আর বাতিক মাত্রেই বায়ুরোগের অন্তর্ভূত। তৎসত্ত্বেও বহু লোকে শুচিবাইকে পবিত্র-প্রাণতার লক্ষণ মনে করেন, এবং যার কাছে যত জিনিষ অস্পৃশ্য, সে তত সাত্ত্বিক বলে পরিচিত। আমাদের সাহিত্য থেকেই. একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। সকলেই জানেন যে, সাহিত্যেও শুচিবাই আছে, এবং অনেক সমালোচক অল্পবিস্তর এ বাতিকগ্রস্ত। এ দলের ভিতর ভয়ঙ্কর শুচিবাইগ্রস্ত হচ্ছেন বঙ্গ-সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষক। কিন্তু গত পূজোর সময় এঁরই লেখা একটি গল্প পড়ে দেশসুদ্ধ লোক

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ভেবে পাননি যে, বঙ্গসাহিত্যে সুরুচির ধ্বজাধারী কি করে এত কুরুচি-সম্পন্নচিত্র লোক-সমাজের চোখের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করলেন। এখন ফ্রয়েড-দর্শনের আলোকে এ ব্যাপার এক মুহূর্ত্তে পরিষ্কার হয়ে যায়। মনের যে গ্রন্থীর নিরোধের ফলে তিনি সুরুচির পালক ও কুরুচির শাসক হয়ে উঠেছেন, সেই নিরুদ্ধ গ্রন্থীই তাঁকে স্বপ্নে ঐ অদ্রষ্টব্য দৃশ্য দেখিয়েছে। আমরা যাকে কাব্য বলি তা'ও আমাদের স্বপ্নের প্রতিলিপি মাত্র। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক মহাশয় তাঁর কল্পনার মূল উৎসের বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই তিনি তাঁর গল্পের আসল ঘটনা hypnotism-এর ফল বলে নিজেও বুঝেছেন, পরকেও বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ও শাস্ত্রের সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনিই জানেন hypnotism-এর প্রসাদে গেরস্তর মেয়েকে কালী বানানো যায় না। এ বিদ্যার আদিগুরু Charcot-র শিষ্যরা বার বার পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, কুলকামিনীদের hypnotise করে নাচানো যায়, কাঁদানো হাসানো যায়, কিন্তু তাদের ও অবস্থায় বিবস্ত্র হতে বল্লে চোখের পলক না পড়্‌তে তাদের hypnotic নেশা ছুটে যায়।

(৮)

ফ্রয়েড-দর্শনের মহাগুণ এই যে, এ দর্শন একমাত্র শ্রবণ মননের সামগ্রী নয়, কিন্তু এর দ্বারা মানুষের অনেক রকম রোগ সারানো যায়। তাই "মনের কথা"র লেখক বলেছেন যেঃ—"ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গা মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন,—মনীষী ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞানকে কল্পলোক হইতে নামাইয়া আনিয়া মানবের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিয়াছেন"।

সুতরাং এ দর্শনকে খৃষ্টানী ভাষায় ফ্রয়েডলিখিত সুসমাচার বলা যেতে পারে। ফ্রয়েড-প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-প্রণালী আমাদের পক্ষে যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তা গ্রন্থকার আমাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন যে ঃ—

"আজ ঘরে ঘরে দুর্ব্বল ও রুগ্ন মন লইয়া থাকিয়াও বহুলোকই সুস্থ বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। বিনা ঔষধে স্নায়ু ও মনের ব্যাধি ও অশান্তি দূর করিবার এক অভিনব উপায়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কত পারিবারিক অশান্তি যে এই নূতন প্রণালী অনুসরণ করিলে দূর হয়, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়"।

এখন এই "অভিনব উপায়ের" সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া যাক্।

মনীষী ফ্রয়েড হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসক। পূর্ব্বে কেউ এ রোগগ্রস্ত হলে লোকে ভাব্‌ত তাকে ভূতে পেয়েছে; তখন সে ভূতকে তাড়াবার জন্য লোকে ওঝা ডাক্‌ত। আমি ছেলেবেলায় নিজ চক্ষে ভূতের ওঝার চিকিৎসা দেখেছি। আমাদের পাড়ায় একটি গয়লার বউকে ভূতে পেয়েছিল। ওঝা কি করে ভূত ছাড়ায় দেখবার জন্য পাড়াসুদ্ধ লোক তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়, বাল্যসুলভ কৌতূহলবশতঃ আমিও যাই। গিয়ে দেখি ভূতের পছন্দ আছে। গোপিনী কিশোরী ও পরমাসুন্দরী, একেবারে তন্বী, শ্যামা, শিখর দশনা। ওঝা তার মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢালছে, উপরন্তু তার সর্ব্বাঙ্গে এলোধাপাড়ি প্রহার করছে, ঝাঁটা দিয়ে। আর সুন্দরী অবলা বেচারা মাটিতে পড়ে কাটা পাঁঠার মত ধড়ফড় করছে। সেই মারের চোটে ভূত পালাল, ভূতের সঙ্গে সঙ্গে হিষ্টিরিয়াও চম্পট দিল, আর রোগী হয়ে পড়ল অচৈতন্য।

(৯)

এ চিকিৎসা-প্রণালীর কথা শুনে চমকে উঠবেন না। বিলেতী ডাক্তাররাও হিষ্টিরিয়া রোগের অনুরূপ চিকিৎসা করতেন। তার প্রমাণ ইংলণ্ডের একটি বড় ডাক্তার ও প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ব-বিদ্ Mc Dougall-এর মারফতেই পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন,—

"A generation ago the attitude of the medical profession towards hysteria and allied abnormal conditions was, with very few exceptions, wholly unscientific, being based merely on popular psychology. It was vaguely recognised that the extraordinary behaviour of the hysterical patient implied some kind of mental abnormality, and that no gross disease of the nervous system was implied by it. But the tendency then prevalent may be crudely described by saying, that the abnormal behaviour of the hysteric was attributed to pure "cussedness," the treatment accorded was "firmness", strong electric shocks, cold douches and other decorous substitutes for a sound birching".

বিলেতী ডাক্তাররা ভূতে বিশ্বাস করতেন না বলে ধরে নিয়েছিলেন যে, হিষ্টিরিয়া হচ্ছে সেরেফ নষ্টামী। অতএব তার চিকিৎসা হচ্ছে রোগীর উপর জবরদস্তি করা। দুষ্টুমির একমাত্র ওষুধ হচ্ছে চাবুক। সুতরাং তাঁরা চাবুকের ভদ্র সংস্করণ—electric shocks, cold

douches প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করতেন। ফ্রয়েড আর কিছু না করুন, হিষ্টিরিয়ার রোগীদের দেশী বিলেতি ওজার মারাত্মক বেত্রচিকিৎসার হাত হতে বাঁচিয়েছেন। তাই এখন ইউরোপের হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীজাতি সমস্বরে বলছে—বেঁচে থাকুক ফ্রয়েড বছি চিরজীবি হয়ে। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে, হিষ্টিরিয়া ভূতের উপদ্রবই বটে—কিন্তু এ ভূত বাইরে থেকে আসে না, ভিতর থেকে ঠেল মারে। এই বুকের ভূত তাড়ানোই ফ্রয়েডের নূতন প্রণালী।—কথায় বলে স্ত্রীজাতির "বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না"। ফ্রয়েড বলেন যে, "মুখ ফোটালেই বুক আর ফাটবে না'।

(১০)

ফ্রয়েড-প্রবর্ত্তিত এই অভিনব চিকিৎসা-প্রণালীর পরিচয় পেয়ে আমিও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে,—

"আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনি"।

এ চিকিৎসা-প্রণালী কি জানেন, খুলনার তারিণী কবিরাজের প্রণালী। "গড্ডলিকা"র সঙ্গে যার পরিচয় আছে, তারিণী কবিরাজের সঙ্গে তাঁরই পরিচয় আছে। আর "গড্ডলিকা"র সঙ্গে বাঙলা দেশে কার পরিচয় নেই? যাঁর নেই, তাঁর জন্য তারিণী কবিরাজের সঙ্গে নন্দবাবুর কথোপকথনের এক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

তারিণী—দাঁত কন্‌কন্ করে?

নন্দ—আজ্ঞে না।

তারিণী—করে, Zanতি পারো না। যাহোক, তুমি চিন্তা কোরোনি বাবা। আরাম হয়ে যাবা।

রোগীর সঙ্গে এইরূপ আলাপই রোগ সারাবার অভিনব উপায়। ফ্রয়েড-দর্শনের গোড়ার কথা হচ্ছে Zanতি পারো না। যে সব ভূত রোগ ঘটায়, তারা হচ্ছে সব জ্ঞানকাণ্ডহীন মনোভাব। রোগ মাত্রেই মানসিক দাঁতকন্‌কনানি। তবে যে রোগী তা জানতে পায় না, তার কারণ সে দাঁত তার ওঠেনি। আর সে দাঁত যে কন্‌কন্‌ করে তার কারণ, তা উঠতে চাচ্ছে কিন্তু প্রহরীর শাসনে উঠতে পারছে না। ওজারা হিষ্টিরিয়া সারাতো রোগীকে অচৈতন্য করে ফেলে, ফ্রয়েড-পন্থীরা তাকে সারান তাকে সচেতন করে তুলে। অজ্ঞতাই যেখানে রোগের কারণ, জ্ঞান সেখানে ঔষধ। এই জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত করবার কৌশল যিনি জানেন, তাঁর নাম চিত্ত-বিশ্লেষক। এই চিত্ত-বিশ্লেষণ করতে হবে ধীরেসুস্থে, ভিতরকার ভূতগুলোকে তুষিয়ে বুঝিয়ে। অর্থাৎ তারিণী কবিরাজের মত তাদের বল্‌তে হবে—"লাফাস্‌নি, থাম্‌ থাম্‌। আমার সব জিয়ন্ত ওষুধ, ডাকলী ডাক শোনে"। ঐ অন্তরঙ্গ ভূতদের ডাক্‌লে যাঁর ডাক্‌ তারা শোনে, তিনিই যথার্থ চিত্ত-বিশ্লেষক।

(১১)

পূর্ব্বে যা বলা গিয়েছে, তার থেকে লোকে মনে করতে পারে যে, আমাদের ভিতর জ্ঞানের আলো ফেললেই আমরা মনের রোগ থেকে মুক্ত হই। দন্তরোগের একরকম নতুন চিকিৎসা বেরিয়েছে, যার নাম light treatment; দাঁতের গোড়ায় বিজলী বাতির আলো ফেলেই এক শ্রেণীর চিকিৎসক দাঁতের পোকা বার করেন। ফ্রয়েড-বিজ্ঞান কিন্তু অত সহজ নয়। ফ্রয়েড বলেন, "না জানাটাই ব্যাধির মূল কারণ নয়। আমাদের অন্তর্নিহিত অনিচ্ছাই এই অজ্ঞানতার মূল,

আর উহাই আমাদের অজ্ঞ ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাখে"। অজ্ঞতার মুলে আছে অনিচ্ছা, সুতরাং অজ্ঞানকে জ্ঞানে পরিণত করতে হলে তার আগে অনিচ্ছাকে ইচ্ছায় পরিণত করতে হবে। তা করবার উপায় কি? ফ্রয়েড বলিতেছেন, "চিত্ত-বিশ্লেষকের প্রতি প্রেমই রোগ-নিরাকরণের প্রধান অবলম্বন।" অর্থাৎ যে চিত্ত-বিশ্লেষক রোগিণীকে নিজের সঙ্গে ভালবাসায় পড়াতে পারবে, সে-ই যথার্থ চিকিৎসক। চিত্ত-বিশ্লেষক এ প্রেম আকর্ষণ করবেন কি করে? রামপ্রসাদ বলেছেন, "হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে"। ঐ একই কথা গ্রন্থলেখক মহাশয় বলেছেন, কবিত্বের নয় বিজ্ঞানের ভাষায়। চিত্ত-বিশ্লেষক যদি নিজেকে চুম্বকে পরিণত করতে পারেন, তাহলে তাঁর মানসিক যৌন-আকর্ষণের বলে সমাজ নামক হাঁসপাতালের যত মরচে-ধরা লোহা সব ডাক্তারের কোলে ছুটে আসবে। আর তাঁর স্পর্শে তারা অহল্যার মত শাপমুক্ত হয়ে যাবে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ যে এ চিকিৎসায় হাতযশ লাভ করতে পারেন, এমন ত মনে হয় না। অথচ মানসিক বিকার মাত্রই যখন উদ্ভ্রান্ত প্রেম, তখন রোগীকে প্রেমগ্রন্থীতে আবদ্ধ করা ছাড়া চিত্ত-বিশ্লেষকের উপায়ান্তর নেই। এই উভয়-সঙ্কট থেকে বেরবার উপায় কি? আমি একটা ফাঁক দেখতে পাচ্ছি। ফ্রয়েড প্রমাণ করে দিয়েছেন যে—"মানুষের সমাজ পাগলের মেলা।" আমরা সবাই পাগল, মায় চিত্ত-বিশ্লেষক। কারণ ফ্রয়েডের মতে প্রকৃতি মানেই বিকৃতি। এ অবস্থায় physician heal thyself এই পুরোনো বচন অনুসারে মানব সমাজকে চলতে হবে। প্রত্যেকেই যখন রোগী, তখন প্রত্যেককেই চিত্তবিশ্লেষক হতে হবে। নিজের সঙ্গে নিজে ভালবাসায় পড়া অতি সহজ। সুতরাং আমরা সবাই

আদর্শ চিত্তবিশ্লেষক হন, ফলে পৃথিবীতে আর মানসিক বিকার বলে কোনও রোগ থাকবে না। মনীষী ফ্রয়েড যদি অপরের চিত্ত-বিশ্লেষণ না করে নিজের চিত্ত-বিশ্লেষণ করতেন, তাহলে হয়ত তিনি আবিষ্কার করতেন যে, তাঁর দর্শনের মূলে রয়েছে কোনও অনামিক নিরুদ্ধ গ্রন্থী। সে যাই হোক, এ দর্শন যে অপূর্ব্ব, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই; সেই জন্য আমি যথাসাধ্য তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করলুম। আশা করি আমার এ প্রবন্ধ "মনের পথের" উপসংহার বলে গণ্য হবে।

বীরবল।

নূতন লেখক।
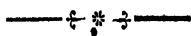
কেউ একটা নতুন পত্র বার করতে উদ্যত হয়েছেন, এ কথা শুনলেই আমি খুসি হই। কারণ নিত্যনতুন পত্রিকার জন্ম বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাণের লক্ষণ। পাঠকের সংখ্যা না বাড়লে যে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, এ কথা ত সকলেই জানেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটাও সকলের মনে রাখা উচিত যে, লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার উপরেই সাহিত্যের উন্নতি নির্ভর করে না; সাহিত্যের স্থিতি ও উন্নতি যে লেখক পাঠক উভয়ের যোগাযোগের উপর নির্ভর করে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

নূতন পত্রের আবির্ভাবের কথা শুনলেই যে আমি খুসি হই, তার কারণ এই সূত্রে পরিচয় পাই যে, আবার জনকতক যুবক লেখক শ্রেণীতে ভুক্ত হচ্ছেন। এই নূতন দলের ভিতর ক'জন কালক্রমে বড় লেখক হয়ে উঠবেন, এ প্রশ্ন মনে মনে জিজ্ঞাসা করাও বৃথা; কেননা সে প্রশ্নের উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ।

পৃথিবীর নিয়মই এই যে, সকল ব্যাপারেই many are called but few are chosen। কিন্তু যাতে করে few chosen হতে পারে, তার জন্য many-কে call করা প্রয়োজন। এই কথাটা মনে রাখলেই কেউ আর নিত্যনতুন পত্রিকার আবির্ভাবকে কু-নজরে দেখবেন না, বরং দেখবেন শুধু আশার চক্ষে।

নূতন লেখকদের বিরুদ্ধে আর একটি অপবাদ প্রায়ই শোনা যায়। তারা নাকি লেখকের খ্যাতি অর্জ্জন করবার পূর্ব্বেই লিখতে সুরু করেন। এ আপত্তি হাস্যকর। সাঁতার না শিখে জলে নামাটা যে হিসাবে অন্যায়, পাকা লেখক না হয়ে লিখতে বসাটাও সেই হিসেবে অন্যায়। কিন্তু ফলে কি দেখা যায়? অনেক অপরিচিত লেখক যে লেখার জোরেই নিজেকে সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত করেন, তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

নূতন লেখকদের সঙ্গে পুরোনো লেখকদের আসল প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত দল আগে লিখতে সুরু করেছেন, আর শেষোক্ত দল পরে কলম ধরেছেন। প্রতিভাবান লেখকের কথা ছেড়ে দিলে আমাদের বাদবাকী লেখকদের মধ্যে আসল তফাৎটা হচ্ছে সময়ের। কে আগে লিখেছে আর কে পরে লিখ্ছে, সে ঘটনার মুল্য আছে শুধু স্কুলবুক-পরীক্ষকদের কাছে; সাহিত্যরসিকদের কাছে তার কোনও মুল্য নেই। আমাদের স্কুল কলেজে এমন অনেক বই পড়ানো হয় যা স্কুলের বাইরে কেউ কখনো পড়ে না, পড়্তে চায়ও না। নূতন লেখকদের মধ্যে অনেকের লেখা যেমন অচল পুরোনো লেখকদের মধ্যেও অনেকের লেখা তেমনি অচল। পূর্ব্বেও যেমন সাহিত্যিকরা ভালমন্দ অনেক রকম লেখা লিখেছেন, এখনও তেমনি সাহিত্যিকরা ভালমন্দ অনেক রকম লেখা লিখবেন। সুতরাং এ বিষয়েও নব্যেরা প্রাচীনদের সঙ্গে সমবস্থ। আমি নিজে নবীনদের তুলনায় প্রবীণ লেখক ও প্রবীণদের তুলনায় নবীন লেখক, সুতরাং এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি আমার সমদৃষ্টি আছে; এবং আমি দেখতে পাই যে, এই উভয় সম্প্রদায়ই সমধর্ম্মী।

সকল প্রকার সাহিত্যরচনার মূলে আছে লেখবার আন্তরিক প্রবৃত্তি ; সুতরাং এ প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ যত বেশি লোকের ভিতর পাই, তত আমি বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উঠি। যে সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুবকদের এ প্রবৃত্তিতে বাধা দিতে চান, তাঁরা "প্রবৃত্তিরেষা নরানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ" এই শাস্ত্রবচনের অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করেন না। লেখবার প্রবৃত্তি ও-জাতীয় প্রবৃত্তি নয়। এই লেখবার প্রবৃত্তি যাঁর আছে তাঁর যদি সেই সঙ্গে নিজের শক্তিতে বিশ্বাস থাকে, তাহলে তিনি একজন যথার্থ লেখক হতে বাধ্য। কারণ উক্ত শক্তির বিকাশ একমাত্র তার চর্চ্চাসাপেক্ষ।

শ্রী প্রমথ চৌধুরী।

'জানি না'।

—০ঃ*ঃ০—

সে কেবল পালায়, দূরে দূরে পালায়। আমি লিখতে বসেছি, কিন্তু পলে পলে অনুভব করি সে আমার এই লেখাটির চেয়ে যে কত সত্যি, কত সুন্দর, কত সজীব। মন তারি পেছনে ছোটে, আর মনের পিছনে ছোটে আঁখি-পাখী। সে যেন আমাকে দেখেইনি এমনি ছল করে, অথচ আমাকে যে আড়চোখে বার বার দেখে নেয়, তা বেশ জানি। আমার ঘরে ঢুকেই, আমি কোথায় বসেছি, কি করছি, সে সব এক নিমেষে দেখে নেওয়াই তার অভ্যাস, আমি তাও জানি।

এমনি ভাবেই আর একজনের নীরব-ভাষী চোখ দুটি, ঘরে বাইরে, কত না ভিড়ের মধ্যেও, আমাকে খুঁজে নিত; সন্ধ্যাবেলায়, নীড়-অভিমুখ যুগল পাখী যেমনি ভাবে অস্থির পাখা মেলে, সমুদ্রের উপর দিয়ে এসে, পাখা বন্ধ ক'রে, নীড়ে টপ্ করে নেমে পড়ে—তেমনি, অস্থির তার চাহনি, সকলের মুখের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে, আমার চোখ খুঁজে পেয়ে থেমে যেত। কিন্তু সে অনেকদিনের কথা—থাক্ সে স্মৃতিমূলে, থাক্ সে বুকের শীতল অন্ধকারে। তা কি দিনের আলোয় বাহির করা সাজে?

যার কথা বলতে আরম্ভ করেছিলুম, তাই বলব। সে কথা আমার মেয়ের কথা। প্রভাতের প্রথম কিরণ সে, আমাকে মৃদু স্পর্শ করে',

সে যে কোন্ কল্প-দেশে ভেসে যায়, তা কি জানি। মন তার কচি পাতার মত; তালে তালে আলোর ঢেউয়ে নাচে। রাজ্যে তার কত পূর্ণিমা-চাঁদ ফুল হয়ে হয়ে, সোনার স্তরে স্তরে, পলে পলে ফোটে। দিনের বেলাও তার আকাশ ছায়া-পথের ফুলের রেণু দিয়ে মাখা। আমায় 'তার জন্য গল্প' তৈরী করতে হয়। কি দিয়ে তার হাসির ঝরণা, কি দিয়ে তার বিস্ফারিত চোখের বিস্ময় কিনতে হয়, তা গল্প রচনা করেই আমি শিখি। আজ কিন্তু লেখাটি কিছুতেই অগ্রসর হতে চায়না। মুস্কিলে পড়েছি। সেইজন্য বোধহয়, সে মাঝে মাঝে আমার পানে কেমন একভাবে তাকায়, যেন সে আমাকে করুণা করে। তারপরে মৃদু হাসি হেসে চোখ সরিয়ে নেয়।

তাকে জিজ্ঞেস করি—'হাস্‌চ কেন'?

কোন উত্তর নেই। তার খেলনা নিয়ে সে অধিকতর ব্যস্ত।

আবার জিজ্ঞেস করি 'হাসলে যে'?

এইবার সে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

আর একবার জিজ্ঞেস করতে যেন সাহস হয় না—তবু সাহস সঞ্চয় করে' করি। এইবার হাসি সম্বরণের প্রবল চেষ্টার পর, সে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলে 'জানিনা'।

এই কিনা ঠিক কথা। এ 'জানিনা'ইত মহা-প্রকৃতির রুদ্ধ দুর্গের উপরের জয়-পতাকা; পুরুষ-মনের আদিম শত্রু; নারী-হৃদয়ের দিক্-পাল।

মহাত্মারা বলেন—'এ শুধু মূঢ়তার ডাল-পালা দিয়ে ঘেরা সুন্দর আশ্রয়'।

রসিক মনে ভাবে—'এর মূল্য বোঝা মহাত্মার কর্ম্ম নয়'।

কার কথা সত্যি ?

জানি না !

জাহাঙ্গীর বকিল।

গাছের ভিতরটা।

——:*:——

মানুষের শরীরে যেমন মোটামুটি তিনরকম জিনিষ পাওয়া যায়, চামড়া, মাংস আর হাড়,—গাছের শরীরেও তেম্‌নি মোটামুটি তিনরকম জিনিষ আছে, ছাল, শাঁস আর কাঠ। আবার মানুষের শরীরে যেমন সব উপরে চামড়া, তার নীচে মাংস, তার নীচে হাড়;—গাছেরও তেম্‌নি সব উপরে ছাল, তার নীচে শাঁস, তার নীচে কাঠ। ছাল, শাঁস আর কাঠ—এই তিনটে তিনরকম আলাদা জিনিষ বলে, এদের এক একটাকে এক এক টিস্যু বলে।

টিস্যুগুলো মূলে একই জিনিষ, কিন্তু এক একটাকে এক একরকম কাজ করতে হয় বলে, চেহারা আর গড়ন আলাদা আলাদা হয়েছে। কাঠ-টিস্যুর আসল কাজ হচ্ছে, গাছটাকে খাড়া করে ধরে রাখা; শাঁস-টিস্যুর আসল কাজ খাবার জমানো; আর ছাল-টিস্যুর আসল কাজ বাইরের উৎপাত থেকে গাছকে বাঁচানো। এ তিন টিস্যু গাছের পাতাতেও আছে, শিকড়েও আছে। পাতার কাঠ-টিস্যু হচ্ছে শির, যার জন্যে পাতা একটু বাতাসেই ছিঁড়েখুড়ে যায় না। গুঁড়ির শাঁস-টিস্যুকে কেবল খাবার জমাতেই হয়, কিন্তু পাতার শাঁস-টিস্যুকে খাবার ত জমাতে হয়ই, খাবার রাঁধতেও হয়। গুঁড়ির ছাল-টিস্যুকে যে সব কাজ করতে হয়, শিকড়ের ছাল-টিস্যুকে তা ত করতে হয়ই— বাড়ার ভাগ মাটীর রসও টানতে হয়।

যাকে কাঠ-টিস্থ বলেছি, তা ধরতে গেলে একটা টিস্থ নয়, তিনটে টিস্থ। উপরে ছোবড়া-টিস্থ, নীচে কাঠ-টিস্থ, মাঝখানে পূর-টিস্থ। কাঠ-টিস্থর নীচে আবার শাঁস-টিস্থ আছে, যাকে আমরা 'মাজ' বলি, কিন্তু পাকা গুঁড়িতে ঐ মাজ কাঠ-টিস্থর চাপে কাঠই হয়ে দাঁড়ায়—বরং সে আরো শক্ত কাঠ বলে তাকে বলি সার-কাঠ।

খাঁটি কাঠ-টিস্থই শিকড় দিয়ে টানা রসকে গাছের পাতা পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয়; আর ছোবড়া-টিস্থ পাতার রান্না-রসকে গাছের সেই সেই জায়গায় সরবরাহ করে। তাহলেই দেখ্‌তে পাচ্ছো, গোটা কাঠ-টিস্থর কাজ যে কেবল গাছকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখা তা নয়, গাছের খাবার চালাচালি করাও তার কাজ। যে সব লতানে গাছ খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তাদের মধ্যে কাঠ-টিস্থ খুব কম।

ছোবড়া-টিস্থ জিনিষটা ছোবড়ার মত শক্তও বটে, আবার টানলে লম্বাও হয়। পাটগাছের ছোবড়া-টিস্থকে কোষ্টা বলে। পাটগাছকে কিছুদিন জলে ভিজিয়ে রাখ্‌লে কোষ্টাগুলো গাছের গা থেকে আলাদা হয়ে যায়—তখন সেই কোষ্টা দিয়ে দড়ি, চট, কাপড়—এই রকম সব টেঁকসই জিনিষ তৈরী হয়।

কাঠ-টিস্থর মত ছোবড়া-টিস্থর জোরেও গাছ ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কোন কোন ছোবড়া-টিস্থর এতই বেশী জোর, অর্থাৎ সে এতই টান সইতে পারে যে, ইস্পাতের তারও তার কাছে হার মেনে যায়।

যতগুলো টিস্থর কথা উপরে বলেছি, তার মধ্যে এক পূর-টিস্থ ছাড়া আর কোন টিস্থই বাড়ে না। এটা যতই বাড়ে, ততই এর খানিকটা হয়ে যায় কাঠ-টিস্থ, আর খানিকটা

ছোবড়া টিস্থ—কিন্তু ভিতরে একপর্দ্দা পূর-টিস্থ থেকেই যায়। কাঠ আর ছোবড়া বাড়বার সময় গুঁড়ির ভিতরে যে কি ঠাসাঠাসি কাণ্ড লেগে যায়, তা গাছই জানে। উপরকার কাঠের চাপে ভিতরকার কাঠ ক্রমেই শক্ত আর চেপ্টা হতে থাকে, আর ভিতরকার ছোবড়ার চাপে উপরকার ছোবড়া মায় শাঁস পর্য্যন্ত পিষ্‌টে যায়—শেষে ছাল পর্য্যন্ত ফেটে চটে একাক্কার হয়।

অল্প জায়গার মধ্যে যদি রোজই নতুন জিনিষ পূরতে থাক, তাহলে ঠাসাঠাসি করেও কুলোবে না—জায়গা বাড়ানোই চাই। গাছেরও ঠিক তাই হয়। বছর বছর গাছের গুঁড়ি ঘেরে বাড়তে থাকে। বাড়েনা কেবল ধান, বাঁশের মত একবীচিপাত গাছের—কেননা তাদের মধ্যে পূর-টিস্থ নেই। এটা একবীচিপাত গাছের পক্ষে ভাল নয়। কাঠ ছোবড়া বাড়বার দরুণ গাছ যদি ক্রমেই ঘেরে মোটা হয়, তবেই না সে বেশী শক্ত ও মজবুত হবে। তাছাড়া দু' বীচিপাত গাছের গুঁড়িতে কাঠ-টিস্থগুলো খিলানের ইঁটের মত গোল করে সাজানো; কিন্তু একবীচিপাত গাছের গুঁড়িতে কাঠ-টিস্থগুলো শাঁস-টিস্থর মধ্যে এলোমেলো ভাবে বসানো। ঝড়ের সময় যে আম কাঁঠালের চেয়ে তাল, নারকোল গাছ ভাঙে বেশী, সে এই দোষের জন্য।

একে গুঁড়ির কাঠ-টিস্থ বাড়ে না, তার গুঁড়ি মোটা হয় না, তায় কাঠ-টিস্থগুলো খিলানের কায়দায় সাজানো নয়, এই এতগুলো দোষকে যে একবীচিপাত গাছ কোনরকমেই শোধরাবার চেষ্টা করেনি তা নয়; তা যদি না করতো তাহলে তারা একটু বড় হলে আর টিঁকতো না। ধর ধানগাছ, সে ত এক আঙুলের বেশী মোটা

হয় না, অথচ তিনশো আঙুল পর্য্যন্ত মাথায় বাড়ে—তারপর পাতা আর ধানের শীষের বোঝা ত মাথায় আছেই। এই বোঝাই নিয়ে সে যে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে ও সহজে ভাঙেনা, সে কি শুধুই তার লগ্‌বগে ডগা আর ঘন ঘন গাঁটের জন্য? না, সে বেশ এক কল খাটিয়েছে। সে বুঝেছে যে, ঝড়ের সময় গুঁড়ির ভিতর দিকটায় চাড় লাগে কম—বেশীর ভাগ চাড়ই লাগে বাইরে। কাজেই সে তার ভিতর-গুঁড়িটাকে করেছে একদম ফাঁপা, আর যত শাঁস-টিস্থ, কাঠ-টিস্থ সব জড় করেছে বাইরের দিকটায়। বাঁশগাছও ঠিক তাই করেছে। তাল, নারকোল, স্থপুরী পূরোপূরি না করতে পারলেও, আধাআধি রকম করেছে।

দু'বীচিপাত গাছের মধ্যে বাবুই তুলসী পুদিনার মত দুঃ একটা গাছ আছে, যাদের গুঁড়ি চৌকোণা। তারাও গুঁড়িকে শক্ত করেছে অনেকটা ঐ ধরণের কায়দায়। তারা তাদের যত শক্ত টিস্থকে জড় করেছে চারটি কোণায়। মুথো ঘাসের তেকোণা গুঁড়ির তিনটি কোণা যত শক্ত, মাঝখানটা তত নয়।

দু'বীচিপাত গাছের গুঁড়িতেও পুর-টিস্থ আছে, শিকড়েও আছে, কিন্তু পাতায় নেই; তাই গুঁড়ি শিকড় মোটা হলেও পাতা মোটা হয় না।

দু'বীচিপাত গাছের গুঁড়িতে বছরে দুবার করে নতুন কাঠ-টিস্থ হয়। পুরোনো কাঠ-টিস্থর চারপাশে যে নতুন কাঠ-টিস্থ হয়, তাকে পুরোনো কাঠ-টিস্থ থেকে চিনে নেওয়া যায়। দুই কাঠ-টিস্থর মাঝখানে একটা সূতোর মত কালো দাগ থেকে যায়। কাজেই একটা মোটা গুঁড়িকে আড়াআড়ি ভাবে করাত দিয়ে চিরলে যতগুলো কালো

গোল দাগ দেখতে পাবে, গাছটার বয়েস তার অর্দ্ধেক বছর।

এখন কথা হতে পারে যে, পূর-টিস্যুই যদি একমাত্র বাড়ন্ত টিস্যু হয়, আর একবীচিপাত গাছে যদি একছিঠেও পূর-টিস্যু না থাকে, তাহলে একবীচিপাত গাছের শিকড়ই বা লম্বা হয় কি করে, গুঁড়িই বা লম্বা হয় কি করে?—গুঁড়ির মাথায় আর শিকড়ের ডগায় আর একরকম বাড়ন্ত টিস্যু আছে, যা পূর-টিস্যু নয়। এ টিস্যুর নাম কীমা-টিস্যু। গাছ যখন একেবারে কচি থাকে, তখন তার গায়ে এক কীমা-টিস্যু ছাড়া আর কোন টিস্যুই থাকে না; তারপর গাছ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কীমা-টিস্যুই কাঠ-টিস্যু, ছোবড়া-টিস্যু, শাঁস-টিস্যু, পূর-টিস্যু, এই সব ভাগে আলাদা হয়ে যায়। কেবল গুঁড়ির মাথায়, ডালের মাথায়, শিকড়ের ডগায় কীমা-টিস্যু কীমা-টিস্যুই থেকে যায়। কীমা-টিস্যু থেকে যত-রকম টিস্যু জন্মায়, তার মধ্যে এক পূর-টিস্যুই কীমা-টিস্যুর বাড়ন্ত ধাতটা বজায় রাখে। অন্য টিস্যু কীমা-টিস্যু থেকে জন্মেছে কি তার বাড় বন্ধ হয়ে তা জমাট হয়ে গেছে।

টিস্যুগুলো কি জিনিষ দিয়ে তৈরী তা দেখ্‌তে হলে, অনুবীণ দিয়ে দেখা দরকার। একটা লাউ-এর ডাঁটার একটা পাত্‌লা চাকল্‌াকে অনুবীণের তলায় রেখে দেখ্‌লে, দেখতে পাবে চাক্‌লাটার উপরে মৌ-চাকের খোপের মত খোপ পাশাপাশি বসানো। আরো ভাল করে নজর করে দেখ্‌লে দেখতে পাবে যে—খোপগুলো এক একটা জ্যান্ত জিনিষ—একটু আধটু নড়াচড়া করে। এই এক একটা জ্যান্ত জিনিষকে এক একটা কোষ বলে।

এক একটা টিস্যু একই রকমের একগাদা কোষ দিয়ে তৈরী। যে টিস্যু যেরকম, তার কোষও সেইরকম। কোন টিস্যুর কোষ গোল,

কোন টিস্থুর কোষ লম্বা, কোন টিস্থুর কোষ বড়, কোন টিস্থুর কোষ ছোট, কোন টিস্থুর কোষ শক্ত, কোন টিস্থুর কোষ নরম। গোড়াতে সব কোষই একরকমের থাকে, শেষকালে টিস্থু-হিসেবে আলাদা হয়ে যায়।

তাহলেই বুঝতে পারছো একটা গাছ মানে একটা জীব নয়, হাজার হাজার জীব। মানুষও ঠিক তাই। একটা মানুষ নিজেকে যতই একটা জীব বলে মনে করুক্, আসলে সে হাজার হাজার জীবন্ত কোষের গাঁথুনি।

এমন গাছও আছে যা একটা কোষ দিয়েই তৈরী,—যেমন অনুগাছড়ী। কিন্তু সেরকম গাছ ছাড়া আর সব গাছই অনেক কোষ দিয়ে তৈরী। বাড়ন্ত টিস্থুর কোষগুলো ফটাফট্ ভাঙে আর গুন্তিতে বাড়ে। একটা থেকে দুটো হয়, দুটো থেকে চারটে। কাজেই গাছ ছোট থেকে বেড়ে বড় হয়। বুড়ো গাছ যে আর বেশী বাড়েনা তার মানে—তার গায়ে বাড়ন্ত টিস্থু আর ভাঙন্ত কোষ কম।

ফি কোষেরই তিনটী ভাগ আছে—কোষপর্দ্দা, কোষজীব আর কোষদানা। একেবারে ভিতরে থাকে কোষদানা,তার চারপাশে কোষজীব, তার চারপাশে কোষপর্দ্দা।

হাঁসের ডিমের কুসুম যেমন একটা পাত্‌লা পর্দ্দা দিয়ে ঘেরা থাকে, কোষজীবও তেম্‌নি কোষপর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। কোন টিস্থুতে কোষপর্দ্দা খুব পাতলা হয়, কোন টিস্থুতে তার চেয়ে পুরু, যেমন ছাল-টিস্থুতে; তার মানে ছালের কোষগুলোকেই বাইরের চোট সইতে হয়। ঠিক্ এই জন্যেই মানুষের সমস্ত গায়ের চামড়ার চেয়ে হাত পায়ের চেটোর চামড়া বেশী পুরু। গাছের শিকড়গুঁড়ির ডগার কোষগুলোতে মোটেই কোষপর্দ্দা নেই।

কোষপর্দ্দার গায়ে খুব সরু সরু ছেঁদা আছে। ঐ ছেঁদা দিয়ে কোষজীবের যা কিছু দরকার, যেমন খাবার জল, প্রাণগ্যাস, তা ভিতরে ঢোকে। আর কোষজীব যা বের করে দিতে চায়, যেমন বিষগ্যাস, তা বাইরে চলে আসে। ছেঁদাগুলোর মজা এই যে, যা বেরোতে চায় তাকে মোটেই বাধা দেয় না; কিন্তু যা ঢুকতে চায়, তাকে খুব দেখে শুনে যাচাই করে তবে ঢুক্‌তে দেয়।

গাছের খাওয়া মানেই কোষজীবের খাওয়া। কোষজীবের ক্ষিদে মিটে গেলেই গাছের ক্ষিদে মিটে যায়। গাছের নিঃশ্বাস নেওয়া মানেই কোষজীবদের নিঃশ্বাস নেওয়া; কোষজীবরা প্রাণগ্যাস পেলেই, গাছের প্রাণগ্যাস টানার কাজ হল।

কোষজীব হচ্ছে জেলি কি সজ্‌নের আঠার মত একটা থল্‌থলে জিনিষ। এ জিনিষ যে জীবন্ত তা আগেই বলেছি—কাজেই কোষজীব বাড়ে, বদলায়, বুড়ো হয়, মরে যায়।

কোষজীব যে কোষপর্দ্দার ভিতরকার সমস্ত খোলাটা ভরে থাকে তা নয়, খানিকটা জায়গা ফাঁক থাকে। ঐ ফাঁকে কোষজীবের খাবার জল, প্রাণগ্যাস, এই সব থাকে। পাতার কোষের মধ্যে গাছ-সবুজও থাকে। গুঁড়ির শাঁস-টিস্যুর কোষে গাছ সাদা থাকে বলেই গুঁড়ির শাঁস দেখতে সাদা। কোন কোন কোষে অন্য গাছ-রংও থাকে, যার জন্য ফলফুলের গায়ে লাল নীল হল্‌দে কত রঙই দেখা যায়।

কোষজীবের মধ্যে ছোট্ট ফুট্‌কির মত যে কোষদানাটি থাকে, সেই হচ্ছে কোষজীবের আসল জিনিষ,—প্রাণ বল্লেও চলে। তারই জোরে সমস্ত কোষটা যা কিছু কাজ করে।

যে সব কোষ মরে যায়, তাদের ভিতরকার কোষজীব কোষ-

দানা সব শুকিয়ে যায়। গাছের গায়ে অনেক মরা কোষ থাকে। গুঁড়ির ছালের উপর থেকে যে চোক্‌লাগুলো মাঝে মাঝে খসে পড়ে, তার ভিতর একটাও জ্যান্ত কোষ নেই। গুঁড়ির কাঠ-টিস্থ আর ছোবড়া-টিস্থতে মরা কোষই বেশী। কাঠ-টিস্থর মরা কোষগুলো উপরি উপরি লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে, আর তাদের দুটো কোষের মাঝখানের কোষপর্দ্দার বেড়া ফাঁক হয়ে যায়, কাজেই সমস্ত কাঠ টিস্থটা পাশাপাশি সাজানো চোঙার মত হয়ে পড়ে। ছোবড়া-টিস্থতে মরা কোষগুলোর কোষপর্দ্দার বেড়া একেবারে ফাঁক হয়ে যায় না, ঝাঁজ্‌রা হয়ে যায়। কাজেই ছোবড়া-টিস্থ দেখ্‌তে হয়, এক তাড়া ঝাঁজ্‌রা-চোঙার মত। কাঠ-টিস্থর চোঙা দিয়ে গাছের রস উপরে যায়, ছোবড়া-টিস্থর চোঙা দিয়ে নীচে নাবে।

গাছের ছাল যত পুরু আর শক্ত হয় ততই ভাল। গাছ বড় হলেই তার গুঁড়ির ছালের উপর যে চোক্‌লা গজায়, সে ঠিক ছাল না হলেও ছালের ঢাক্‌নি। আমাদের চামড়ার উপর যেমন কড়া বা কর্ক পড়ে, গাছের ছালের উপরেও তেমনি চোক্‌লা বা কর্ক পড়ে। আম জাম গাছের কর্ক তত পুরু হয় না; কিন্তু এক একটা গাছের কর্ক এম্‌নি পুরু হয়, যেমন দক্ষিণ-য়ুরোপের একরকম ওক গাছের,—যে তা থেকে শিশির ছিপি তৈরী হয়। এই জন্যই শিশির ছিপিকে কর্ক (কাঁক্) বলে।

এই কর্ক টিস্থ ছাল-টিস্থর উপর কি করে জন্মায়?—আগেই বলেছি গাছ যত বয়সে বাড়ে, ততই তার ভিতরকার কাঠ-টিস্থ ফেটে চটে একাক্কার হয়; যেমন বেশী চর্ব্বি-ওয়ালা মানুষের গায়ের চামড়া ফাটে। এখন ঐ ফাটাচটাগুলো যদি না জুড়ে যায়, তাহলে গাছের রস ত

দিনরাত চুঁইয়ে বেরোবেই, তা ছাড়া অনেক রোগের জড় গাছের গায়ের মধ্যে ঢুকে তাকে মেরে ফেল্‌বে। কাজেই যেখানেই গাছের ছাল ফাটে, সেখানেই তার চারপাশের ছাল-টিস্থর কোষগুলো বাড়ন্ত নাহলেও ঠেলায় পড়ে পূর-টিস্থর কোষের মত বাড়ন্ত হয়ে ওঠে; আর ধাঁ ধাঁ করে নতুন কোষ তৈরী করে। নতুন কোষ তৈরী হলেই ফাটা জায়গাটা আপনা হতে বুজে যায়। ফাটা জায়গা বুজে গেলেও তার উপরে কতকগুলো কোষ ঢিপির মত উঁচু হয়ে থাকে; ঐ ঢিপি গুলোই কর্ক। গাছ যতই মোটা হয় ততই কর্কের নীচের ছাল আবার ফাটে, আবার সেখানে কর্ক হয়; এইরকম করে কর্ক পুরু হতে থাকে। কর্কের কোষগুলো পর্য্যন্ত গাছের ভিতরকার খাবার এসে পৌঁছায় না বলে তারা দুদিনেই মরে যায়। কাজেই গাছের খানিকটা কর্ক কেটে নিলেও গাছ বোধ হয় তা টের পায় না; যেমন আমাদের মরা-নখ কাট্‌লে আমাদের লাগে না।

গাছের খাবার যোগাড় ও রান্না।

তোমরা শুনেছ গাছের খাবার বাতাসেও আছে মাটিতেও আছে—সে বাতাস থেকেও খাবার টেনে নেয়, মাটি থেকেও। এ কথা যে মিথ্যা কথা নয় তা এই থেকেই বুঝবে যে, একই মাটিতে সার না দিয়ে উপরো-উপরি একই ফসলের চাষ করলে দেখবে ফসল ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মাটির খাবার কমতে থাকলেই ফসলের তেজও কমবে। আবার একটা চারা গাছকে কাঁচের জার চাপা দিয়ে রাখো—সে দুদিনেই শুকিয়ে মরে যাবে। হাওয়ার খাবার না খেয়েও সে বাঁচে না।

শিকড় দিয়ে যেমন গাছ মাটির খাবার টানে, তেমনি বাতাসের

খাবার টানে পাতা দিয়ে—এ কথাও তোমরা শুনেছ। কিন্তু বাতাসের খাবার কোন্ পথ দিয়ে পাতার মধ্যে ঢোকে? ঢোকে পাতার গায়ের সরু সরু ছেঁদা দিয়ে, যাদের ছাল-ফুটো বলে।* ছাল-ফুটো এতই ছোট যে, অনুবীণ ছাড়া খালি চোখে দেখবার জো নেই। পাতার তলার পিঠেই ছাল-ফুটো বেশী, উপর পিঠে নেই বল্লেই হয়। একটা আম কি জামের পাতায় চার পাঁচ হাজার ছাল-ফুটো আছে, একটা কচু কি কলাপাতায় এক লক্ষ কি দেড় লক্ষ।

ছালফুটো দিয়ে গাছ যে শুধু খাবার গ্যাসই টানে তা নয়, নিঃশ্বাসও ফেলে, শরীরের বাড়তি জলও বের করে দেয়। কাজেই ছালফুটো হচ্ছে গাছের মুখ, নাক, লোমকূপ তিনই—কিন্তু সে কথা পরে হবে।

ফি ছালফুটোর দুপাশে যে দুটী কোষ আছে, তারা দেখ্‌তে অনেকটা আধ্‌লা চাঁদের মত—কাজেই তারা মুখোমুখি বসানো থাকলেও তাঁদের মধ্যে ঐ ফাঁকটুকু না থেকে পারে না। গাছ ইচ্ছা

* ছালফুটো যে কেবল গাছের পাতাতেই আছে তা নয়, গুঁড়িতেও আছে, শিকড়েও আছে। গাছের কচি গুঁড়ির ছালফুটো ঠিক পাতার ছালফুটোর মতই, কিন্তু পাকা গুঁড়িতে ঐ ছালফুটোগুলো কর্কে ঢাকা পড়ে যায়; দু'চারটে অবশ্য পড়েনা। কর্কের গায়ে যে ছোট ছোট ডুম্‌কি দেখা যায়, সে ঐ পাকা গুঁড়ির ছালফুটো। সেগুলো পাতার ছালফুটোর মত ঘেঁসাঘেঁসি নয়, ফাঁক ফাঁক। আর পাতার ছালফুটো কি কচিগুঁড়ির ছালফুটো নিজের ছেঁদাকে কখনো একটু বড় কখনো একটু ছোট করতে পারে, কিন্তু পাকা গুঁড়ির ছালফুটো তা পারে না। কিন্তু কচিগুঁড়ির ছালফুটোর চেয়ে পাকা গুঁড়ির ছালফুটো যে বেশী মজবুত, তাতে ভুল নেই। কচিগুঁড়ির ছালফুটো যেন মেটে ঘরের ছিটে বেড়ার জান্‌লা, আর পাকা গুঁড়ির ছালফুটো যেন কোঠাবাড়ীর লোহা কাঠের জান্‌লা।

করলে কিন্তু কোষ দুটোকে একটু ফোলাতেও পারে, চোপ্‌সাতেও পারে। তাতে করে চোখের মত ছালফুটোর ছেঁদাটি কখনো খুব মেলে কখনো একেবারেই বুজে যায়।

এখন কথা হচ্ছে গাছ কি কি খাবার মাটি থেকে নেয়, আর কি কি খাবার বাতাস থেকে?—এ জান্‌তে হলে আগে দেখ্‌তে হবে গাছের সবসুদ্ধ খাবার ক'টা,—ক'টা জিনিষ নাহলে তার মোটেই চলে না।

পণ্ডিতরা একটা গাছকে পুড়িয়ে ফেল্‌লেন। তারপর তার ছাই আর ধোঁয়া যাচাই করে বের করলেন যে, গাছের শরীরে সবসুদ্ধ দশটা জিনিষ পাওয়া যায়—লোহা, বালি, গন্ধক, ক্যাল্‌সিয়ম্, পটাসিয়ম্, ফস্ফরস্, বাষ্প, বিষগ্যাস, নাইট্রোজেন (বেমিশুক গ্যাস)। এই থেকে বোঝা গেল যে, এই দশটা জিনিষই গাছের খাবার—এই খেয়েই সে বাঁচে। কিন্তু দশটা জিনিষের মধ্যে সাতটা শক্ত জিনিষ, আর তিনটে গ্যাস। শক্ত জিনিষগুলো মাটিতেই থাকে—জল আর এ্যাসিডে গুলে নিয়ে শিকড় দিয়ে গাছ সেগুলোকে টানে। গ্যাস তিনটে খুব সম্ভব হাওয়া থেকেই গাছ পাতা দিয়ে টেনে নেয়।

এই না ঠিক করে পণ্ডিতরা একটা গাছকে এমন মাটিতে বসিয়ে দিলেন, যাতে ঐ সাতটা শক্ত জিনিষ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। কিন্তু আশ্চর্য্য! গাছটা বাঁচলো না। তখন তাঁরা বুঝলেন যে, গ্যাস তিনটেরও সবগুলোই গাছ বাতাস থেকে নেয় না। অনেক দেখে শুনে যাচাই করে শেষকালে বের করলেন যে, বাষ্প আর নাইট্রোজেন গাছ মাটি থেকে নেয়—কেবল বিষগ্যাস নেয় বাতাস থেকে।

বাষ্প আর জল একই জিনিষ। গাছের শরীরে কিন্তু বাষ্প থাকে

না, জলই থাকে ; পোড়ালে জলটা বাষ্প হয়ে যায় মাত্র। কাজেই পাতা দিয়ে হাওয়ার বাষ্প টেনে নিয়ে তাকে আবার জল করে গলিয়ে নেওয়ার চেয়ে, গাছ শিকড় দিয়ে মাটির জলই টেনে নেয় ; তাকে ত শক্ত খাবার জল দিয়ে গুলতেই হয়।

কিন্তু নাইট্রোজেন গাছ মাটি থেকে নেয় কেন? বাতাসে এত নাইট্রোজেন থাক্‌তে, মাটির দানার ফাঁকে ফাঁকে যে অল্প নাইট্রোজেন আছে, তাই সে ধরতে যায় কেন? এ যে এক গলা জলে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে উপর দিকে চেয়ে থাকা।

এর একটু মানে আছে। গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন নেয় বটে কিন্তু সে খাঁটি নাইট্রোজেন নয়। খাঁটি নাইট্রোজেন সে নিতেই পারে না। তা যদি নিতে পারবে, তাহলে বাতাস থেকেই নিতো। সে নিতে পারে মিশাল নাইট্রোজেন—অর্থাৎ নাইট্রোজেন যখন অন্য কোন জিনিষের সঙ্গে মিশে শক্ত মিশাল জিনিষ * (নাইট্রেট্) হয়। মাটিতে খাঁটি নাইট্রোজেনও আছে, নাইট্রেটও আছে; কিন্তু বাতাসে ত

* দুটো তিনটে জিনিষ একসঙ্গে মিশ্‌লেই যে তা মিশাল জিনিষ হয়, তা নয়। সেই দুটো তিনটে জিনিষ যদি এম্‌নি ভাবে মেশে যে একটা আন্‌কোরা আলাদা জিনিষ হয়, তাহলেই তাকে মিশাল জিনিষ বলে। প্রাণগ্যাস আর হাল্কা গ্যাস যদি আলগোচে মিশে থাকে, যেমন বাতাসে আছে, তাহলে তাকে মিশাল জিনিষ বলবো না। কিন্তু যখন ঐ দুটো গ্যাস মিশে জল হয়, তখনই তারা একটা মিশাল জিনিষ। এম্‌নি নাইট্রোজেন আর পটাসিয়ম্ মিশে যে মিশাল জিনিষ তৈরী হয় তার নাম সোরা; লোহা আর গন্ধক মিশে যে মিশাল জিনিষ তৈরী হয় তার নাম হিরেকষ; ক্যাল্‌সিয়াম্ আর প্রাণগ্যাস মিশে যে মিশাল জিনিষ তৈরী হয় তার নাম চূণ।

আর নাইট্রেট্ নেই। কাজেই গাছ মাটি থেকে নাইট্রেট্টুকু নিয়েই তার নাইট্রোজেনের খাঁক্তি মেটায়।

মাটিতেও যে নাইট্রেট্ খুব বেশী আছে, তা নয়। তাই অনেক গাছ তাদের শিকড়ের চারপাশের মাটিতে নাইট্রেট তৈরী করে নেবার এক ফন্দী বের করেছে। তারা দেখেছে যে, অনুগাছড়াদের সেই ক্ষমতা আছে, যা কোন গাছের নেই;—তারা খাঁটি নাইট্রোজেনকে ধরে অন্য জিনিষের সঙ্গে মিশিয়ে নাইট্রেট তৈরী করতে পারে। তাই ঐ সব চালাক গাছেরা * তাদের শিকড়ে কতকগুলো ভাল অনু-গাছড়াকে বাসা বেঁধে থাকতে দেয়। তাদের শিকড় তুলে দেখ্লে, দেখ্বে তার গায়ে কতকগুলো আবের মত গ্যাঁজ। ঐ গ্যাঁজই অনুগাছড়াদের ঘর-বাড়ী। অনুগাছড়ারা নাইট্রেট তৈরী ক'রে মাটিতে মজুত করে, আর গাছ সেই উপকারের বদলে নিজের শিকড়ের গা থেকে এক রকম মিষ্টি রস বের করে তাদের খেতে দেয়।

গাছের যে সাতটা শক্ত খাবারের কথা বলেছি, তা ও অন্য জিনিষের সঙ্গে মিশাল না করে গাছ খেতে পারে না; কেন জান? ও জিনিষগুলো নাহলে জলেও গোলে না, এ্যাসিডেও গলে না। আর শিকড় এক জলের মত জিনিষই চুমুক দিয়ে টেনে নিতে পারে।

---

* যত ভাল জাতের গাছ আছে, তাহা সকলেই খুব চালাক—তারা সকলেই অনুগাছড়াকে দিয়ে নাইট্রেট তৈরী করিয়ে নেয়। যতটা নাইট্রেট তৈরী হয়, তার সবটাই কিছু গাছ খেয়ে উঠ্তে পারে না, অনেকখানি মাটিতে থেকে যায়। তাই চাষারা ধান, পাট, এইরকম সব ফসল ফলাবার পর জমিকে ভাল করবার জন্য মুগ, কড়াই, ছোলা, শোন্, ধঞ্চে, সীম, চীনে বাদাম, এইরকম সব ফসল বুনে দেয়।

ধর গন্ধক, জলেও গোলে না, এ্যাসিডেও গলানো শক্ত। কিন্তু তাঁবার সঙ্গে গন্ধক মিশ্‌লে যে মিশাল জিনিষ তৈরী হয়, সেই তুঁতে এ্যাসিডে ত গলেই, জলেও খানিকটে গোলে। গাছ চায় বটে গন্ধক, কিন্তু চায় তুঁতের মত কোন একটা জিনিষের ভিতর দিয়ে। তুঁতের ভিতর যে তাঁবাটা আছে, সেটা মোটেই গাছের দরকারে লাগে না। সেটা মিথ্যাই গাছকে বাধ্য হয়ে নিতে হয়। কিন্তু সেটা যদি তাঁবা না হয়ে লোহা হতো, তাহলে এককাজে দুকাজ হতো— কেন না লোহা আর গন্ধক দুইই গাছের খাবার। কাজেই লোহা আর গন্ধক মিশে যদি কোন মিশাল জিনিষ হয়, সেটাকে গাছ আগে পছন্দ করবে।

এখন লোহা আর গন্ধক মিলে সত্যই একটা মিশাল জিনিষ হয়, তার নাম হীরেকষ। কাজেই হীরেকষ আর তুঁতে দুই-ই যদি কোন মাটিতে পাশাপাশি থাকে, গাছ হীরেকষটাকেই গুলে নিয়ে টানবে, তুঁতেকে নয়।

গাছের সাতটি শক্ত খাবার, যদি বাইরের কোন জিনিষে না মিশে নিজেরা নিজেরাই মিশে মিশাল জিনিষ হয়, তাহলে সেই মিশাল জিনিষই হয় গাছের সব চেয়ে সুবিধার খাবার; কিন্তু ততটা সুবিধা আর কোন গাছের ভাগ্যেই ঘটে না।

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক
ও
জ্যোতি বাচস্পতি।

ভারতবর্ষে।

(সিংহল হতে নেপাল)

৫।

পাঠন, দর্শন, আলাপন।

[মাদাম লেভির ফরাসী হইতে পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৭ ডিসেম্বর। প্রতিদিনই নতুন নতুন অভ্যাগত সঙ্গে নিয়ে দিন আসে, দিন যায়। * * * * *

সকালে উঠতে না উঠতেই আগন্তুক এসে হাজির। এখানে ত ঘণ্টাও নেই, বন্ধ দরজাও নেই, তাই শানের মেঝের উপর খালি পায়ের খস্‌খসানিতেই তাদের আসা বোঝা যায়। এইবার এলেন মহাথেরা, এখানকার চারটি বৌদ্ধ ভিক্ষুবাসিদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বয়সে বড়। এসিয়ার অভ্যন্তরে যে বিখ্যাত কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া গেছে, ইনি সেগুলি দেখতে চান। "আমাদের ভগবান বুদ্ধের বাণী তবে অত দূরে গিয়ে পৌঁচেছে"—বলে' তিনি আশ্চর্য্য প্রকাশ করলেন, অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর গেরুয়া কাপড়, খোলা কাঁধ ও কালো ছাতা, সব সুদ্ধ মিলে এক অভিনব ছায়াচিত্র সৃষ্টি করেছিল। * * * * *

অবশেষে আশ্রমের ছাত্র এবং অধ্যাপকের চারজন প্রতিনিধি এলেন, আজ সন্ধ্যার সময় একটা মস্ত সভায় আমাদের নিমন্ত্রণ করতে। আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে উৎসব করাই তার

উদ্দেশ্য; সে ঘটনায় সকলের মনে অতি উচ্চ আশার সঞ্চার হয়েছে। এই যুবকরা যে সাঁওতাল গ্রামের ছেলেদের পুষ্যি নিয়েছেন, তাঁদেরও এই উপলক্ষ্যে খাওয়ানো হবে। এঁরা সেখানে একটি স্কুল করেছেন, তার শিক্ষকের মাহিনা দেন; সে স্কুলের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত এমন কি "অস্পৃশ্য"দের জন্যও,—কি ভীষণ কথা!

আমরা সকালের এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব, এমন সময় কোন এক কারণে বাধা পড়ল। ঠাকুরমশায় সাবধানী লোক, এই উৎসব অনুষ্ঠানের আগে তিনি জানতে চান ঠিক কিরকম স্বাধীনতা ইংলণ্ড আয়র্লণ্ডকে দিয়েছে। তাই কিছুদিন অপেক্ষা করাই শ্রেয় বোধ করেন।

কিন্তু সাঁওতাল বাচ্ছাদের ভোজ ঠিকই দেওয়া হয়। সুন্দর চাঁদের আলোয়, চক্রাকারে মাটিতে উপুড় হয়ে বসে বেচারা ছেলেগুলি নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগ্‌ল। কতকগুলি ছিল খুব ছোট, বয়সে চার বছরেরও কম, পরণে প্রায় কিছুই নেই, তারা শীতে কাঁপছিল, কারণ সন্ধ্যার হাওয়া আমাদেরই পক্ষে ঠাণ্ডা, তাদের পক্ষে ত কন্‌ক'নে হবার কথা। তাদের গায়ে যে ছেঁড়া ন্যাকড়া ছিল সেগুল আমি কোন রকমে টেনেটুনে কাঁধের উপর ঢেকে দিতে লাগলুম। ভারতবর্ষের চাষাদের এই দুরবস্থা না দেখলে প্রত্যয় হয় না। এখানে একজন লোক যদি তার পরিবারকে দিনের মধ্যে এক বেলা পেট ভরে' খেতে দিতে পারে ত তার অবস্থা ভাল, এমন কি সচ্ছলও বলা যেতে পারে। পাশের একটা গ্রাম, যেখানে "অস্পৃশ্য"রা থাকে (অর্থাৎ যারা পারিয়া, অন্ত্যজ এবং একঘরে) সেখানে গত বৎসর শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা ষাট পেরিয়ে গিয়েছিল।

দিন মজুরী হচ্ছে মোটামুটি পাঁচ আনা প্রায় পাঁচ পেনি, এরা অনাহারে মারা যাচ্ছে।

ওদিকে দেশের হাওয়ায় ঝড়ের লক্ষণ ও রাজনৈতিক মনোমালিন্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে; বৈলাতিক রাজকুমারের আগমনে দেশবাসী বিষম ক্রুদ্ধ। যা কিছু বিলাতী, জিনিষ হোক্ মানুষ হোক্, সকলের বিরুদ্ধে এ যেন এক অসাধারণ উত্তেজনা, এক উদ্দাম উন্মুক্ত উচ্ছৃঙ্খল প্ররোচনা। শুনলেও বিশ্বাস হয় না, এমনই অভূতপূর্ব্ব সেই ব্যাপার যে, এই ভীরু রমণী, যারা সবেমাত্র পরদা থেকে বেরিয়েছে, তারা নাকি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে দোকানীদের দোকান বন্ধ করতে বল্‌ছে, রীতিমত ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করছে। যেদিন রাত্রে একজন মহামান্য লোকের ওখানে বিশিষ্ট হিন্দু মহোদয়দের ও উচ্চ কর্ম্মচারীদের এক ভোজ ছিল, সেই দিনই না কি এই কর্ম্মপন্থীর একজন নেতার স্ত্রী মেয়ে ও বোন পুলিশে ধরা দিয়েছেন। প্রথমে কেউ কথাটা বিশ্বাস করতে চায় না, এমনই মনের অবস্থা ছিল শেষে যখন খবর খাঁটি বলে' জানা গেল, তখন একজন নিমন্ত্রিত উঠে চলে' গেলেন। বন্দিনীদের আটক রাখতে সাহস হল না, তাঁদের সাবধান করে' দিয়ে মুক্তি দেবার প্রস্তাব করা হল; তাঁরা তা'তে নারাজ হলেন; তবু তাঁদের এই বলে' ছেড়ে দেওয়া হল', যে ভবিষ্যতে আরও কড়াকড়ি করা হবে। তৎক্ষণাৎ, পুলিশের চোখের সামনেই, তারা আবার কার্য্যারম্ভ করলেন, সেই সঙ্গে হাজার হাজার যুবক, বারো বৎসরের বালক পর্য্যন্ত যোগ দিলে। এ যেন আত্মত্যাগের এক নেশা, এক পাগলামী। সঙ্গে সঙ্গে চাষাভূষোর প্রতি এক বিপুল দয়ার উদ্রেক

হয়েছে; রুশদেশীয় বিদ্বান যুবজন যেমন এক সময় লোকসাধারণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সেইভাবের পন্থা অবলম্বন করে' এখানে এরই মধ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সমবায় কৃষকসমিতি স্থাপিত হয়েছে, যাতে করে হতভাগ্য অশিক্ষিত চাষাদের সর্ব্বনাশ ও উপবাসের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

রবিবারের দুই বক্তৃতার অবকাশে ঠাকুরমহাশয়ের ছেলেদের ওখানে আমাদের এক সুন্দর হিন্দুভোজ হল; সবই হিন্দু মতের, কেবল আমাদের ভোজনপাত্র ছাড়া। মাটির উপর সেকালের প্রথামত প্র—সুচারু নক্সা বা শুভ আল্‌পনা এঁকে ছিল। আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বসবার ছোট গাল্‌চে ও সামনে একখানি করে নীচু টেবিল ছিল। একটা বড় থালার উপর ছিল ভাত, বাঙ্গলা দেশের উত্তম মাছ, এবং অনেক ভাল ভাল জিনিষ, যা' আমার অপরিচিত। পানীয়ের মধ্যে ছিল সুন্দর গোলাপগন্ধ জল। আর আহারান্তে সুগন্ধ মিষ্টান্ন, যা' মুখে দিলে মিলিয়ে যায়;—রীতিমত এক আরব্য উপন্যাসের ভোজ। * * * * *

কলকাতার দু'টি ছাত্র এসে উপস্থিত, দু'জনেই ডাক্তার, তারা রাবিবাসরিক বক্তৃতা শুনতে এসেছে, এবং ফিরে যাবার আগে এই ফরাসী অধ্যাপককে দেখে যেতে চায়, যিনি ভারতবর্ষের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমরা নিজেরাই শীঘ্র কলকাতা যাব। আগে মনে করে ছিলুম যোড়াসাঁকোয় গিয়ে উঠব,—কবিবরের সেই পৈতৃক সেকেলে বাড়ীতে, যেখানে আমাদের প্রথম আগমনে এমন মনোহর আদর আপ্যায়ন পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু সে কল্পনা ত্যাগ করতে হল। এই ভীষণ বিক্ষোভের সময় আমাদের সহরের মাঝখানে বাস করা

ঠাকুরমশায় নিরাপদ মনে করেন না; তাঁর ভয় হয় পাছে আমরা কোন রকম দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে' যাই। কলকাতা এখন যুদ্ধক্ষেত্র; তাই তিনি তাঁর কোন প্রিয় আত্মীয়ের বাড়ীতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। * * * * *

এদেশে সদাসর্ব্বদাই জন্তুজানোয়ার ও গাছপালা সম্বন্ধে সতর্ক থেকে লড়ালড়ি করে' নিজেকে রক্ষা করে' চলতে হয়। কোথায় যে প্রাণী জগত শেষ হয় ও বৃক্ষ জগত আরম্ভ হয় তাও ঠাওরানো মুস্কিল। এখানে প্রকৃতির যুদ্ধং দেহী রূপ দেখে ভয় হয়। এক জাতের বটগাছ আছে, যার শিকড় হাতের মত ছড়াতে থাকে; একরকম গাছ আছে যা দেখলে মনে হয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মুরগীর খাবার উপর দাঁড়িয়ে আছে; অন্যান্য গাছ যেমন মাটিতে octopus অজগর বা অষ্টাবক্রের মত লুটিয়ে যায়; কোন পাতা করাতের মত, কোন পাতা বা তলোয়ারের মত; তা' ছাড়া পোকার মত পাতা, পিঁপড়ে-খেকো গাছ; লজ্জাবতী লতা,—যার পাতা কেবল আঙ্গুল এগিয়ে দিলেই মুসড়ে যায়,—আর সেই যে কাঁটাগুল কাপড়ের মধ্যে বিঁধে যায়।

আজ সারাদিনই বক্তৃতা, কাজ, দেখাসাক্ষাৎ; অবশেষে কবিবর তাঁর ফরাসী অধ্যাপককে বল্লেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হবে, তাতে খুব ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষীয় শিক্ষার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করে' দিতে। ভারতবর্ষেই বসে' করবার বেশ উপযুক্ত কাজ বটে।

(ক্রমশঃ)

দশম বর্ষ, মাঘ, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অভিভাষণ।

(দিল্লী প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত)

—০:*:০—

চিঠি লিখতে বসলেই, সর্ব্বাগ্রে তার পাঠ লিখতে হয়। এ পাঠ অবশ্য নিজে রচনা করতে হয় না। তা পূর্ব্ব থেকেই সমাজ-কর্ত্তৃক রচিত হয়ে রয়েছে, সেই বিধিবদ্ধ বাক্যসমূহ আমরা নির্ব্বিচারে মুখস্থ করে পত্রস্থ করি। এ পাঠ অবশ্য সকল ভাষায় সকল সমাজে এক নয়। দেশভেদে, কালভেদে, সম্প্রদায়ভেদে, পত্রের মুখপত্র নানা আকার, নানা রূপ ধারণ করে।

কিন্তু এ সকলের বাহ্য আকারে যে প্রভেদই থাকুক না কেন, সকলেরই বক্তব্য এক। সকলেরই উদ্দেশ্য লেখকের হীনতা ও দীনতা প্রকাশ করা। যিনি যে ভাষাই ব্যবহার করুন, যতই না কেন শ্রুতিমধুর বাক্য প্রয়োগ করুন, সকল পাঠেরই নির্গলিতার্থ হচ্ছে "সবিনয় নিবেদন"। অর্থাৎ নিবেদনটা আসে পরে, তার আগে আসে বিনয়,—এই আশায় যে, লেখকের নিবেদনটা যদিও পাঠকের মনঃপূত না হয়, বিনয়টুকু ত হবেই। বিনয় ঘুস্ দিয়ে পাঠকের মেজাজ খুস্ করাই এর ধর্ম্ম।

বক্তৃতা অর্থাৎ লোক-সমাজে মৌখিক নিবেদনটাও এই একই নিয়মের অধীন। সভামাত্রেরই সভাপতির পক্ষে প্রথমেই বিনয় প্রকাশ করাটা একটা অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এবং এ কর্ত্তব্য পালন করবার উপযুক্ত বাঁধিগতেরও সৃষ্টি হয়েছে।

সভাপতিকে কার্য্যানক্ক আগে এই কথা বলে মুখ খুলতে হয় যে, তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করবার যোগ্যপাত্র নন। আমি কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত মামুলি বিনয়ের অভিনয় করতে পরাঙ্মুখ। ও হচ্ছে আসলে বৃথা বাক্যব্যয়। যে কথা একশ'বার শুনেছি, সে কথা আবার শুনলে শ্রোতার তা এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, তার মরমে প্রবেশ করে না। যুগ যুগ ধরে পুনরুক্তির ফলে কথামাত্রেই কথার কথা হয়ে যায়।

তা ছাড়া এ জ্ঞান আমার আছে যে, আমার মত সাহিত্যিকের মুখে বিনয় শোভা পায় না, শোভা পায় শুধু সাহিত্যরাজ্যের রাজা-রাজড়াদের মুখে। এর একটি ক্লাসিক্ উদাহরণ দিচ্ছি। কালিদাস রঘুবংশের প্রথমেই লিখেছেন—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যামুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

অর্থাৎ—আমি মূঢ় কবিযশপ্রার্থী হয়ে হাস্যাস্পদ হব, কেননা আমার পক্ষে এ প্রয়াস বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার মত।

পূর্ব্বোক্ত উক্তি হচ্ছে সাহিত্যিক বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু এ কথা কালিদাস কখন্ বলেছিলেন?—যখন তিনি সেকালের বিদগ্ধ-মণ্ডলীর কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হয়েছিলেন। রঘুবংশ কালিদাসের শেষ কাব্য। মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ রচয়িতার মুখে এ বিনয় শোভা পায়। কে না জানে যে, বড়লোক দুটি হেসে কথা কইলেই আমরা মুগ্ধ হই। আভি-জাত্যের সঙ্গে সৌজন্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কিম্বদন্তি এই কাল্পনিক

ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অপরপক্ষে কালিদাস তাঁর প্রথম কাব্যে যে আত্মপরিচয় দেন, তার ভিতর বিনয় নেই—যদি কিছু থাকে ত আছে স্পর্দ্ধা। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রথমেই তিনি সূত্রধারের মুখ দিয়ে সভাসদ্‌দের শুনিয়ে দিয়েছেন যে—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং।
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম॥
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে।
মূঢ় পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি॥"

অর্থাৎ—কাব্য পুরাতন বলেই সাধু হয় না, আর নূতন বলেই গর্হিত হয় না। সাধু ব্যক্তিরা কাব্যের নূতনত্ব প্রাচীনত্ব নয়, তার গুণাগুণ পরীক্ষা করেই তার ভজনা করেন। কেবল মূঢ় ব্যক্তিরাই পরের মুখে ঝাল খায়।

কালিদাসের প্রথম বয়েসের ও তাঁর শেষ বয়েসের উক্তি দুটির উল্লেখ করলুম এই সত্যের পরিচয় দেবার জন্যে যে, বড় লেখকের মুখে বিনয় যেমন ভূষণ, নবীন লেখকের মুখে স্পর্দ্ধাও তেমনি অস্ত্র। কিন্তু যে নবীন লেখকও নয় বড় লেখকও নয়, তার মুখে ও দুইয়ের কোনটিই শোভা পায় না। যেহেতু লেখায় আমার হাতে খড়ি কাল হয় নি, আর আজও পাকা লেখক হয়ে উঠিনি, সে-কারণ আমার পক্ষে আমার সাহিত্যিক গুণাগুণ সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। তা ছাড়া যখন ভোটের প্রসাদে এ পদ লাভ করেছি, তখন আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচারসহ নয়। ইলেক্‌সন্ জিনিষটিই ত যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের অভ্রান্ত বিলেতি কল।

(২)

আমি যে আপনাদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে মহা আনন্দিত হয়েছি, তার প্রমাণ আপনাদের আহ্বানে আমি দ্বিধা না করে একটানা ন'শ' মাইল পথ অতিক্রম করে এ সভায় এসে উপস্থিত হয়েছি। এরকম দেশভ্রমণ আমার পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নয়। আমি আমার বন্ধু শ্রীমান দিলীপকুমার রায়ের মত ভ্রাম্যমান নই, অপরপক্ষে আমি হচ্ছি বাঙলায় যাকে বলে কুণো লোক। এমন কি কলকাতা সহরেও, ঘর ছেড়ে সভা-সমিতিতে উপস্থিত হতে আমি স্বতঃই নারাজ। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকাই আমার বদ্ধমূল অভ্যাস। আর এই এক-ঘরে হয়ে থাক্‌বার যুগসঞ্চিত অভ্যাস এখন স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া আমার এখন দেহের কলকব্জা সব ঢিলে হয়ে এসেছে। আমি যে এই বিকল দেহযন্ত্রটাকে ফিন্‌ফিনে গরমের দেশ থেকে কন্‌কনে শীতের দেশে টেনে নিয়ে এসেছি, সে দিল্লীর টানে নয়, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের টানে।

এই দিল্লী সহরটার সঙ্গে আমার মনের নাড়ীর কোনও যোগ নেই। দিল্লী সাহিত্যের রাজধানী নয়। অন্ততঃ যে সব ভাষার সঙ্গে আমি পরিচিত, সে সব ভাষার সাহিত্যের ত নয়ই। আমি যদি সাহিত্যিক না হয়ে ঐতিহাসিক হতুম, তাহলে অবশ্য এ সহরের মায়ায় চির আবদ্ধ হয়ে পড়তুম। গত হাজার বৎসরের ইতিহাস নামক ট্র্যাজেডি এ নগরীর পৃষ্ঠে খোদিত পাষাণের আরক্ত অক্ষরে লিখিত রয়েছে। এ সহরের আবেদন লোকের কানের কাছে নয়, চোখের কাছে। Archæologist-দের কাছে, অর্থাৎ যাঁরা পাষাণের পেটের কথা জানেন তাঁদের কাছে, দিল্লী সহর একটি বিরাট প্রস্তর-

লিপি। সে লিপি আমার কাছে আরবী ও ফার্সি হরফের মতই অপরিচিত। আমি যখনই দিল্লীর সম্মুখস্থ হই, তখনই শুনতে পাই যে এখানকার গম্বুজে, মস্‌জিদে, মিনারে, কবরে, শতমুখে একটিমাত্র বাণী ঘোষণা করছে; আর সে বাণী এই—Vanity of vanities, all is vanity।

এ বাণীর উপর একালের সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা এ সত্যের প্রতি বিমুখ হয়েই অগ্রসর হতে চাই। তাই মানুষের বিরাট অহঙ্কারের এই স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে আমাদের সরস্বতী ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। বাঙলা দেশে আমার নিজ হাতে গড়া এবং হাতধরা জনৈক সাহিত্যিক আছেন, যিনি এখানে এলে সম্ভবত নানাবিধ পূর্ব্বস্মৃতিতে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু তাঁকে আমি সঙ্গে আনতে পারিনি—তিনি অনিমন্ত্রিত বলে। তাঁর নাম হচ্ছে বীরবল।

(৩)

আমি যে আপনাদের ডাক শুনে এখানে ছুটে এসেছি, সে কেবল বিদেশে বঙ্গ-সরস্বতীর পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্য, এবং তাঁর উৎসবে যোগদান করবার জন্য। বাঙলা সাহিত্যের লম্বা ইতিহাস আমাদের পিছনে পড়ে নেই—পড়ে আছে আমাদের সুমুখে। এ সাহিত্যের স্মৃতিতে মগ্ন থাকবার সুযোগ আমাদের নেই, এর ভবিষ্যৎ নিয়েই আমাদের কারবার। কারণ বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দির আমাদের নিজহাতে কায়ক্লেশে গড়ে তুলতে হবে—আর তার জন্য চাই বহু শিল্পী এবং এ-যুগে বহু স্বেচ্ছাসেবক। যেমন পুরা-কালের ধর্ম্ম-মন্দির সব ভক্তের দল গড়ে তুলেছে, এ যুগের

সরস্বতীর মন্দিরও তাঁরাই গড়ে তুলবেন, যাঁদের বাঙলা-ভাষা ও বাঙলা-সাহিত্যের প্রতি পরাপ্রীতি অর্থাৎ অহৈতুকী প্রীতি আছে। বঙ্গ-সাহিত্যের ভাবী উন্নতি ও ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল রূপ আমি কল্পনার চক্ষে বরাবরই দেখে আস্ছি। এ মন্দির অবশ্য মেঘরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। এর গোড়াপত্তন বাঙালীরা বঙ্গভাষার জমিতেই করেছে। সুতরাং একে সুগঠিত করে তোলবার কোনই অন্তরায় নেই—একমাত্র আমাদের ঔদাসীন্য ব্যতীত। বহু লোকের মনে যদি এই নবভক্তি স্থান পেয়ে থাকে, তাহলে বঙ্গসাহিত্য যে অচিরে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করবে, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। এতদিন আমরা বাঙলাদেশে জনকতক মিলে এই সাধনায় ব্যাপৃত ছিলুম। বাঙলার বাইরেও যে বঙ্গ-সরস্বতীর এত ভক্ত আছে, দুদিন আগে সে জ্ঞান আমাদের ছিল না। আমার নিজের মনে একটা ধারণা ছিল যে, প্রবাসী-বাঙালীরা শুধু দেশ হিসেবে প্রবাসী হন নি, মনেও প্রবাসী হয়েছেন। এ ধারণার মূলে একটি ছোট্ট ঘটনা আছে। কত ছোটখাটো ঘটনার বীজ থেকে কত বড় বড় ভুল ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়, তারই পরিচয় দেবার জন্য এই ভুল ধারণার মূলস্বরূপ একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনার উল্লেখ করছি।

(৪)

এ ঘটনা এতদিন পূর্ব্বে ঘটেছিল যে, সেটিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে একদিন একটি ভারতবর্ষীয় যুবকের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনিও বিদ্যার্থী হিসেবেই সে দেশে গিয়েছিলেন,

আর আমরা দুজনেই একই বিদ্যা অর্জ্জন করতে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলুম। তাঁর নামরূপের পরিচয় থেকে বুঝলুম যে, তিনি আমারই স্বজাতি—অর্থাৎ বাঙালী। তিনি যে বাঙালী নন, এমন ভুল করা কোনও বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব ছিল; কারণ তাঁর দেহ-যন্ত্রটি মামুলি বাঙালী ছাঁচেই ঢালাই করা হয়েছিল। সে মূর্ত্তির রেখা ও বর্ণ আমাদের অনুরূপই ছিল। প্রথম প্রথম আমরা উভয়ে ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন আরম্ভ করি—কারণ অপরের কাছে শুনেছিলুম যে, তিনি বাঙালী হলেও একজন প্রবাসী-বাঙালী। শেষটা তাঁকে মুখফুটে বাঙলায় জিজ্ঞাসা করলুম—"আপনি বাঙলা জানেন?"—তিনি হেসে উত্তর দিলেন, "সে হামি ভাল জানি"। বলা বাহুল্য যে, এ উত্তর শুনে আমি একটু চম্‌কে উঠেছিলুম। তাঁর মুখের "ভাল জানি" কথাটা আমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রাহ্য করতে অবশ্য পারিনি। আমি শুধু ভাবতে লাগলুম—দন্ত্য "স" সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারণ করলে, আমাদের কানে তা এত বিসদৃশ ঠেকে কেন? শেষটা বুঝলুম সংস্কৃত শব্দ বাঙলার মত উচ্চারণ করলে তা যেমন অসংস্কৃত হয়, বাঙলা শব্দও সংস্কৃতের মত উচ্চারণ করলে তাদৃশ অ-বাঙলা হয়। কিন্তু "আমি" যে কি করে "হামি"তে রূপান্তরিত হয়, স্বরবর্ণের আদি অক্ষর কি ফিকিরে ব্যঞ্জন-বর্ণের শেষ অক্ষরে পরিণত হয়, তার হদিস্ আমি দুদিন আগে পাইনি। সে যাই হোক, এই নব-পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে বাঙলা ভাষায় আলাপ এক কথাতেই বন্ধ হল। অতঃপর উভয়েই ইংরাজী ভাষার আশ্রয় নিলুম। কারণ ও ভাষায় আমাদের উভয়েরই জবান যখন সমান দুরস্ত, দুজনেই যখন ইংরাজী ব্যাকরণ ও উচ্চারণের শ্রাদ্ধ করছি, তখন

ক্কার ভুল কে ধরবে। আমাদের সদ্য-কল্পিত লাট-দরবারের বক্তারা কি কেউ কারও ইংরাজীর খুঁত ধরে?

(৫)

সেই থেকেই আমি ধরে নিই যে, প্রবাসী-বাঙালীর মুখের বাঙলা আমাদের মুখের হিন্দীর অনুরূপ। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, হিন্দী আমরা একদম শিখিনি, অপরপক্ষে প্রবাসী-বাঙালীরা বাঙলা একদম ভোলেননি। ফলে হিন্দী-সাহিত্যের আদর আমাদের কাছে যদ্রূপ, বাঙলা-সাহিত্যের আদর তাঁদের কাছেও তদ্রূপ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংগৃহীত আমার উক্ত ধারণা বিংশ শতাব্দীতে যে সম্পূর্ণ অচল, সে সত্যের পরিচয় আমি বছর পাঁচছয় আগে পাই। আমার সেই বিলাত-প্রবাসী বাঙালী বন্ধুটি সে যুগের প্রবাসী-বাঙালীর একটি খাঁটি নমুনা কি না জানিনে; যদি হন তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে প্রবাসী-বাঙালীদের মনোরাজ্যে যুগান্তর ঘটেছে। এমন কি আমার সময়ে সময়ে এ সন্দেহ হয় যে, আপনাদের কাছে বঙ্গ-সাহিত্যের যতটা আদর আছে, বাঙলাদেশে ততটা নেই। জানিনে এ কথা ঠিক কিনা; কিন্তু এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, আপনারা যে উৎসাহের সঙ্গে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করছেন, তা যথার্থই অপূর্ব্ব। আর এক কথা, আপনারা এ যুগের বাঙলা-সাহিত্যকে যতটা আমল দিতে প্রস্তুত, বাঙলার লোকে সম্ভবতঃ ততটা নয়। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ এই যে, মাদৃশ লেখককেও আপনারা সাহিত্যিক বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি।

(৬)

অবশ্য আজ থেকে বোধ হয় দশ বারো বৎসর আগে আমি উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির উচ্চ পদ লাভ করি। কিন্তু সে আসন গ্রহণ করে আমি নিজেকে তাদৃশ ধন্য মনে করিনি, আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করে যতদূর করছি। কারণ উত্তরবঙ্গ আমাকে যে এতাদৃশ সম্মানিত করেন, আমার বিশ্বাস তার ভিতর একটু অসাহিত্যিক কারণ ছিল।

উত্তরবঙ্গ হচ্ছে আমার স্বদেশ। সুতরাং সে সভার কর্ম্ম-কর্ত্তারা "দেশকো ভাই" বলে আমার প্রতি একটু পক্ষপাত যে দেখান নি, এমন কথা আমি জোর করে বলতে পারিনে। তৎ-সত্ত্বেও তাঁদের নিমন্ত্রণের ভিতর একটু কিন্তু ছিল।

আমাকে তাঁরা আমার অভিভাষণের গায়ে পোষাকী ভাষা পরিয়ে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য তাতে স্বীকৃত হই—এই ভয়ে যে, অসাধু ভাষায় লিখ্‌লে উত্তরবঙ্গ পাছে আমার প্রতি অদক্ষিণ হয়ে ওঠেন। লোকে লোক-লাঞ্ছনা মেরেকেটে একরকম সওয়া যায়, কিন্তু ঘরে গুরুগঞ্জনা অসহ্য। কাজেই সে অভিভাষণ আমি লিখে নিয়ে যেতে পারিনি, "তাহা আমাকে লিখিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল।" ফলে আমার বক্তব্য তাঁদের মনোমত হয়েছিল কিনা জানিনে, কিন্তু তা তাঁদের কর্ণশূল হয় নি।

সে যাই হোক, আপনারা যে আমাকে এখানে ভাষার সাধুবেশ ধারণ করে আসতে আদেশ করেন নি, এর জন্য আমি আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কারণ সাহিত্যরাজ্যেও বারবার বহুরূপী সাজাটা কষ্টকর না হলেও লজ্জাকর।

এ পুরাকাহিনী শোনাবার উদ্দেশ্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, আমরা যাকে নব-সাহিত্য বলি, তার ভাষারও একটু নবীনতা আছে। সাহিত্যের ভাষার এই মোড়-ফেরানোর ব্যাপারে আমার কতকটা হাত আছে, আর প্রধানত সেই হিসেবেই সাহিত্য-সমাজে আমি নিন্দিত ও প্রশংসিত—অর্থাৎ বিখ্যাত। আমাদের এ ভাষা চল্‌তি ভাষা বলেই পরিচিত। যখন এ ভাষাকে আমরা প্রথমে সাহিত্যে প্রমোশন দিই, তখন জনকতক বাঙলা সাহিত্যের দলপতি এবং তাঁদের দলবল মহা হৈ চৈ সুরু করেন এই বলে যে, – সাহিত্য গেল, সমাজ গেল, ধর্ম্ম গেল। "করিয়া" "করে" রূপ ধারণ করলেই, ক্রিয়াপদের লেজ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হলেই, সে লেজুড়ের শক্তি যে এতদূর প্রলয়ঙ্করী হয়ে ওঠে, এ কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। কোনও জিনিষেরই সৃষ্টি ও প্রলয় অত তড়িঘড়ি হয় না। কিন্তু সমালোচকের তাড়নায় আমরা পাঠকের মহামান্য উচ্চ আদালতে সাধুভাষা বনাম চল্‌তি ভাষার মামলা রুজু করতে বাধ্য হই। তারপর বছর পাঁচেক ধরে নানারূপ বৈজ্ঞানিক:অবৈজ্ঞানিক, দার্শনিক অদার্শনিক সওয়ালজবাবের ফলে এ ফেরা আমরা সে মামলায় জয়লাভ করেছি। তথাকথিত চল্‌তি বাঙলা এখন সাধুভাষার সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে এক পংক্তিতে বসবার অধিকার লাভ করেছে। যা আজ হয়েছে, তাকে ভাষার dyarchy বলা যেতে পারে। এতেই আমরা কৃতার্থ, কারণ সাধুভাষার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা আমরা আনিনি; শুধু চলতি বাঙলারও যে

সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার আছে, তাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলুম।

(৭)

আমাদের ভাষার অন্তরে যে নবীনতা আছে, তার প্রমাণ নবীনের দলই ছিলেন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আপনাদের ঘাড়ে গতানুগতিক মতামতের চাপ ততটা নেই, যতটা আছে আমাদের উপরে; কারণ বাইরে যেতে হলেই অনেক পৈতৃক আসবাবপত্র ঘরে ফেলে আস্তে হয়, মনের আসবাবপত্রও। সুতরাং আশা করছি যে—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং"

কালিদাসের এ উক্তির সত্যতা আপনারা যত সহজে হৃদয়ঙ্গম করবেন, যে-সব বাঙালীর কাছে "ঘর থেকে আঙিনা বিদেশ" তারা তত সহজে করবে না।

ভাষার গুণাগুণ প্রয়োগসাপেক্ষ। একটি উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোক বলে যে—বীণা বাণী অসি ও নারীর নিজস্ব কোনও গুণ নেই; যার হাতে তা পড়ে, তার উপরই তার গুণাগুণ নির্ভর করে। ও শ্লোকের অন্তর থেকে নারীকে সসম্মানে মুক্তি প্রদান করলে বাদবাকী কথা আমরাও নির্ভয়ে গ্রাহ্য করতে পারি,—বিশেষতঃ বাণী সম্বন্ধে। কারণ ভাষা জিনিষটি অসি হিসাবেও ব্যবহার করা যায়, বীণা হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। তা যে যায় তা তিনিই জানেন, যাঁর রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের পদ্য যাঁদের হৃদয় স্পর্শ করতে না পারে, তাঁর গদ্য হেলায় তাঁদের হৃদয় বিদ্ধ করতে পারে।

আসল কথা এই যে, সাধুভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তাঁরাও যে সর্গম নিয়ে কারবার করেন, আমরাও সেই সর্গম নিয়ে কারবার করি। প্রভেদ এই যে, সাধুভাষার অচল ঠাটের পরিবর্ত্তে আমরা সচল ঠাটের সাধনা করছি। তবে এ তর্ক যে বাঙলাদেশে উঠেছিল, সেটি এক হিসেবে আমাদের সৌভাগ্যের কথা। কারণ এ আলোচনার ফলে সকলেরই বঙ্গভাষার উপর দৃষ্টি পড়েছে; এবং ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁদের মাতৃভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়েছেন। যেমন বাঙলাদেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়েছেন।

(৮)

মাতৃভাষার মাহাত্ম্যের বিষয় আপনাদের কাছে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ আপনাদের সঙ্গে আমাদের মানসিক ঐক্যের প্রধান বন্ধনই ত এই ভাষার বন্ধন। ভাষাই হচ্ছে একটি জাতির পরস্পরের মনপ্রাণের অপৌরুষেয় যোগসূত্র। আমি অপৌরুষেয় বিশেষণটি ব্যবহার করছি এই কারণে যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পৃথিবীর কোন ভাষাই সৃষ্ট হয়নি, আমাদের ভাষাও হয়নি। একটা সমগ্র মানবসমাজ যুগ যুগ ধরে অলক্ষিতে একটা ভাষা গড়ে তোলে। সামাজিক মন যে ভাবে দিনের পর দিন গড়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাও তেমনি গড়ে উঠেছে। একটা জাতির মন যে কারণে যে উপায়ে সাকার হয়ে উঠেছে, সে জাতির ভাষাও সেই কারণে সেই উপায়ে সাকার

হয়ে উঠেছে। জাতির মন যখন একটি বিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে, তখনই তা সাহিত্যে বিকশিত হয়। সাহিত্যে দীক্ষিত হয়েই ভাষা তার দ্বিজন্মলাভ করে, অর্থাৎ দ্বিজ হয়। সাহিত্যের মূল উপাদান কি?—মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনা, কল্পনা কামনার চিত্রই ত সাহিত্য। যখনই একটি জাতির ভিতর সাহিত্যের দর্শন লাভ করা যায়, তখনই বুঝতে হবে সে জাতির মন আলোকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, ও তার অন্তরে আত্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ হয়েছে। কারণ সাহিত্য প্রবুদ্ধজ্ঞানেরই সৃষ্টি। মানুষের মন ও ভাষাকে দেশ ও কাল, দুজনে দু' হাত মিলিয়ে তৈরী করেছে। আমরা যদি কোন কারণে দেশের বন্ধন কাটাই, তাহলেও কালের বন্ধন ছিন্ন করতে পারিনে। মানুষ উদ্ভিদের মত জিও-গ্রাফির অধীন নয়; তার মন নামক জিনিষ আছে বলে' সে মুখ্যত হিষ্টরির অধীন। সে অধীনতা পাশ সম্পূর্ণ ছিন্ন করলে সে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা যাকে জাতীয়তা বলি, তার মূলভিত্তি ইতিহাসের গর্ভে নিহিত।

(৯)

রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্ব্বে এই বলে আক্ষেপ করেন যে,—"আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত, ভাষাতত্ত্ব, লোক-বিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এ পর্য্যন্ত বিদেশী পণ্ডিতেরা সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই।" আপনারা শুনে সুখী হবেন, বাঙালীরা তাদের ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে এখন আর উদাসীন নয়। সম্প্রতি আমার বন্ধু শ্রীমান সুনীতিকুমার চট্টো-

পাধ্যায়—"The Origin and Development of the Bengalee Language" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেছেন। এই বিরাট গ্রন্থের মালমসলা সংগ্রহ করতে এবং সেই উপাদান দিয়ে এই ইতিহাস রচনা করতে, একযুগ ধরে তাঁকে কি একান্ত, কি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা ভাবতে গেলেও আমাদের মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। এখানি ভাষাবিজ্ঞানের একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। বিজ্ঞানের একটা মস্ত গুণ এই যে, ও শাস্ত্র অনেক তর্কের একেবারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দেয়। এর একটি চমৎকার প্রমাণ আমি বহুকাল পূর্ব্বে পাই। জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডিত একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে—"চৌধুরী মশায়, এ কথা কি সত্য যে ইউরোপের পণ্ডিতরা সূর্য্যের পরিমাণ নির্ণয় করেছে"? আমি উত্তরে বল্লুম—"হাঁ, এ কথা আমিও শুনেছি"। এ উত্তর শুনে তিনি হেসে বল্লেন —"মূর্খের অসাধ্য কিছুই নেই, সূর্য্য যে প্রমেয় তাই প্রমাণ করবার আগে বেটারা সূর্য্যকে মেপে সারলে"। আমি মনে মনে বল্লুম —যখন তারা সূর্য্যকে মেপে সারা করেছে, তখন তা প্রমেয় কি অপ্রমেয় এ তর্কের আর অবসর নেই। তা ছাড়া সূর্য্য প্রমেয় কি অপ্রমেয় এই তর্কই যদি চালানো হত, তাহলে তার মাপ আর কখনই নেওয়া হত না; কেননা ও তর্কের আর শেষ নেই, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর ও চলতে পারে।

আমরা পাঁচজন সাহিত্যিক মিলে যে ভাষার তর্ক করেছি, সে কতকটা ঐ গোছের। চল্‌তি বাঙলা লিখিতব্য কি অলিখিতব্য, তাই নিয়ে আমরা বাক্‌বিতণ্ডায় ব্যাপৃত ছিলুম। শ্রীমান সুনীতি

এ তর্ককে খতম করে দিয়েছেন। তিনি বঙ্গভাষার যে পুরাতত্ত্ব আমাদের শুনিয়েছেন, তা আপনাদের সংক্ষেপে শোনাতে চাই। কারণ এ আশা আমি করতে পারিনে যে, ঐ দু' হাজার পাতার বই ধৈর্য্য ধরে আপনারা পড়ে উঠতে পারবেন। ওতে সব আছে। আমার সেই পুরোনো সমস্যা "অ" কি করে "ও" হয়, তার সন্ধানও এ পুস্তকে পাওয়া যায়। কিন্তু ভয় নেই, সে সব কথা আপনাদের বল্‌তে যাচ্ছিনে। আমি উক্ত গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক খোসা ছাড়িয়ে ও বীচি বেছে আপনাদের কাছে তার শাঁসটুকু শুধু ধরে দেব। আশা করি তা আপনাদের তাদৃশ মুখরোচক না হোক্, নিতান্ত কটুকষায় হবে না।

(১০)

সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে যাঁর চাক্ষুষ পরিচয় আছে, তিনিই লক্ষ্য করেছেন যে, ও নাটকের নায়কনায়িকা সকলেই সংস্কৃতে কথা কন্‌না, স্ত্রীশূদ্রের ওভাষায় অধিকার নেই। এর কারণ ও দেব-ভাষা আয়ত্ত করতে শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করতে হত। সে ক্লেশ যাঁরা করতে নারাজ ছিলেন, তাঁরা সেকালের প্রচলিত মৌখিক ভাষাতেই কথোপকথন করতেন। একালে স্ত্রীশূদ্রেরা যেমন ইংরাজী ভাষায় গুফ্‌তগু না করে দেশভাষাতেই কথাবার্ত্তা কয়। তবে একালে যেমন জনকতক বিদুষী মহিলা ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা করে তুলেছেন, সেকালেও তেমনি জনকতক বিদুষী মহিলা সংস্কৃত ভাষাকে সমান কণ্ঠস্থ করেছিলেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকারা রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করলে সংস্কৃত ছাড়া আর কিছু বলতেন না। মৌখিক ভাষা প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা বলে তার নাম হয়েছিল প্রাকৃত।

এই প্রাকৃত মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসবামাত্র ব্যাকরণের অষ্ট বন্ধনে পড়ে গেল, এবং আলঙ্কারিকদের কল্পিত বিধিনিষেধের অধীন হয়ে পড়ল। নাটক-কাররা অলঙ্কারের বিধি অনুসারে গদ্য রচনা করতে বাধ্য হলেন শৌরসেনী প্রাকৃতে, আর পদ্য রচনা করতে বাধ্য হলেন মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে। শৌরসেনী প্রাকৃত ছিল, যে দেশে এখন আমরা উপস্থিত, সেই দেশের সেকালের লৌকিক ভাষা। আর মহারাষ্ট্র ত অদ্যাবধি স্বনাম রক্ষা করে এসেছে। গদ্য কেন শৌরসেনীর দখলে এল, আর পদ্য মহারাষ্ট্রীর ?—সম্ভবত দিল্লী বক্তৃতার পীঠস্থান বলে, আর মহারাষ্ট্র গানের দেশ বলে। সে যাই হোক, এ দুই ছাড়া সংস্কৃত নাটকে আর একটি প্রাকৃতও আমাদের কর্ণগোচর হয়। চণ্ডাল, জল্লাদ, চোর, ধীবর প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর লোকের মুখে যে প্রাকৃত শোনা যায়, সে প্রাকৃতের নাম মাগধী প্রাকৃত। এই মাগধী প্রাকৃতই রূপান্তরিত হয়ে কালক্রমে বঙ্গভাষায় পরিণত হয়েছে। বঙ্গভাষার আর যে গুণই থাকুক, তার বংশ-মর্য্যাদা নেই। সে বড় ঘরের সন্তান নয়। আসলে খানদানি ভাষা হচ্ছে "ব্রজভাখা", কেন না সে ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের বংশধর। ব্রজভাখা যে সাহিত্যে মাথা তুলতে পারে নি, সে বিদেশী ভাষার বাদশাহী চাপে।

(১১)

প্রাকৃত হচ্ছে মৌখিক ভাষার লিখিত সংস্করণ, অর্থাৎ মুখের ভাষা পুঁথিগত হলেই তা হয় প্রাকৃত। ও হচ্ছে সেকালের সাধুভাষা। ভাষা মানুষের মুখে মুখে বদলে যায়। চলতি ভাষার

প্রধান গুণ অথবা দোষ এই যে, তা চলৎশক্তিরহিত নয়। অপর পক্ষে লিখিত ভাষা বাণীর গুরুপুরোহিতদের শাসনে বইয়ের মধ্যে জড়সড় ও আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে। সমাজ বদলায়, মানুষের মন বদলায়। কিন্তু পুঁথিগত প্রাকৃতের আর বদল নেই। কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, যে-প্রাকৃত এককালে মুখে মুখে চলত, সে প্রাকৃতও শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করে শিক্ষা করতে হয়।

মৌখিক প্রাকৃতের স্রোত কালের সঙ্গে বয়ে গিয়ে যখন নব রূপ ধারণ করে, তার নাম হয় তখন অপভ্রংশ। শৌরসেনী প্রাকৃত যেমন কালক্রমে শৌরসেনী অপভ্রংশে পরিণত হয়েছিল, মাগধী প্রাকৃতও তেমনি কালক্রমে মাগধী অপভ্রংশে পরিণত হয়েছিল।

মাগধী প্রাকৃত অবলীলাক্রমে তার রূপ পরিবর্তন করে, কেন না মাগধী প্রাকৃত কস্মিনকালেও লিখিত ভাষা হয়ে ওঠেনি। কেতাবী ভাষার চাপে তার মুক্ত গতি কখনই রুদ্ধ হয়নি। বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবশ্য মগধেই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্র মাগধী ভাষায় লিখিত নয়। পালি বেহারী ভাষা নয়—মালবের ভাষা। জৈনধর্ম্মের জন্মস্থানও ঐ অঞ্চলেই। কিন্তু জৈন শাস্ত্র যে ভাষায় লিখিত হয়েছে, সে ভাষা মাগধী নয়—অর্দ্ধ-মাগধী। অর্থাৎ তা কাশী-কোশলের ভাষা, আজকাল আমরা যাকে আউধের ভাষা বলি। মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপভ্রংশ যুগ যুগ ধরে সাহিত্যের পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। ফলে বহুকাল ধরে তা দেহাতি বুলি ও জেনানাবুলি রূপেই বিরাজ করছিল; শেষটা বাঙলায় এসে তা সাহিত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(১২)

এই মাগধী ভাষা বহুকাল যাবৎ আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্য-ভাষা, অর্থাৎ পূর্ব্ব অঞ্চলের ভাষা বলে পরিচিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌ৎ সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নিজ কানে শুনে গিয়েছেন যে, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এই তিন সুবায় একই ভাষা প্রচলিত ছিল।

শ্রীমান সুনীতিকুমার পুরোনো দলিলপত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করেছেন যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বঙ্গভাষা বেহারী ভাষা থেকে পৃথক হয়, এবং সেই শুভক্ষণে সে তার স্বাতন্ত্র্য লাভ করে; আর এতদিনে সে তার স্বরাজ্য লাভ করেছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা সেকেলে মহারাষ্ট্রী ভাষার মত পদ্যের দখলেই ছিল। মাত্র গত শতাব্দীতে গদ্য তাকে জবর দখল করে নিয়েছে। সংক্ষেপে আমাদের ভাষার বয়েস হাজার বৎসর, আমাদের গদ্য সাহিত্যের বয়েস একশ' বছর। এই ত হচ্ছে তার উৎপত্তির বিবরণ।

এখন তার প্রকৃতির পরিচয় নেওয়া যাক্। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, দেশভাষা মাত্রই মিশ্রভাষা, কেননা সে সব ভাষা তিনটি উপাদানে গঠিত। সে তিনটি উপাদান তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ ও দেশী শব্দ। যে সব সংস্কৃত শব্দ আমাদের ভাষায় স্বরূপে বিরাজ করছে, তারাই তৎসম, যথা—"বিবাহ"; যাদের চেহারা ফিরেছে, তারাই তদ্ভব, যথা—"বিয়ে"; আর যাদের কুলশীল জাতিগোত্র জানা নেই, তারাই দেশী। আমরা আজ দেখতে পাই, এ তিন ছাড়া অনেক বিদেশী শব্দও বাঙলার অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। শ্রীমান সুনীতিকুমার গণনা করে দেখেছেন

যে, আমাদের ভাষার অন্তরে অন্তত: ২৫০০ ফার্সি শব্দ আর শ'-দুয়েক ইউরোপীয় শব্দ বেমালুম ঢুকে গিয়েছে। এতে যদি সে ভাষা যবনদোষে দুষ্ট হয়ে থাকে, তাকে সে দোষ হতে মুক্ত করবার কোন উপায় নেই। ভারতচন্দ্র বলেছেন—"অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল"; আমাদেরও, তাই করতে হচ্ছে, এবং হবে। সঙ্গীতের ভাষায় মিশ্র রাগিণীকে বলে জংলা। বঙ্গভাষা যদি জংলা ভাষা হয় ত আমাদের ঐ জংলারই চর্চ্চা করতে হবে।

(১৩)

আমরা ভাষা নিয়ে পূর্ব্বে যে বাদানুবাদ করেছি, তা আসলে শব্দঘটিত কলহ। শুদ্ধি-বাতিকগ্রস্ত সাহিত্যিকরা চান যে, সাহিত্যের ভাষা থেকে প্রথমত দেশীবিদেশী শব্দসমূহকে বহিষ্কৃত করা হোক্, তারপর যতদূর সম্ভব তদ্ভব শব্দগুলিকে তৎসম করা হোক; তাহলেই তার লুপ্ত পবিত্রতা পুনরুদ্ধার করা হবে। কারও পক্ষে "জুতো-খাওয়াটা" অবশ্য লজ্জার বিষয়, কিন্তু "বিনামা ভক্ষণ"টি কি হিসাবে সাধুজনোচিত, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। আর তদ্ভবকে তৎসম করা অসাধ্য। এত বড় গুণী কি কেউ আছেন, যিনি "বামন"কে ব্রাহ্মণ করতে পারেন, আর "বোষ্টম"কে বৈষ্ণব? আসল কথা এই যে, আমরা যদি এই অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করি, তাহলে আমরা বঙ্গ-সরস্বতীকে কাঙাল করব। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্।—"বন্ধু, বঁধু ও ইয়ার", এ তিনের রূঢ়ি অর্থ একই, অথচ এ তিনের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এর কোনটিকে বাদ দেবার যো নেই, কিম্বা এর একটির স্থানে আরেকটি বসাবার যো নেই। শুনতে পাই যে, কোমল গান্ধার সুরটি অতিশয় শ্রুতিমধুর। কিন্তু

যেখানে "পা" লাগানো উচিত, সেখানে কোমল "গা" লাগালে সুর যাদৃশ সদ্গতি লাভ করে; যেখানে "বন্ধু" বসবে, সেখানে "ইয়ার" বসালে ভাষাও তেমনি সদ্গতি লাভ করে। সুতরাং সাহিত্যিক-দের ছুঁৎমার্গ পরিহার করবার পরামর্শ আমি নির্ভয়ে দিতে পারি। শুনতে পাই, হিন্দু-সমাজের অস্পৃশ্যতা দূর করতে পারলেই আমরা স্বরাট হয়ে উঠব। এ মত কতদূর সত্য জানিনে, কিন্তু বঙ্গভাষায় অস্পৃশ্যতার চর্চ্চা করলে, বঙ্গ-সরস্বতী যে তার স্বরাজ্য হারিয়ে বসবে, সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। আপনারা শুনে খুসি হবেন যে, শব্দের কুল-বিচার না করে, তার অর্থ বিচার করাই প্রাচীন পণ্ডিতদের অনুমত। ভারতচন্দ্র বলেছেন যে,—

"প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
যে হোক্ সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

ভারতচন্দ্রের এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ ভোজরাজ বলেছেন:—

"সংস্কৃতে নৈব কোঽপ্যর্থ প্রাকৃতেনৈব চাপরঃ।
শক্যো বাচয়িতুং কশ্চিদপভ্রংশেন বা পুনঃ॥"

আর ভোজরাজের চাইতেও অনেক প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী বলেছেন :—

"তদেতবাঙ্ময়ং ভূয়ঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা।
অপভ্রংশশ্চ মিশ্রঞ্চেত্যাহুরার্য্যা চতুর্ব্বিধম্" ॥

এ স্থলে আপনাদের আর একটিবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বঙ্গ-সাহিত্যের তথা বঙ্গ-ভাষার অতীত এমন লম্বাও নয়, বড়ও নয় যে, সেই অতীত গৌরব-কাহিনী শুনে আর বলে' আমরা দিন কাটিয়ে দিতে পারি। আমার বিশ্বাস আমাদের সাহিত্য তার

গৌরব লাভ করবে ভবিষ্যতে। অতীত আমাদের কাছে পড়ে-পাওয়া জিনিষ—ভবিষ্যৎ কিন্তু আমাদের নিজ-হাতেই গড়ে তুলতে হবে। লেখকেরা সমাজের আনুকুল্য লাভ না করলে, এ ব্রত উদযাপন করতে সক্ষম হবেন না। আর সে আনুকুল্য যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করবার আশা করতে পারি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সভা।

(১৪)

আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদের কাছে ভাষার বিষয় যে বক্তৃতা করলুম, তার কারণ মানুষের ভাষা তার মনের পরিচয় দেয়। আমরা যাকে ভাষার উন্নতি-অবনতি বলি, তা মনের উন্নতি-অবনতির বাহ্য নিদর্শন মাত্র। কোনও জাতির ভাষা যখন নবরূপ ধারণ করে, তখন বুঝতে হবে যে সে জাতির মনও নব কলেবর ধারণ করেছে। তা ছাড়া ভাষার আলোচনা করা সহজ। ভাষা ভাবের স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম শরীর নয়; আর সকলেই জানেন যে, পৃথিবীর সব জিনিষের স্থূলদেহ নিয়েই নাড়াচাড়া করা সহজ, কারণ তা ধরাছোঁয়ার বস্তু। কোনও পদার্থের সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, মনোগ্রাহ্য। তাই কাব্যবস্তু কি, তার বিচার করতে হলে দর্শনের রাজ্যে ঢুকতে হয়। এ ক্ষেত্রে সে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হবে, কারণ আমি এ সভার দার্শনিক শাখার সভাপতি নই। আর যদি বিদ্যা দেখাবার লোভে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহলেও ধৈর্য্য ধরে আপনারা তা শুনতে পারবেন না। বাজারে গুজব এই যে, হিন্দুমাত্রেই দার্শনিক। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহলে তার অর্থ আমরা জাতকে জাত স্বভাব-

দার্শনিক, স-তর্ক দার্শনিক নই। কিন্তু এ যুগের দর্শনের টানা-পোড়েন দুই সমান তর্কে বোনা।

আপনারা বোধহয় জানেন যে, একালে আমরা যাকে সাহিত্য বলি, সংস্কৃত ভাষায় তার নাম ছিল কাব্য। এই 'সাহিত্য' শব্দ বাঙলায় কোথা থেকে এল জানিনে। ও শব্দ সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক গ্রন্থ সাহিত্যদর্পণের মলাট থেকে উড়ে এসে বাঙলা সাহিত্যের অন্তরে জুড়ে বসেছে।

কাব্য ও সাহিত্য এ দুটি শব্দের যে শুধু নামের প্রভেদ আছে তাই নয়, ও দুয়ের অর্থেরও বিস্তর প্রভেদ আছে। কাব্যের চাইতে সাহিত্যের এলাকা ঢের বেশি বিস্তৃত। কাব্য বলতে বোঝায় শুধু কবিতা ও আখ্যায়িকা। সাহিত্য বলতে আমরা ইতিহাস প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা রকমের রচনা বুঝি। অবশ্য গল্প ও কবিতা আজও সাহিত্যের অন্তর্ভূত হয়ে রয়েছে; শুধু যে রয়েছে তাই নয়, কবিতা না হোক্ গল্প আজ সাহিত্যরাজ্যের অনেকখানি অংশ অধিকার করেছে। পৃথিবীর সকল লিখিয়ে দেশেই দেখা যায় যে, গল্প-সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার দিন দিন শুধু বেড়েই চলেছে; সুতরাং খুব সম্ভব তা বাঙলা দেশেও কালক্রমে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হয়ে উঠবে।

(১৫)

এই বিপুল পৃথিবী ও নিরবধি কালের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন, দেখতে পাবেন যে, যাঁরা সাহিত্যজগতের মহাপুরুষ বলে মানব-সমাজে গণ্য হয়েছেন, তাঁরা সকলেই হয় কবি নয় গল্প-

রচয়িতা; আর সেই ব্যক্তিকেই আমরা মহাকবি বলি, যিনি একাধারে ও দুই।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, এ যুগে কাব্য সম্বন্ধে একটা কু-সংস্কারের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায়। যাঁরা নিজেদের কাজের লোক বলে মনে করেন, অথবা তাই বলে প্রমাণ করতে চান, তাঁরা ফাঁক পেলেই বলেন যে—"আমরা কবিতা ফবিতা বুঝিনে"। সম্ভবত তাঁরা সত্য কথাই বলেন। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সকল সত্য প্রচার করা ত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। মানুষ সেই ভাবেই মানুষের কাছে আত্মপরিচয় দিতে উৎসুক, যাতে তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। সুতরাং "আমি কবিতা বুঝিনে"—এ কথা অহঙ্কারের সুরেই বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বক্তা "কবিতা বুঝিনে" এই কথার দ্বারা প্রমাণ করতে চান তিনি কাজ বোঝেন; যেমন অনেকে "বাঙলা ভাল জানিনে" এ কথা বলেন শুধু এই প্রমাণ করতে যে, তিনি ইংরাজী খুব ভাল জানেন। উভয়েই এরূপ উক্তির দ্বারা সমান সুবিবেচনার পরিচয় দেন। বলা বাহুল্য কোন বিষয়ে অক্ষমতা অপর কোন বিষয়ে ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। উপরোক্ত কু-সংস্কারের মূলে আছে এই ধারণা যে, কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনও সম্বন্ধ নেই। এ কথা সত্য হত, যদি জীবন মনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হত। তা যে নয়, তা সকলেই জানেন। আর মন অর্থে যে শুধু ব্যবহারিক মন নয় তার প্রমাণ, কর্ম্ম দিয়ে আমরা সকল জীবন ভরাট করে দিতে পারি, কিন্তু সমগ্র মন পূর্ণ করতে পারিনে; তার অনেকটা শূন্য থেকে যায়। মানবমনের সকল ক্রিয়াশক্তি তার সংসারবাসনার দ্বারা

গণ্ডীবদ্ধ নয়। তা যদি হত, তাহলে মানবসমাজে ধর্ম্ম বলেও কোন জিনিষের সৃষ্টি হত না। বিষয়ে নির্লিপ্ত এবং দৈনন্দিন সাংসারিক ভাবনা থেকে মুক্ত মানবী শক্তির লীলাই আর্ট, ধর্ম্ম, কাব্য প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পায়। আমরা প্রতিজনেই এ-জাতীয় সৃষ্টির কর্ত্তা না হই, ভোক্তা ত বটেই। কাব্য মনের এই অতিরিক্ত ও মুক্ত অংশেরই খোরাক। সে অংশটা অনেক কল্পনা, অনেক স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে রাখতে হয়। যাঁরা মানবমনের সেই সব অস্পষ্ট ও অনিত্য কল্পনাকে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পারেন, তাঁরাই কবি।

আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, জীবনের সঙ্গে কাব্যের কোনই সম্বন্ধ নেই, তাহলে জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের দৈনিক কর্ম্মজীবন কি এতই সুন্দর, এতই মনোরম ও এতই প্রিয় যে, আমরা এক দণ্ডের জন্যও তা ভুলে থাক্‌তে পারিনে? কাব্যের আর কোনও গুণ না থাকুক, অন্ততঃ এই মহাগুণ আছে যে, তা অন্ততঃ দু'দণ্ডের জন্যও আমাদের কর্ম্মক্লিষ্ট জীবনের ভাবনা ভুলিয়ে দিতে পারে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা মহা লোক-হিতৈষী; সমাজের অর্থাৎ পরের কিসে উপকার হয়, সেই ভাবনাতেই তাঁরা মশ্‌গুল। যে সাহিত্য সমাজের ধরাছোঁয়ার মত কাজে লাগে, তদতিরিক্ত সাহিত্যকে তাঁরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। সকলেই জানেন যে, তেল নামক পদার্থটা সমাজের বহুতর কাজে লাগে, যথা—খেতে, মাখ্‌তে, কল-চালাতে, চাকায় দিতে—এমন কি progress-এর চাকাতেও। তাই এঁরা কবিদের সমাজের

ঘানিতে জুড়ে দিতে চান্। আর তাতে যে গররাজী হয়, তাকে সৌখীন, বিলাসী, অলস, অকর্ম্মণ্য ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করেন। এঁদের কথার উত্তর দেওয়া বৃথা, কেননা জনগণ সে কথা কানে তুলবে না। কারণ তেল আমাদের সকলেরই চাই; সুতরাং তা যোগানো যে মহৎ কার্য্য, সে বিষয়েত আর সন্দেহ নেই।

তবে সামাজিক জীবনের উপর কাব্যের প্রভাব যে কি, তা আমাদের জীবনের উপর রামায়ণ ও মহাভারত নামক দু'খানি কাব্যের প্রভাবের বিষয় চিন্তা করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

সত্য কথা এই যে, আমাদের স্পষ্ট ইচ্ছা ও ব্যক্ত বাসনাই আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে। মানুষের অসাংসারিক মনই মানুষকে মানুষের সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ করে। আমাদের জীবনের মূলে যা আছে, তা তেল নয়—রস। জীবনের এই মূল ধাতু নিয়েই কবির কারবার। বঙ্গসাহিত্য কাব্যে যে অপূর্ব্ব গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ বাঙলার রবি আজ সমগ্র সভ্যজগতকে উদ্ভাসিত করেছে।

(১৬)

আমি এখন বঙ্গ-সাহিত্যের যথার্থ কাব্যাংশের কথা ছেড়ে দিয়ে তার অপরাংশের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বঙ্গ-সাহিত্য শুধু উঁচুদিকে বাড়্ছে না, সেই সঙ্গে তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হচ্ছে। এ ভাষায় বহুলোকে আজ ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আজকের দিনে দেশের ইতিহাসের পরিচয় লাভ করতে হলে আমাদের আর পরের ভাষার দ্বারস্থ হতে হয় না। আমি অবশ্য এ কথা বলতে চাইনে যে, ইতিমধ্যেই আমাদের

দেশে হিরডোটাস, থুসিডিডিস্, লিভি, ট্যাসিটাস্ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়েছে। আমার বক্তব্য এই যে, বাঙালীতে যখন ইতিহাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তখন ভবিষ্যতে বাঙলায় নব গিবন, মম্‌সেনের জন্মের আশা আমরা করতে পারি।

ইউরোপে essay নামক এক শ্রেণীর সাহিত্য আছে, যার বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার ইত্যাদি। এ শ্রেণীর সাহিত্যও বাঙ্গলাভাষায় স্থান পেয়েছে। আমাদের রচিত essay প্রভৃতির মূল্য যে কি, সে প্রশ্নের উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ। যদি কালক্রমে সে সব বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হয়, তাহলেও বলতে হবে যে, সে সব লেখা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। কারণ এই সব লেখাই এ সত্যের দলিল যে, আমাদের মন আজ সজাগ হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের মুখও ফুটেছে। বাঙালীর আজ অনেক বিষয়ে অনেক কথা বলবার আছে, এবং সে কথা তারা স্পষ্ট করে বল্‌তে শিখেছে। মনের বহু অব্যক্ত ভাব আজ ভাষায় ব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

(১৭)

যাকে মানুষে কাজের কথা বলে, তাও সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়। ধরুন এই পলিটিক্সের কথা। আজকের দিনে অনেকের বিশ্বাস যে, এর চাইতে বড় কাজের কথা ভূভারতে নেই। বাঢ়ং। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, দু'খানি সাহিত্যগ্রন্থ যুগ যুগ ধরে সে দেশের পলিটিকাল মনের উপর প্রভুত্ব করেছে। মাকিয়াভেলির Prince এবং Rousseau-র Social Contract হচ্ছে সে ভূভাগের পলিটিক্যাল

চিন্তার পূর্ব্ব মীমাংসা আর উত্তর মীমাংসা। গত দু'শ' বৎসরের ভিতর ইউরোপে কম করেও দু' লক্ষ পলিটিক্সের গ্রন্থ জন্মগ্রহণ করেছে; কিন্তু সে সব গ্রন্থই ও-দুখানি বইয়ের হয় অনুবাদ নয় প্রতিবাদ—আর নাহয়ত ও দুই মতবাদের একটা মীমাংসা মাত্র। এর কারণ কি?—কারণ এই যে, মাকিয়াভেলি ও রুসো উভয়েই মানুষের পলিটিকাল মনের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মর্ম্ম উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং যা আপাতদৃষ্টিতে কাজের কথা মাত্র, তা তাঁদের কাছে মানবমনের চিরন্তন ভাবের কথা হয়ে উঠেছে। যাঁর কথা কর্ম্মের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মের সন্ধান আমাদের দেয়, তাঁর কথাই অমরত্ব লাভ করে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, পলিটিক্সের কথা ততদিন আমাদের মুখের কথাই থেকে যাবে, প্রাণের কথা হবে না, যতদিন না তা বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তর্ভূত হয়। কাজের কথা জ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, বুদ্ধির দ্বারা পরিষ্কৃত, ও হৃদয়-রাগে রঞ্জিত না হলে তা সাহিত্যে স্থান পায় না। পরের কাছ থেকে ধারকরা মনোভাব আমাদের শুধু উত্তেজিত করতে পারবে কিন্তু আমাদের আত্মশক্তি প্রস্ফুটিত করতে পারবে না, যতদিন না সে ভাবকে অন্তরের বকযন্ত্রে চুঁইয়ে আমরা আমাদের মনের রসরক্তে পরিণত করতে পারি। যে অন্তর্গূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে আমরা পর-মনোভাবকে অন্তরঙ্গ করতে পারব, সেই প্রক্রিয়ার ফলে এ বিষয়ে নব সাহিত্যের সৃষ্টি হবে। পলিটিক্স্ যে কবে বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হবে তা বলা কঠিন, কারণ তার আগে তা বঙ্গভাষার অন্তর্ভূক্ত হওয়া চাই। ও বস্তু আজও সম্পূর্ণ ইংরাজীর দখলে। এ দেশের পলিটিক্সকে মনের ধনে পরিণত করতে হলে, তাকে এই পরভাষার

অধীনতা থেকে মুক্ত করতে হবে। যতদিন আমরা তা করতে না পারি, ততদিন তা খবরের কাগজের দখলেই থেকে যাবে—অর্থাৎ তা হবে যুগপৎ অনুকরণ ও অনুবাদ। সংক্ষেপে জ্ঞানমার্গের ও কর্ম্মমার্গের সকল বিষয়ই আমাদের ভাষার অন্তর্ভূত করতে হবে, নচেৎ বঙ্গ-সাহিত্য সম্পূর্ণ আত্ম-প্রতিষ্ঠ হবে না।

(১৮)

জর্ম্মাণ দেশের বর্ত্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রয়েড আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের যথার্থ মনের কথা তার সজ্ঞান মনের কথা নয়; সে কথা তার মনের গোপন কথা। আর সে কথা ধরা পড়ে তার স্বপ্নে, তার জ্ঞানমূলক কর্ম্মে নয়। কথাটা শুনতে যতটা নতুন শোনায়, আসলে কিন্তু ততটা নতুন নয়। যুগ যুগ ধরে বহুলোকের মনে এ সত্যের একটা অস্পষ্ট ধারণা যে ছিল, তার পরিচয় বিশ্ব-সাহিত্যে পাওয়া যায়। সে যাই হোক্, ফ্রয়েডের মত যে মূলতঃ সত্য, সে বিষয়ে ইউরোপের বর্ত্তমান দার্শনিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই।

যেমন ব্যক্তিবিশেষের, তেমনি জাতিবিশেষেরও যথার্থ মনের কথা তার কাব্য থেকেই জানা যায়; কারণ কাব্য হচ্ছে তার কল্পনার সৃষ্টি—ভাষান্তরে তার দিবা-স্বপ্নের ভাষায় গড়া প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। আমরা প্রত্যেকেই যখন স্বপ্ন দেখি, তখন আমাদের সুষুপ্ত মন কাব্য রচনা করে। সে ক্ষণস্থায়ী ও অস্পষ্ট কাব্যের সঙ্গে সাহিত্যের কাব্যের প্রভেদ এই যে, এ কাব্য সুস্পষ্ট আর চিরস্থায়ী।

বাঙালীর মনের বিশেষ প্রকৃতি ও গতির যদি পরিচয় নিতে হয় ত, তা' নিতে হবে বাঙালীর রচিত গল্প ও গান থেকে।

আজকের দিনে এলিজাবেথের যুগের ইংরাজী মনের সন্ধান জানবার জন্য আমরা যেমন Bacon-এর দ্বারস্থ হইনে, হই Shakespeare-এর ; ভবিষ্যতে লোকে তেমনি অতীত বাঙালী-মনের পরিচয় লাভ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হবে, এ যুগের কোনও জ্ঞানীর শরণাপন্ন হবে না। আবার আমরাও যদি আমাদের জাতের ভবিষ্যৎ মানসিক প্রকৃতির বিষয় কৌতূহলী হই, তাহলেও আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রবৃদ্ধ নব-ধারার দিকে নজর দিতে হবে।

(১৯)

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ যুগে যা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মাচ্ছে, তা হচ্ছে গল্প। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, যুগধর্ম্ম অনুসারে পৃথিবীর সাহিত্য-রাজ্য এ যুগে গল্পের অধিকারে আসছে। এ সব গল্পের গুণ বিচার না করেও এ কথা বলা যায় যে, এ ব্যাপার আমাদের আশার কথা। যে জমিতে ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সে জমি যে উর্ব্বর সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নেই। এই গল্প-সাহিত্যের প্রয়োজনাতীত উৎপত্তিই প্রমাণ যে, বাঙালীর মনের জমি দিন দিন বেশি উর্ব্বর হয়ে উঠছে।

এই গল্প-সাহিত্যের প্রতিপত্তি দেখে অনেকে ভয় পান। তাঁদের ধারণা যে, গল্পসাহিত্যের স্ফূর্ত্তি সৎসাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আগাছার উপদ্রবে যেমন ভাল গাছ মারা যায়, তেমনি সাহিত্যের এই আগাছা উঁচুদরের সাহিত্যকে নাকি উচ্ছেদ করবে। এ ভয় আমি পাইনে। কারণ উঁচুদরের সাহিত্য বলে যদি কোনও সাহিত্য থাকে, ত কোনরূপ পারিপার্শ্বিক নীচু সাহিত্য তার বিনাশ

সাধন করতে পারবে না। যে সাহিত্য সকল বাধা অতিক্রম করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, ও মাথা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে না, তা উঁচুদরের সাহিত্য নয়।

গল্প-সাহিত্যের যে অনেকের কাছে যথোচিত মান্য নেই, তার একটি কারণ এই যে, অনেকের বিশ্বাস ও-শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করা অতি সহজ। ঠুংরী যে সঙ্গীতরাজ্যে উচ্চপদ লাভ করেনি, তারও কারণ এই যে, অনেকের ধারণা ও-গান গাওয়া অতি সহজ; কারণ ঠুংরী শেখবার জন্য তাদৃশ কঠিন পরিশ্রম করতে হয় না, যতটা করতে হয় ধ্রুপদ শিক্ষা করবার জন্য। কথা সত্য, কিন্তু সঙ্গীত বা সাহিত্য এর কোনটিরই শ্রেষ্ঠত্ব, কে কতটা মেহন্নত করেছে তার উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে রচয়িতার স্বাভাবিক ক্ষমতার উপর, শাস্ত্রে যাকে বলে প্রাক্তনসংস্কার, তারই সদ্ভাবের উপর। সঙ্গীতপ্রাণ শ্রোতামাত্রেই জানে যে, যথার্থ ঠুংরী শুধু সেই গাইতে পারে যার ভগবদ্দত্ত গলা আছে, আর সেই সঙ্গে আছে সুরেলা কান ও সুরেলা প্রাণ। লোককে মেরেপিটে হয়ত চলনসই অর্থাৎ অচল ধ্রুপদী বানানো যেতে পারে, কিন্তু ও উপায়ে ঠুংরী-গায়ক বানানো যায় না। ও বস্তু যেমন-তেমন করে গাওয়া যেমন সহজ, ভাল করে গাওয়া তেমনি কঠিন।

পৃথিবীর সাহিত্যে গল্পের প্রাচুর্য্য দেখেই লোকের মনে এ ভুল ধারণা জন্মেছে। এবং তার ফলে অনেক লেখকও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছেন। যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখতে পারেন, তিনি তা না লিখে যে নিকৃষ্ট গল্প লিখছেন, অর্থাৎ গল্প-সাহিত্যের শরৎচন্দ্র হতে

গিয়ে নষ্টচন্দ্র হচ্ছেন,—এর দৃষ্টান্ত বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল নয়। কথায় বলে "গলা নেই গান গায় মনের আনন্দে"। এরূপ আনন্দ ধ্বনিও বাঙলায় নিত্য শোনা যায়, এবং সে ধ্বনি অবশ্য শ্রোতার আনন্দবর্দ্ধন করে না।

এই সব কারণে আমি বঙ্গ-সাহিত্যের তরফ থেকে এ দাবী করতে পারিনে যে, আমাদের মাসিক পত্রে মাস মাস যত গল্প বিকশিত হয়, তা সবই কাব্য-কুসুম। তার বেশির ভাগই কাগজের ফুল, অর্থাৎ তাতে প্রাণ নেই মন নেই; আর সম্ভবতঃ এ-জাতীয় অনেক ফুল বিলেতি কাগজ কেটে বানানো। তবে পৃথিবীর কোন্ সাহিত্যের এই একই অবস্থা নয়? আমার বিশ্বাস সকল সাহিত্যেই অমূল্য কাব্যের সংখ্যা অতি কম, আর যার কোন মূল্য নেই তাই অসংখ্য। অসাধারণকে সাধারণ করা তেমনি অসম্ভব, সাধারণকে অসাধারণ করা যেমন অসম্ভব।

(২০)

এ সত্ত্বেও আমি এই গল্পসাহিত্যের আতিশয্য বঙ্গসাহিত্যের একটা সুলক্ষণ বলে মনে করি। দশে মিলে যে জমি তৈরি করে যাচ্ছেন, তার উপরেই ভবিষ্যৎে কাব্যের যথার্থ ফুল ফুটবে। আজকের দিনে বহু লেখকের রচিত গল্প যে কাব্য নয়, তার কারণ তাঁদের কল্পনা তেমন পরিস্ফুট ও পরিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু এই নব সাহিত্যকে আর এক হিসাবে দেখা যেতে পারে। গল্প-সাহিত্য থেকে জাতির নব মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যদি এই সাহিত্যকে আমাদের মনের শুধু দলিল হিসেবে দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে, এর অন্তরে একটি নূতন আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে।

সে আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। আমাদের জীবন নানা প্রকার চিরাগত আচার ও সংস্কারে বদ্ধ। বাঁধাধরা আচার বিচারের হাত থেকে মুক্তিলাভের কল্পনাই এই নব-সাহিত্যের মূল কল্পনা। এ সাহিত্য আকারে কতকটা বস্তুতান্ত্রিক হলেও, বাস্তব-জীবনের প্রতিকৃতি নয়। কেন না নব-সাহিত্যের কল্পনা বাস্তব-জীবনের epi-phenomenon নয়, তার থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ উড়ো-কল্পনা। যে কল্পনার ভিত্তি জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা কখন কাব্যের সামগ্রী হতে পারে না। কিন্তু আমাদের যুবকরা আজ যে স্বপ্ন নিজেরা দেখছেন, সে স্বপ্ন তাঁরা বহু লোককে দেখাচ্ছেন। ফলে জাতির মন এই সব নূতন স্বপ্নে ভরে উঠবে। এর ফল আমাদের সামাজিক জীবনের উপর যাই হোক, আমাদের মানসিক জীবনের সুর এক পর্দ্দা চড়িয়ে দেবে। যারা সামাজিক জীবনের উপর সাহিত্যের ফল সু কি কু তাই বিচার করতে যান, তারা সামাজিক লোক ভবিষ্যতে বেশি সুখী হবে কি দুঃখী হবে তারই হিসেব করতে ব্যস্ত। এ ভাবনা সম্পূর্ণ বৃথা। কারণ সুখদুঃখ পৃথিবীতে চিরকাল ছিল, আজও আছে, এবং চিরকাল থাক্‌বে। বদল হয় শুধু তার নামরূপের। সুখদুঃখ মনের জিনিষ, এবং মনই প্রতি যুগে তার বিভিন্ন রূপ দেবে। সে যাই হোক্, সাহিত্যের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি নষ্ট ক'রে তার স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তা আপনারাই বিবেচনা করবেন।

(২১)

আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদের কাছে যে বাক্‌বিস্তার করলুম, তার ভিতর হয়ত কোনও সার কথা নেই। আমি এ সভায় কোনও

নব-বাণী ঘোষণা করবার জন্য উপস্থিত হই নি, এসেছি শুধু আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে, এবং সেই উপলক্ষ্যে আপনাদের পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে। সুতরাং আমার কথা যথাসাধ্য আলাপের অনুরূপ করতে চেষ্টা করেছি। যদি অনেক বাজে কথা বলে থাকি ত সে প্রগল্‌ভতা আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করবেন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে সাহিত্যের কথা সুহৃৎসম্মিত-বাণী, প্রভুসম্মিতবাণী নয়। এ মত আমি চিরকালই প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করে এসেছি। প্রভুসম্মিতবাণী অর্থাৎ আদেশই সংক্ষিপ্ত হয়। আজ্ঞা প্রচার করবার অধিকার শুধু ধর্ম্ম-গুরুদের ও রাজ-পুরুষদেরই আছে। যারা লোকমান্যও নয়, রাজমান্যও নয়, তাদের অর্থাৎ আমাদের মত সাহিত্যিকদের সে অধিকার নেই। তাই আমরা আমাদের বাণী এমন কোনও মন্ত্রাকারে প্রকটিত করতে পারিনে, যে মন্ত্র জপ করে লোকে মোক্ষ লাভ কর্‌বে; এমন কোনও সূত্রাকারে পরিণত করতে পারিনে, যে সূত্র লোকে ভক্তিভরে বক্ষে ধারণ করে দ্বিজত্ব লাভ করবে।

মন্ত্র রচনা করা ও সূত্র রচনা করা হচ্ছে ধর্ম্মপ্রচারক ও পলিটিকাল প্রচারকদের ব্যবসা। সত্য কথা এই যে, সাহিত্য-জগতে কোনও প্রচারক নেই এবং থাক্‌তে পারে না। এ রাজ্যে যিনি যে মুহূর্ত্তে প্রচারকার্য্য সুরু করেন, তিনি তম্মুহূর্ত্তে সরস্বতীর রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত হন—স্বাধিকারপ্রমত্ততার অপরাধে। এর কারণ সাহিত্য কোন বিষয় প্রচার করে না, সব জিনিষই প্রকাশ করে। তাই পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সাহিত্য বলে এক জাতীয় সাহিত্য

আছে, যা ধর্ম্মের মন্ত্রভাগ নয়; আর পলিটিকাল সাহিত্য বলেও এক জাতীয় সাহিত্য আছে, যা পলিটিক্সের যন্ত্রভাগ নয়। এ রাজ্যে প্রকাশই প্রচার, কেননা সাহিত্য আলোকধর্ম্মী। আর আলোর ধর্ম্মই এই যে, তা আপনা হতেই বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

(২২)

বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মনে একটা মস্ত বড় আশা আছে; সে আশা যে দুরাশা নয়, আপনাদের কাছে তাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েছি কি না বলতে পারি নে। মনে রাখবেন ভবিষ্যৎ বিষয়ের কোনও বর্ত্তমান প্রমাণ নেই। সে বিষয়ে আমাদের আশাই একমাত্র প্রমাণ।

মানুষের ভাষা একটা স্রোত, মানুষের মনও একটা স্রোত; এবং এই দুই স্রোতে মিলে যে স্রোতের সৃষ্টি করে, তার নাম সাহিত্য-স্রোত। অবশ্য এ স্রোতের অন্তরে কখনো আসে জোয়ার, কখনো ভাটা। আমার বিশ্বাস আমাদের সাহিত্যের অন্তরে এখন জোয়ার এসেছে। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান একটা শুভলগ্ন।

রামপ্রসাদ বলেছেন যে,—

"প্রসাদ বলে থাক বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
(যখন) জোয়ার আসবে উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা॥"

ধর্ম্মের দিক থেকে দেখতে গেলে, এ উপদেশ যে খুব বড় কথা, তা আমি মানি। এ হচ্ছে ভগবানে আত্মসমর্পণের চরম উক্তি। আর দর্শনের দিক থেকে দেখতে গেলেও দেখা যায় যে, এ সত্য কথা। মানুষের আকাশ-জোড়া অহঙ্কার নিমেষে ধূলিসাৎ

হয়ে যায়, যখন সে জানতে পারে যে, মানুষের ক্ষুদ্র অহং সৃষ্টি প্রবাহের উপরে ভাসমান খড়কুটো মাত্র। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—সেই অনন্ত রহস্যের ভাবনায় অভিভূত হলে মানুষের সকল ক্রিয়া-শক্তি একদম পঙ্গু হয়ে পড়ে। তাই মানব-জীবনের কোন ব্যাপারেই রামপ্রসাদের উপদেশ গ্রাহ্য নয়, সাহিত্যিক জীবনেও নয়। মানুষকে জোয়ারের সময় ভেটিয়ে যেতে হয়, ভাটার সময়েও উজিয়ে যেতে হয়, যদি তার কোনও নির্দ্দিষ্ট গম্যস্থান থাকে। আমরা যদি বঙ্গ-সাহিত্যের স্বরাজ্যলাভ করতে চাই ত আমাদের হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাক্‌লে চলবে না। কে জানে কখন আবার ভাটা আস্‌বে? বর্ত্তমান জোয়ারের উপর বেশি ভরসা রাখা যায় না। কেননা তা এসেছে বাইরে থেকে। আমরা যাতে এ জোয়ার চলে গেলে কাদায় না পড়ি, তার জন্য বঙ্গসাহিত্যে আমাদের অন্তরের জোয়ার বওয়াতে হবে। তা বওয়ানো সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ। এ ইচ্ছা আমাদের মনে জন্মলাভ করেছে, এখন তাকে শক্তসমর্থ করবার দায়িত্ব সমগ্র বাঙালী জাতির হাতে। আশা করি এ দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা বাঙ্গালীরা উদাসীন হব না—"কি স্বদেশে, কি বিদেশে, যথায় তথায় থাকি।"

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পেন্‌সনের পর

(দিল্লীর প্রবাসী বঙ্গ-সম্মিলনে পঠিত)

আমরা বাঙ্গালী। বাঙ্গালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞেরা—অর্থাৎ লেখক, বক্তারা, একবাক্যে শেষ কথাটা বলে দিয়েছেন যে, এরা চাকুরে জাতি। চাক্‌রীই যদি পেশা হল, ভালো চাক্‌রী খোঁজাই স্বাভাবিক। সরকারী চাক্‌রীই সেরা—তাতে পেন্‌সন্ আছে, ভাগ্যে থাকলে খেতাবও মেলে।

আজকার এই সম্মিলনী-সভায় অনেক ভদ্রসন্তানই থাকতে পারেন,—যদি অপরাধ না হয়তো তাঁদের অনুমতি নিয়ে বলি,—যাঁরা সরকারী চাক্‌রী করেন, তাঁরা পেন্‌সনের আশা রাখেন। কিন্তু পেন্‌সন্ কথাটা তাঁদের আজো শোনা জিনিষ; কাগজেকলমে জানলেও, সেটার আস্বাদ তাঁরা পাননি। আমি কিছু কিছু পেয়েছি, তাই বোধ করি সে সম্বন্ধে বলবার একটু দাবীও আছে।

আমাদের দেশে চাকুরেরাই বোধহয় বেশী লিখেছেন; ডেপুটিরাও চাকুরে,—অবশ্য বড় চাকুরে। সম্ভবতঃ সেই আশাতেই সম্মিলনীর প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয়, আমাদের কাছ থেকে গবেষণাপূর্ণ মৌলিক কাজের কথা প্রভৃতি চেয়েছেন। তা তিনি নিশ্চয়ই পাবেন, তবে আমার কাছে নয়। পেন্‌সন্ প্রাপ্তির পরের অভিজ্ঞতাটা গবেষণা-প্রসূত বা মৌলিক নাহলেও, অনেকের কাছে নতুন, আর কাজের কথা বলে গৃহীত হতে পারে। অবশ্য এটা আমার অনুমান। আমি

সেই সম্বন্ধেই একটু বলছি। বিষয়বুদ্ধি কোনদিনই না থাকায় বিষয় খুঁজে পাইনি; অপরাধ ক্ষমা করবেন।

জীবমাত্রেই মুক্তি খোঁজে, বন্ধন কেউ চায় না, সেটা এড়াতেই চায়। আমিও জীবের মধ্যে একটি, তাই "জীবমাত্রেই" বলেছি, "মানুষমাত্রেই" বলিনি। পেন্‌সিন্ নেবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিলাম, দিন গুণছিলাম। আপিসের প্যাড্‌খানা পঞ্জিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, দেহলি পুষ্পে ভরাট।

যেদিন থার্ড্ বেল্ দিলে, তিনটে বাজতেই "আর কারোর চাকর নই" বলে, কাগজপত্র গুটিয়ে, বাসায় চলে এলুম। অনন্তশয্যা পাতাই ছিল, এসেই সটান্ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লুম। সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ ঢেউ খেলে বেড়াতে লাগলো, গায়ে আর ধরছেনা। পা'দুটো সামনে, আর হাত দুটো মাথা ডিঙ্গিয়ে সজোরে সোজা করে দিয়ে, উপর দিকে চেয়ে বললুম—"উঃ এতটা দিন কাটিয়ে দিয়েছি! পঁ-চি-শ বছর! আজ তুমি এলে! সত্যি এলে"!! বল্‌তে বল্‌তে এমন লম্বা হয়ে পড়লুম, খাটের বাইরে পা গিয়ে পড়লো, হাত দুটো মাথা পেরিয়ে যেন দু' হাত তফাতে। আজো বুঝতে পারিনে সত্য কি মিথ্যা। মনে আছে চোখে জল গড়িয়েছিল। আনন্দের বেগ যে এটুকু শরীরে ধরছিল না! নিজেই অবাক হয়ে ভেবেছি। মনে হয়েছে হবেনা কেন, বন্ধনমুক্তি যে। বদ্ধ অবস্থায় কি করে বুঝব আমি কত বড়। নীলাচলে মহাপ্রভু সমুদ্রের নীল রং দেখে, শ্রীকৃষ্ণ ভেবে আনন্দে "এই যে এই যে" বলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। জেলেরা তোলবার পর অনেকেই দেখেছিলেন—তাঁর দেহ দেড়া হয়ে গেছে; আনন্দে অঙ্গ শিথিল হয়ে হাতপায়ের খিল খুলে গেছে!

যাক্, মুক্তির আশার আনন্দেরই এতটা প্রভাব। প্রকাশের বেদনা উপস্থিত, কার কাছে বলি, বাসায় কেউ নেই। চাকরটাকেই বললুম। সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল, বাবু ভাঙ্ খেয়েছেন।

বাসা তুলে বাড়ী গেলাম। দেহমনে কোথাও আর ভার নেই, স্বাধীন জীব। এইবার একমনে ভগবানের নাম করা, গ্রামের স্কুল আর লাইব্রেরিটে দেখা, আর গুড়ুক খাওয়া। স্বাস্থ্যটা জোর রাখবার জন্যে ছোট একটি বাগান করা,—বাস্।

দিন দশেক বেশ গেল; কোট, জুতো, মোজা বজায় রইল। তারপর—"বসে বসে কি করবে, বাজারটা করলেও তো সংসারের উপকার হয়"! সত্যিই তো। কোট, জুতো, মোজা খস্‌লো। পল্লীগ্রামের বাজারে চার আনার বাজার করতে মোজাজুতো পরে আর কে যায়। গামছা বাঁধে উঠলো, যে কাজের যে বেশ।

ক্রমে,—এটা আনোনি ওটা আনোনি, এটা এত কম্ কেন, ওটা অত মাগ্‌গি কেন, ঘুশো চিংড়ি সবাই পেলে আর তুমি পাওনা; ইত্যাদি।

আগে আমি হুকুম করতুম, এখন আমি হুকুম শুনি,—সারাদিন। বার-বাড়ীতেই দিন কাটাই—ভগবানের নাম করা চাই তো। বউমারা সোনা, মাণিক, গোপাল, যাদু লেলিয়ে দিয়ে যান, বলে যান,—পুকুরে না যায়, পড়ে না যায়, মাণিককে কোলে করে পা নাড়লেই ঘুমবে, ভারি শান্ত ছেলে। কেউ নাক টানে, কেউ কান টানে, কেউ যা করে তা সভায় বলবার নয়। কাঁদলে আমার দোষ। এই নিত্য। সব ছেলেই শান্ত। গোপাল লাফিয়ে পড়ে দাড়িটে কাটলে, কপাল পোড়ে আমার! বউমা বলেন,—বুড়ো মিন্‌সে বসে বসে ফেলে

দিলে গা! কাজকর্ম্ম নেই, ছেলেগুলোকে দেখতে শুনতেও পারেন না ইত্যাদি। কর্ত্তা ছিলুম—এখন আমি একাধারে ঝি চাকর দুইই। অবশ্য তারা যা বলে আর করে, তা নাকি আমার ভালর জন্যেই।

ভগবানের নাম করবার কথা মুখে আনতে সদুপদেশ পাই—"ছেলেরা কি ভগবান নয়, ওদের নিয়ে থাকলেই ভগবানকে নিয়ে থাকা হয়"। ঠিক্! বোধহয় পূর্ব্বজন্মে কড়া সাধনভজন করে থাকব, তাই ভাগ্যে এতগুলি ভগবান জুটেছেন।

সব গঙ্গাস্নানে কি নিমন্ত্রণে যান, বাড়ী চৌকি দিতে হয়, বৎসগুলি সামলাতে হয়। এই শেষেরটিই সাংঘাতিক, ·যেহেতু সবাই শান্ত। তারা আমার প্রাণান্তের পাক্ চড়িয়ে দিলে।

আর তো পারিনে। এক বছরেই বেশ বুড়িয়ে দিলে। চুল পাক্‌লো, মেরুদণ্ড বাঁক্‌লো। এখন যা জলখাবার পাই, তা ওই পঙ্গপাল তারাই খায়, আমি দেখি। ক্রমে সয়ে গেল। একদিন দেখতে পেয়ে বল্‌লেন—"কি আনন্দ বল দিকি"! বললুম—"অত্যন্ত"।

কাতরে ভগবানকে বলি—"বন্ধনমুক্তির সাধ মিটেছে প্রভু! ত্বয়া হৃষীকেশ, আর নিযুক্তোস্মি নয়, দয়া করে বিযুক্তোস্মি"!

একটু ফাঁক পেলে—কোন দোকানে কি ঘাটে বসে বাঘ মারি, অর্থাৎ আপিসের আর সাহেবের গল্প করি। আপিস ছিল মুঠোর মধ্যে, আর সাহেব ছিলেন হাতের পুতুল। যা ছকে রেখে এসেছি, এখন অন্ধে কাজ চালাতে পারে; তবু এই একের অভাবে তিন তিনজন রাখতে হয়েছে, ইত্যাদি। সেই সময়টুকুই কাটে ভালো।

পরম স্নেহের আর মোহের "গ্রবিউন"গুলি ক্রমে আলাদা করে

তুললে; বুড়ো বয়সে পালাবার সখ এনে দিলে। মনে পড়লো বাল্যবন্ধু ভগবতী বাবুও পেন্‌সন্ নিয়েছেন, দেওঘরে আছেন; তিনি কেমন আছেন দেখা যাক্। ভাগ্যবান লোক, ভালই থাকবেন।

অবস্থা পাকাই দাঁড়িয়েছিল, খস্‌তে বিলম্ব হল না। এখন আমার পা বাড়ালেই অমৃতযোগ।

দেখে বন্ধু ভারি খুসী, বললেন—"বাঁচালে ভাই, দুটো কথা কয়ে বাঁচ্‌ব। জিজ্ঞাসা করলুম—"আগে বল তো আছ কেমন" ?

"বড়ি মজিমে হ্যায় ভায়া"।

শুনে বড় আনন্দ হ'ল, বল্‌লুম—"আমিও পেন্‌সন্ নিয়েছি, তোমার রুটীন্‌টে জানতে এলুম, অবশিষ্ট জীবনটা সেই আদর্শমত কাটাবার চেষ্টা করব।"

"ও ভেবনা, কোনো চেষ্টা করতে হবেনা হে, আপ্‌সে এসে যাবে। আমাকে কি কিছু করতে হয়েছে—না করতে কেউ দিচ্ছে।"

বললুম—"সব সংসার তো একরকম নয় দাদা; না সব অদৃষ্ট।"

"সব এক ভাই—সব এক। পেন্‌সন্ নেবার পর সব এক; বৈচিত্র্যের বেয়াদবী নেই দেখতেই পাবে।"

স্নানাহারের পর আমাকে বিশ্রাম করতে বলে ভগবতী বাবু ভিতরে গেলেন।

বেলা তিনটের পর এসে বল্‌লেন—"কই ঘুমোও নি তো?"

"দিনে বড় একটা ঘুমোই নে, একটু গড়িয়ে নিই বটে। বই কি খবরের কাগজ থাকলে তাই নিয়েই থাকি।"

"ও বদ-অভ্যাসটা থেকে মা সরস্বতী কৃপা করে আমাকে রেহাই দিয়েছেন—যথালাভ। বাংলা হরফ্‌গুলো ভুলে না যাই, তাই পাঁজি

একখানা থাকে। ফি বছর কিনতে হয় না,—সবই নূতন পঞ্জিকা, মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনগুলো দেখি,—ভারি interesting হে! কিন্তু ঝুঁকিটিও বড়, বাক্সের মধ্যে বন্ধ রাখতে হয়,—ছেলেমেয়েদের হাতে না পড়ে।"

বল্‌লাম—"তুমিও তো শোওনি দেখছি!"

"আমি? হেঃ—পেন্‌সন্ নিয়েছি যে! দেখছো না,—তোফা মানস সরোবরে রয়েছি, বুকেপিঠে রাজহংস রাজহংসীরা কেলি করে; চোখ বুজ্‌তে ভয় হয়—কখন্ কোন্‌টা চোখ খুব্‌লে নেবে!"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়্‌লো, বললুম—"পড়েন না, ঘুমোন না, তবে আহারের পর এ চার পাঁচ ঘণ্টা করেন কি?"

"করেন কি?—করেন কর্ম্মভোগ। গ্রহ কি সূত্র ধরে কখন্ যে দেহে প্রবেশ করে, তা বলা যায় না ভাইয়া। কৈশোরে শিল্পের দিকে বেশ একটু ঝোঁক্ ঝামরেছিল! বেগুনী রংয়ের রেশম এনে, চাদরে পাড় তুলে ব্যবহার করতুম। দেখে বাহবা পড়ে গেল। মামা আমাকে নিয়ে জ্যোতিষীর বাড়ী ছুটলেন। পণ্ডিত বল্‌লেন—"এ যে কাশ্মীরের শাল-শিল্পী বিখ্যাত কুদ্‌রৎ খাঁ! বাংলায় এসে জন্মেছে। কালে এ জামিয়ার বানাবে।" মামা প্রতিভার কদর জানতেন,—ইস্কুলটা ছাড়িয়ে দিলেন। তাঁরই আশীর্ব্বাদে এখন নিদ্রা ত্যাগ করে জামিয়ার বানাচ্ছি। কাটুতিও তেমনি।"

আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলুম আর ভাবতে লাগলুম—জগতে এসে দিনগুলো বৃথাই কাটিয়েছি, দেখছি সকলেই কিছু না কিছু জানেন। বল্‌লুম—

"বিজ্ঞাপন দেখিনি তো, দেখার লোক পান কোথা?"

"নেবার লোক। অভাব কি? বছরে তিন চারটে বাঁধা খদ্দের আসেই; প্রত্যেকের অন্ততঃ এক ডজন করে চাই। পারলে তিন ডজন করে দিন্ না, অধিকন্তু ন দোষায়, কেউ "চাইনে" বলবে না। অত পেরে উঠিনে, সেজন্য সৎপরামর্শ সামলাতে রাতের ঘুমটাও যায় যায় হয়েছে।"

বল্লুম "না দাদা, ছুঁচের সূক্ষ্ম কাজ এ বয়সে রাত্রে আর কোরো না। পয়সা আছে বটে"—বন্ধু বাধা দিয়ে বল্লেন—"পয়সা"? বললুম—"নাহয় টাকাই হল।"

বন্ধু কথা না কয়ে চট্ বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। একটা গাঁঠ্রি এনে সামনে ধরে দিয়ে বল্লেন—"খুলে দেখনা।"

খুল্তেই কতকগুলো ছোট, বড়, মাঝারি, প্রমাণ, তরোবেতরো কাঁথা বেরিয়ে পড়লো!

বল্লেন—"নির্ভয়ে নেড়েচেড়ে দেখো—নির্ভয়ে নেড়েচেড়ে দেখো। ওতে এখনো আমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার স্পর্শ করেনি। প্রকৃতির প্রতিশোধ আরম্ভ হতে দেরি আছে।"

দেখেশুনে আমিতো স্তম্ভিত!

"চুপ্ করে রইলে যে"?

"না, ভাবছি আমাদের শুভানুধ্যায়ী শাস্ত্রকারেরা অনেক ভুগেই বলে গেছেন—বাঁচতে চাও তো পঞ্চাশ পেরলেই বনে যাও।"

"কি বল্লে,—বন? বন তুমি কাকে বলো?—বাঘভাল্লুক থাকলেই তো বন। তার সঙ্গে চিতে, নেকড়ে, বিচ্ছু—আর কি চাও? এখানে অভাব অনুভব করলে নাকি?"

ও কথা মাথা পেতে মেনে নিয়ে বল্‌লুম—"গৃহস্থালীর ছুঁচের কাজটা সকল দেশেই মেয়েরা"—

বন্ধু বলে উঠলেন—"অম্বল, ভায়া অম্বল! আহারান্তে অমনিতেই বুকে ছুঁচ ফুটতে থাকে, তার উপর আবার হাতে ছুঁচ! বলো কি!" অপ্রতিভের মত বল্‌লুম,—"তাতো জানতুম না, এখন কেমন আছেন?"

বল্‌লেন—"কাশীর গারাভৈরবী দিদি বড় স্নেহ করেন, ওস্তাদও তেমনি, তাঁর ব্যবস্থাতেই বেঁচে আছেন। সিদ্ধা কিনা, চুড়া-বাঁধা চুলে সোনার তারে গাঁথা স্ফটিকের মালা জড়ানো, হাতে জার্ম্মান্ সিল-ভারের high-polish ত্রিশূল; দেহ চন্দনের ক্ষেত। যেমন সৌম্যা, তেমনি ধৌম্যা। তাঁর ট্যেট্‌কাই চল্‌ছে: আহারান্তে ঘড়ি ধরে তিন ঘণ্টা গড়ানো, নাহয় চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য তিন ঘণ্টা তাস খেলা; তাতেও যদি না হঠে, সেকেন্দরী সিকার পাক্কা তিন পো মালাই। শেষেরটিই ব্রহ্মাস্ত্র, পড়েছে কি সব বালাই সাফ্। সেইটিই চলছে।—হ্যাঁ গৃহস্থালী বল্‌ছিলে না! আমার এটা ঠিক্ গৃহস্থালী নয় ভায়া—নিজের গড়া 'গোলেবকালী'। এই যেমন বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি। প্রতিভাবানদের দস্তুরই ওই,—বানানো পথ বাদ দিয়ে চলা।"

আমিও অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবছিলুম; শেষটা Penguin Island-এ পৌঁছে গেলুম নাকি, ইনিই মহাপুরুষ St. Mael নয় তো! তাড়াতাড়ি কাঁথার পুঁট্‌লিটা বন্ধুর হাতে দিয়ে বল্‌লুম—"করেছ কিন্তু সুন্দর, শিল্পকলা একেই বলে, বাঃ।"

বল্‌লেন—"হ্যাঁ আসল চাটিম্ কল্ম,—কুদ্‌রৎ খাঁ যে!" বলেই হাসি-মুখে পুঁট্‌লিটা নিয়ে প্রস্থান। ভাবলুম রেহাই। তা কিন্তু হল না।

পুঁট্‌লি রেখেই পুনঃ প্রবেশ,—"হ্যাঁ, যে কথা বলতে এসেছিলুম; আমাদের বন্ধু অমর এখানে এসেছে। আজ দেখি লোহালক্কড়ের দোকানে দ্বিতীয় প্রহরের রোদটা মাথায় করে ছুটোছুটি করছে। আহা তার তো পেন্‌সন্ নয়, এ আরাম পাবে কোথায়; কলকাত্তায় Hardware-এর দোকান। তাকে বল্‌লুম, "এত বেলায় এই রোদে করছ কি, অসুখে পড়বে যে। বিশেষ দরকারী কিছু নাকি? ছাতাটা ফেল্‌লে কোথায়?" অমর হেসে বললে—"যাতে দু' পয়সা আছে, তাই দরকারী; এই দেখনা ঘণ্টা দেড়েক ঘুরে দেড়শো টাকা ঘুরিয়ে আনলুম। ভেবনা, আমরা রোদেজলেই মানুষ, ছাতা নেওয়ার বদ অভ্যাস নেই। অসুখ বলছ! অ-রোজগারের চেয়ে আর বসে থাকার চেয়ে অসুখ আছে নাকি?" এই বলে হি হি করে হেসে 'ক্যা ভাইয়া' বলেই একটা লোহার দোকানে ঢুকে পড়্‌লো।

"ওর জন্যে বড় দুখ্‌খু হয় ভাই, পেন্‌সন্ পেলে আজ,—আহা ভাগ্য! বুঝছতো,—কি বল? তবে পয়সার প্রেম ওকে যৌবনের বল যুগিয়ে জোয়ান করে রেখেছে। আর আমি বেটা 'চিন্তামণি' হয়ে রইলুম হে!"

"সে আবার কি,—ভগবতী থেকে চিন্তামণি হলে কবে?"

"ভগবতী তো বটেই, এটা ছেলেদের কাছে প্রমোশন্-পাওয়া খেতাব!"

"বুঝতে পারলুম না তো।"

খুব সোজা, ঠেকে একটু কঠিন বটে। এই পেন্‌সন্ নেবার পরের কথা গো, তখন দেশেই ছিলুম। গরুটা সাত মাস গাভিন্, কি করে বেরিয়ে পড়েছে, সন্ধ্যা হয়, ফেরেনা। চঞ্চল হ'তে হল। ছেলে

আর হবে কি, বাতে কাত করে রেখেছে। যাহোক্, সুক্ষণে কি কুক্ষণে, কড়াইসুঁটির কচুরী হতে দেরি হওয়ায়, বাবাজীরা আটুকে গিয়েছিলেন, তখনো বাড়ী ছিলেন। বল্‌লেন—"ভাবছেন কেন, আমরা দেখছি।" শুনে কতটা সাহস আর আনন্দ পেলুম, বুঝতেই পারছ। ভগবানের কাছে তাদের কুশল আর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করলুম। বাতের বেদনা ভুলে গেলুম, আনন্দাশ্রু বেরিয়ে এলো। পুত্রহীনদের জন্যে পরম আপশোষ অনুভব করতে লাগলুম। আহা, তারা কী দুর্ভাগা! মজ্জায় মজ্জায় মনে হ'ল—পুত্র plus পেন্‌সন্ equal to Paradise। বললুম—

'তাহলে আর দেরি করিস্ নে বাবা, কালা-গরু সন্ধ্যে হয়ে গেলে দেখতে পাওয়া শক্ত হবে। হিঁদুর দেশ, কোন্ ব্যাটা বেড়ো মেরে খেঁড়ো গাইটে সাবাড় করে দেবে; বেরিয়ে পড়ো যাদুরা।'

তাদের গর্ভধারিণী আড়ানা-বাহারে বলে উঠলেন,—"বাছাদের কি খেতেও দেবেনা,—এখনো পাঁচখানাও যে পেটে পড়েনি। তোমার তাড়ায় বসেনি পর্য্যন্ত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখে দিচ্ছে"।

অর্থাৎ—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, কেশ আর কচুরী, দুয়ের সেবাই চলছে। যাক্, চুল ফিরিয়ে, পাঞ্জাবী পরে, পম্প্‌সু মেরে গরু-খোঁজা বেশ সেরে, চট্ করে বিশ মিনিটের মধ্যেই তারা বেরিয়ে পড়্‌লো।

বাতের তেলের বিদ্‌খুটে গন্ধ সারাদিন ভোগ করবার পর, সহসা সুমধুর সৌরভে ঘরটা ভরে যাওয়ায়, নিঃশ্বেস টেনে—আঃ! কি আরামই পেলুম! ছেলেরা বোধহয় রুমাল টেনে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে গেল। ব্রাহ্মণীকে ডেকে বললুম—,কচুরীগুলো সবই ফেলে গেল

নাকি? রেখে দাও, এসে খাবে'খন। আমাকে একখানা দাওতো দেখি—কেমন বানালে।"

বল্‌লেন—'গোণাগুণ্‌তি করেছিলুম, তার আবার ফেলে যাবে কি,—সোমত্ত বয়েস,' ইত্যাদি বহুৎ।

বল্‌লুম—"যাক্‌, বোধহয় ভালই হয়ে থাকবে।"

বল্‌লেন—"মন্দ হলে ওরা মুখে করত কিনা!"

"রাম কহো, ওরা সে ছেলেই নয়!"—পুত্রগর্ব্বেই বোধহয় আবার বাতের বেদনা ভুলে গেলুম। চিন্তায় চুর হয়ে কেবল কালা-গরুই ভাবছি—সাতটা বাজলো, আটটায় ঘা দিলে,—এই আসে। গরু এলনা, নটার আওয়াজ এলো! কান দুটো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। সে কী প্রতীক্ষা!

তদুপরি ব্রাহ্মণী তর্জ্জনসহ বল্‌লেন (যেহেতু পেন্‌সন্‌ আর তর্জ্জন কবিতায় শ্রেষ্ঠ মিলন নাহলেও উভয়ে পরম আত্মীয়)—"ছেলেগুলো ঘুরে ঘুরে গেল, এখন্‌ তারা ফিরলে যে বাঁচি। কেবল গরু, গরু, আর গরু, আর সোনার চাঁদ ছেলেরা হল ওঁর গরুর চেয়ে কম।"

"কি বল্‌ছ গো! এমন কথা আমি কখনো ভুলেও যে ভাবিনি; আর যা বলো বলো এত বড় মিথ্যা অপবাদটা আমাকে দিওনা গিন্নি"।

একখানা মোটর এসে সশব্দে থামলো। এত রাত্রে আবার কে! বোধহয় রহিম মিঞা বিজয়ার নমস্কার করতে এসেছে, মোটরে আর কে আস্‌বে! সে আমাদের সইস্‌ ছিল, এখন তার সময় ভাল। আজ দু'বছর আসছে; শুধু হাতে আসবার লোক সে নয়।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে, ধামা চেঙ্গারি লুকিয়ে রাখতে ব্রাহ্মণী দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের প্রবেশঃ—

"পাঁচ টাকা দশ আনা Taxi-ভাড়াটা চট্ করে দিনতো। বেটাকে ছ'টাকা দেবে, না আরো কিছু! দিন্, আর দেরি করবেন না, বজ্জাৎ বেটা লাভের ছ' গণ্ডা টেনে নেবে, দিন্।"

ভাঙ্গানো ছিল না, ছ'টাকাই হাতে দিতে হল।

"শ্যামলীকে কোথায় পেলি?"

"সে অনেক কথা—বলছি," বলেই বেরিয়ে গেল।

যাক্, গাভিন গরুটা যে পাওয়া গেছে, সেইটেই পরম শান্তি, দুর্ভাবনা গেল। উপরি লাভ "পাইভয়েরের" পরিমল। অকৃত্রিম মহামাস তেলটা খানিকক্ষণ মগজ মথন করবে না।

পাশের ঘর থেকে মাতাপুত্রের কথোপকথন শ্রবণ জুড়িয়ে দিতে লাগলো! স্বকৃত ব'লে সে কি একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভূতি! সংসারের সুখই এই! সবই ভাগ্যসাপেক্ষ। দেখনা, এরা আদিতে কেউ ছিল না, মধ্যে কোথা থেকে উড়ে এসে এই মধুচক্র রচনা করেছে, "গৌড়জন যাহে"—বুঝেছ তো—

গুণ্ গুণ্ রবে, কেমন সুখেতে সব
মধু পান করে!

নয় কি! আবার—God forbid, অন্তেও কেউ থাকবেনা; অবশ্য আমার প্রাণান্তের পর!

একেই বলে—ভগবৎলীলার শিলাবৃষ্টি। আদিতে জল, অন্তে জল, মধ্যে মাথা সামলাও!

যাক্, আনন্দোচ্ছ্বাস কিনা, সামলাতে পারিনে।

মোদ্দাটা শুনলুম—বাবাকে চট্ করে' নিশ্চিন্ত করবার তরে বাবাজীরা মোটর নিয়ে গরু খুঁজতে রওনা হন। হোটেল্, বায়স্কোপ, কিন্নরী সেরে, ইডেন ঘুরে হয়রাণ হয়ে ফিরেছেন। বলছেন—গড়ের মাঠে যে গরু মেলেনা, সে গরুই নয়। এক গন্ধবণিক বন্ধু ব'লে দিয়েছেন,—"মহামাস তেলের গন্ধেই গরু পালিয়েছে, তোমরা সাবধান। একটা ক্যানেঙ্গা ওয়াটার কিনে নিয়ে যাও।" দেড় টাকা দিয়ে কিনতেই হল। সে গরু আর ফিরছে না। বাবার দোষেই তো এইটি হল! ও তেল আর মাখতে দিচ্ছিনে, হ্বাথ্ গেট্ থেকে দু'বোতল নিয়ে তবে ফিরেছি! মাথায় মাখাই তাঁর দরকার, সোজা কথাগুলিও আর ওঁর মাথায় আসছে না। রোজ এক টাকার দুধ কিনলেই হয়,—তা বুঝবেন না!

বামাস্বর শোনা গেল,—"আগে তো এমন ছিল না, কাছারী যাওয়া ঘুচিয়ে এসেই বুদ্ধিশুদ্ধি বিগড়ে গেল। এক হাবাতে বাত জুটিয়ে দিনরাত বসে আছেন, বেরুতে বললেই বেদ্না বাড়ে। শুধু কেনবার কথা পাড়লেই বলে বসে আছেন—টাকা আসবে কোথা থেকে!"

বাবাজী বলে উঠ্লেন—"সে তুমি ভেবনা মা,—যে খায় চিনি, তাকে যোগান চিন্তামণি।"

শুনলে ভায়া! গরু গেল, গরু-খোঁজার মোটরভাড়া গেল, উপরন্তু সাত সেলামী! এখন "চিন্তামণি" বানিয়ে রেখেছে! যা চাই যোগাতেই হবে। নান্য পন্থা—বেঁচে থাকতে— বিদ্যতেঽয়নায়! কি বল?

বলব আর কি, শুনে স্তম্ভিত হলুম, একটু হাল্‌কা বোধও করলুম।

বন্ধু আর দাঁড়ালেন না। যাবার সময় যে হাসিটে মুখে করে নিয়ে গেলেন, সেটা আমাকে বেদনাই দিলে।

তাঁর রুটীনের রপট্ট শুনে শিউরে উঠেছিলুম।

এখন উপায় ?

ভাবলুম,—পেন্‌সনারের-পিঁজ্‌রাপোলে যাওয়াই ভাল। কাশী রওনা হয়ে পড়লুম।

ওঁ শান্তিঃ।

৺কাশীধাম।
২৭ ডিসেম্বর
১৯২৬।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপসংহার।

—:*:—

আজ আমি আপনাদের কাঁছে বিদায় নিচ্ছি। সেই সূত্রে দু চারটি কথা বলতে চাই। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, যে সাহিত্য নিয়ে আমি কারবার করি, সে সাহিত্যের সঙ্গে দিল্লীর কোন সম্পর্ক নেই। কথাটা কোন্ হিসেবে সত্য, তা বলছি।

বঙ্গ-সাহিত্যে "মানসিংহ" নামক একখানি কাব্য আছে, যা দিল্লীর কথায় পূর্ণ। তবে ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সঙ্গে যে দিল্লীতে গিয়েছিলেন, সে দিল্লী এ দিল্লী কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ মজুমদার মহাশয় যে পথ দিয়ে দিল্লী গিয়েছিলেন সে পথ, আমি যে পথ দিয়ে এসেছি, ঠিক তার উল্টো। তিনি বাঙলা থেকে প্রথমে যান পুরী, পুরী থেকে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ থেকে গুজরাট, তার পর গুজরাট থেকে এক লম্ফে দিল্লী।

এ দিল্লীর সাক্ষাৎ অবশ্য জিওগ্রাফিতে মেলে না। তবে হিষ্টরীর সাহায্যে আন্দাজ করা যায় যে, ভারতচন্দ্র এই দিল্লীর কথাই বলেছেন। কারণ ভবানন্দ মজুমদার জাহাঙ্গির বাদশার কাছে ইনাম নিতে এসেছিলেন।

মজুমদার মহাশয়ের ভৃত্যদ্বয় দাসুবাসুর মুখে দিল্লীর যে কথা শোনা যায়, তাতে ঘর ছেড়ে এতদূর আস্‌তে কোন বাঙালীর মন সরে না। দাসুবাসু এই বলে তাদের আক্ষেপ সুরু করে যে—

হেদে বামুনের ছেলে আগুপিছু নাহি চেলে
দিল্লী এলে করিতে রাজাই।

আমিও "বামুনের ছেলে," আর দিল্লী এসেছি "রাজাই" করতে। এ যুগে সভাপতি-গিরি করা এক রকম "রাজাই" করা, আর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে বোধহয় আর রাজারাজড়া থাক্‌বে না; থাক্‌বে সুধু প্রেসিডেন্ট্। দাস্‌বাসুর কথা শুনে, আমি মনে মনে অনেকরকম "আগুপিছু চেলে"—অর্থাৎ ইতস্ততঃ করে, আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি। উপস্থিত যে হয়েছি, সে আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। প্রবাসী বাঙালীর অতিথি-বৎসলতার কথা পূর্ব্বে শুধু শুনেছি, এখানে এসে তার সম্যক পরিচয় পেলুম। আপনাদের আদরযত্নে এক' দিন আমার এতটা সুখে কেটেছে যে, আমি যে বাড়ীতে নেই, এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে হয়নি।

প্রবাসী বাঙালীদের এই সাহিত্য-সম্মিলন দেখে আমার বুক আশায় ভরে উঠেছে। আপনারা যে-ভাবে আমাদের সাহিত্যের চর্চ্চা করছেন, তার ফলে বঙ্গ-সাহিত্য নূতন ঐশ্বর্য্য লাভ করবে।

সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে এ সভায় যে-সব প্রবন্ধ পড়া হল, সে সবের ভিতরেই সার আছে, বিশেষত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলির ভিতর। বাঙলাদেশে ইতিহাস সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ রচনা করতে হলে, আমাদের বই খুলে পড়তে বসে যেতে হয়, আর নাহয়ত এ অঞ্চলে ছুটে আসতে হয়। কিন্তু আপনাদের চোখের সুমুখে গত হাজার বৎসরের পুরাতত্ত্ব পড়ে রয়েছে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা অধ্যাপনার কাজ হাতে নিয়েছেন, তাঁরা যদি চারপাশের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণগুলির সাহায্যে নূতন ইতিহাস রচনা করেন, তাহলে আমাদের

সাহিত্যকে আপনারা সবিশেষ সমৃদ্ধ করতে পারবেন। তারপর এ সম্বন্ধে যত কিছু পুঁথিপত্র, সব এদেশেই ফার্সি ভাষাতে লিখিত রয়েছে। যাঁরা ফার্সি জানেন, তাঁরা সে সাহিত্য থেকে ঐতিহাসিক সত্য সহজেই উদ্ধার করতে পারবেন। আর যাঁরা জানেন না, তাঁদেরও ও-ভাষা আয়ত্ত করতে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে না। শুনতে পাই যে, প্রাচীন ভাষার মধ্যে ফার্সি সব চাইতে সোজা। সুতরাং আমার অনুরোধ এই যে, আপনারা এ দেশের মধ্যযুগের ইতিহাসের সম্যক চর্চ্চা করুন।

এ সভাতে আমি বাঙলার নব গল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে কড়া সমালোচনা শুনেছি। সে সমালোচনা যে অন্যায্য; এমন কথা আমি বলতে চাইনে। তবে আমি পূর্ব্বে বাঙলায় এই গল্প-সাহিত্যের স্ফূর্ত্তিকে আশার কথাই বলেছি। এ সাহিত্যের প্রাচুর্য্য থেকেই অনুমান করা যায় যে, লেখবার অদম্য প্রবৃত্তি অনেকের মনে জেগে উঠেছে। একে আমি আশার কথা মনে করি এই কারণে যে, কোনও কিছু না করবার প্রবৃত্তিই হচ্ছে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; বিশেষত লেখা সম্বন্ধে ত নিশ্চয়ই তাই। লেখকদেরও একটা লেখা সুরু করে আর একটা লেখা ধরতে দারুণ অপ্রবৃত্তি হয়। রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি তাঁরও হয়। বহুলোকের মনে সাহিত্য সৃষ্টি করবার প্রবৃত্তি যে জন্মলাভ করেছে, এটাকে আমি বঙ্গ-সাহিত্যের সুলক্ষণই মনে করি। কেননা আগে আসে প্রবৃত্তি, তার পরে কর্ম্ম।

আর একটা অভিযোগও এ ক্ষেত্রে শুনেছি। বঙ্গ-সাহিত্য নাকি সুধু কোমলতারই চর্চ্চা করছে। যদি তাই হয়, তাতেও কোন আক্ষেপের কারণ নেই। আমাদের সাহিত্যের সুর যদি শুধু কোমল

হয়, আমাদের সংবাদপত্রের সুর ত আগাগোড়া কড়া। এ দেশের খবরের কাগজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুণ, দেখতে পাবেন তাদের সকলেরই চোখ লাল।

সাহিত্যের সুর একটু কোমল হবারই কথা। কোনও বিষয়ে বেজায় উত্তেজিত হলে, সে বিষয়ে সাহিত্য রচনা করা যায় না। রাগ করে কলম ধরলেও, কলমের মুখে রাগের কথা বেরয় না। কলম হাতে করলেই মন শান্ত হয়ে আসে। কথায় বলে রাগই পুরুষের লক্ষণ, কিন্তু ও-গুণ কবির ধর্ম্ম হয়। সাহিত্য রাগের কথা নয়, রাগিণীর কথা। সুতরাং সাহিত্যিক মাত্রেই জানেন কোথায় কোমল সুর লাগবে, কোথায় তীব্র। সংবাদপত্রের তীব্র সুর শুনে আমরা যখন মনে মনে প্রমাদ গণিনে, তখন সাহিত্যের কোমল সুর শুনেও অ-সাহিত্যিকদের ব্যতিব্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

আপনারা আমাদের অবসর-বিনোদনের জন্য "ডাকঘরের" অভিনয় করেছেন। শারীরিক অসুস্থতা হেতু সে অভিনয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পারিনি। কিন্তু তার বিবরণ আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে শুনে খুসি হয়েছি। সে আমাকে বলেছে যে, কোন কোন স্থলে দিল্লীর অভিনয় কলকাতার অভিনয়ের চাইতেও ভাল হয়েছে। কলিকাতাবাসী একটি বাঙালীরও যে আপনাদের অভিনয় এতটা ভাল লেগেছে এ কথা শুনে আপনারা অবশ্য খুসী হবেন। এখন তবে আপনাদের প্রণাম করে বিদায় হই।

(দিল্লী প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির বক্তৃতার সার মর্ম্ম। শ্রীঅবনী নাথ রায় কর্ত্তৃক অনুলিখিত।)

দিল্লীর সম্মিলনী ও "ডাকঘর"।

—— ০ঃ*ঃ০ ——

দিল্লী প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" অভিনীত হয়েছিল। প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতিনিধিরা এবং সভাপতি মহাশয় ও বঙ্গ-সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি যাঁরা কলকাতা থেকে এসেছিলেন, সকলেই এই অভিনয় দেখে খুসী হয়েছেন। সুতরাং এ বিষয়ে যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন।

এই বইখানি নির্ব্বাচনের একটু ইতিহাস আছে। এখানি অভিনয় করবার কথা কেউই সাহস করে বলতে পারছিলেন না। কেউ বল্‌ছিলেন, এটা highly intellectual ব্যাপার, এ অভিনয় দেখে প্রতিনিধিদের চিত্ত-বিনোদন হবে না; সমস্ত দিন প্রবন্ধাদি শোনবার পর নিরাবলম্ব মন যখন একটু আরাম খুঁজবে, তখন "ডাক-ঘরে"র অবতারণা করলে bread-এর পরিবর্ত্তে stone দেওয়ার মত হবে। অর্থাৎ প্রতিনিধিরা চোখের খোরাকের বদলে মনের খোরাক পেয়ে, নারাজ হবেন। আবার কারোর বা ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথ "ডাকঘর" আর যে কারণেই লিখুন না কেন, অভিনয়ের জন্যে নিশ্চয়ই লেখেন নি—কেননা তা'হলে তিনি এর মধ্যে গান দিতে পারতেন (বিশেষ গান বাঁধাটাও যখন তাঁর আসে)। এটা

drawing-room-এ বসে বন্ধুমহলে পড়লেই বেশি উপভোগ করা যায়।

এ সব যুক্তিবাণের উত্তর প্রয়োগ করাও ভারি শক্ত—কেননা তাহলে কাউকে না কাউকে বিদ্রূপ করবার ভয় আছে—সেটা বড় বাঞ্ছনীয় নয়, বিশেষ এই পাঁচজনের কাজে। তবে আজ এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, প্রতিনিধিদের মনের পরিধি যথেষ্ট elastic; তাঁরা দিনের বেলায় সাহিত্য-চর্চ্চা করেও রাত্রের সাহিত্য-চর্চ্চায় যোগ দিতে পেরেছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁদের মন সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করে ঠকিনি। কেননা মানুষের মন রসের একটি মধুচক্র বিশেষ। Canute-এর হুকুমে এতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে তার মনের রস নিঃশেষিত হবে—এত বড় ভবিষ্যদ্বাণী মানব-মনের পক্ষে বোধহয় করা চলে না। মানুষের মন ও শক্তি সীমাবদ্ধ নয়। দ্বিতীয় কথা, "ডাক্ঘরে" গান আছে কিনা জানিনে, কিন্তু সুর যে আছে, এ কথা বল্‌তে পারি। "দই, দই, দই, ভাল দই" —"ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং"—এর মধ্যে যে সুদূরের, যে চিরন্তনের সুর সমস্ত পার্থিব এবং অপার্থিব, সমস্ত পরিদৃশ্যমান এবং অপরিদৃশ্যমান জগতকে যুক্ত করছে, তার আবেদন মানব-মনের কাছে কোন্ গানের চেয়ে কম?

আমাদের কেবল এই কথাটা ভাব্‌বার ছিল যে, নাট্য-জগত আজ কোন্ আদর্শকে মেনে চল্‌বে? "বিদ্যাসুন্দর", গয়াসুরের "হরিপাদ পদ্মলাভ" প্রভৃতির যুগ যে গত হয়েছে, এটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। "সিরাজুদ্দৌলা", "প্রতাপাদিত্য", "রঘুবীর"-এর যুগ গত না হলেও গত-প্রায়। তারপর আমাদের মন কোন্ আদর্শকে আঁকড়ে

ধরতে চাইছে? স্বাদেশিকতা বড় জিনিষ সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশ্বজনীনতাই আজকের দিনের সাধনার আদর্শ। আমাদের মন আজ স্বাদেশিকতার গণ্ডী ডিঙিয়েছে, তাই আমরা বিশ্ব-ভারতীর প্রসাদ ভিক্ষা করেছি।

শ্রীঅবনীনাথ রায়।
দিল্লী।

দশম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

——⁘*⁘——

মানুষ স্বভাবতঃই সুন্দর বস্তু ভালবাসে। সৌন্দর্য্যানুরাগ মানুষের জীবনীশক্তির একটি অভিব্যক্তি বলা যেতে পারে। যে সকল জাতি সভ্যতার নিম্নতম স্তরে আছে, তাদের মধ্যেও আপনার দেহ, বেশভূষা বা পারিপার্শ্বিক বস্তুসকলকে পরিপাটি ও সুন্দর করে' সাজাবার চেষ্টা দেখা যায়। তাদের কড়ির মালা বা পালখের মুকুট সভ্যতাভিমানীদের হাস্যোদ্রেক করতে পারে, কিন্তু এ সকল যে তাদের সৌন্দর্য্যপ্রীতির নিদর্শন, ও সেই সৌন্দর্য্যপ্রীতিকে কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টার ফল, এ কথা ভুল্‌লে চলবে না।

এই সৌন্দর্য্যানুরাগ ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রয়াস স্থান ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু সর্ব্বত্রই এটি জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্যই সূচনা করে। ব্যবহারিক জীবনের সকল প্রয়োজন সাধন করে' যে শক্তি উদ্বৃত্ত থাকে, তাকেই প্রচুর বলা যায়। যখন মানুষের জীবনীশক্তি প্রচুর পরিমাণে থাকে, তখন সে যেমন-তেমন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে' সন্তুষ্ট থাকতে পারে না; জীবনকে সুন্দর করে', সৌষ্ঠবসম্পন্ন করে' তবে সন্তুষ্ট হয়। মানুষের জীবনীশক্তি অশরীরী পদার্থ, সাকার কোন দ্রব্যের অবলম্বন ব্যতীত আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না। সেই হেতু, যা' তার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, —মানুষের জীবন,—তাকেই অবলম্বন করে' আপনার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির

আবেগ তৃপ্ত করে। জীবনের বাইরের আবরণ, তার জড় অংশ, অর্থাৎ দৈনিক জীবনের প্রয়োজনীয় অশন, বসন, ভূষণ ও বাসস্থানের উপরেই স্বভাবতঃ তা'র দৃষ্টি প্রথম পড়ে। সকল জাতির ভিতরেই তাদের দৈনন্দিন জীবনের এই সকল জড় বস্তুকে সুন্দর করে' তোলবার প্রয়াস অল্পাধিক পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু অন্তর্নিহিত যে ভাবের প্রেরণাকে কোন জাতি বাইরে মূর্ত্ত করে তোলবার চেষ্টা করছে, সেই প্রয়াসের সফলতা দিয়েই যদি সেই ভাবের গৌরবের বিচার করা যায়, তাহ'লে অনেক সময় অবিচারই করা হয়। কারণ, প্রেরণা সর্ব্বদাই ও সর্ব্বত্রই তার বাইরের অভিব্যক্তির অপেক্ষা উচ্চতর ও বৃহত্তর বস্তু। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর ও যে উপাদান নিয়ে কায করতে হয়, বাইরের অভিব্যক্তি তার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে; কিন্তু অন্তরের প্রেরণা দেশ, কাল বা উপাদানের সঙ্কীর্ণতার শাসন মানে না। অবশ্য জড়জগতের প্রভাব যে মনোজগতের উপর আদৌ নেই, এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। তবে কোন জাতির মনোজগতের সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাটা বুঝতে পারলে যে তার শিল্পকলার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমরা অধিক পরিমাণে সুবিচার করতে পারবো, সে বিষয় সন্দেহ নেই। পর্ব্বতবর্জ্জিত বালুকাময় প্রান্তরে বর্দ্ধিত বেবিলনীয় সভ্যতা গ্রীক সভ্যতার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাস্কর্য্যকীর্ত্তি রেখে যেতে পারে নি বলে', শুধু সেই কারণেই তাকে হীন পদবীতে ফেল্‌লে তার প্রতি সুবিচার করা হবে না। তার সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষার উৎকর্ষ দিয়েই তার কৃতকার্য্যতার বিচার করা উচিত। মানসিক ঐশ্বর্য্যই জাতির প্রকৃত ঐশ্বর্য্য, এবং এইখানেই তার জীবনীশক্তির প্রকৃত মাপ পাওয়া যায়।

কেবল দৈহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতেই যদি জাতির সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়ে যায়, তাহ'লে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করবার জন্য আর তার কিছু সঞ্চয় থাকে না। সেই জন্য দারিদ্র্যভার প্রপীড়িত-জাতির মধ্যে নিছক সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আশা করা বৃথা। এখানে দারিদ্র্য অর্থে ধনাভাব অবশ্য নয়। খুব ধনী জাতির মধ্যেও যদি অর্থের অনটনের ভাব মনে থাকে, তা'হলে তাকে দরিদ্র বলতে হবে। অর্থাভাবের অনুভূতিই দারিদ্র্য। আমেরিকায় অজস্র অর্থাগম সত্ত্বেও তা'র অর্থাভাব মিট্‌ছে না, এবং অসীম ধনের অধিপতি হয়েও শিল্পকলায় আমেরিকা প্রায় রিক্ত হয়েই আছে। অপেক্ষাকৃত নির্ধন হলেও ফ্রান্স বা ইতালীতে অর্থাভাববোধটা অনেক কম; তাই ফ্রান্স ও ইতালী শিল্পকলার বিলাসভূমি। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অর্থের পরিমাণ হয়ত এখন অপেক্ষা অল্পই ছিল, কিন্তু অর্থাভাববোধটা ছিল আরও অল্প। আজকাল একজন সাধারণ ভারতবাসীর সকল শক্তি তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন আহরণ করতেই নিঃশেষ হয়ে যায়; অথচ অধিকাংশ স্থলে সকল প্রয়োজন আহরণ করাও ঘটে ওঠে না। ফলে আমাদের, সাধারণ ভারতবাসীদের, জীবনের মত সৌন্দর্য্যলেশহীন জীবন বোধহয় আর কোন দেশে নেই। সুষমাহীন বৈচিত্র্যহীন একটা অসাড় অবসাদ ও রুদ্ধ অসন্তোষের ভিতর আমাদের নিরানন্দ জীবন কেটে যায়।

জীবনে আনন্দের অভাব আমাদের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দৈন্যের একটা প্রধান কারণ। নিরুদ্বেগ অনাবিল আনন্দ না হ'লে কোন সৃষ্টিই হয় না,—আনন্দাধার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ত দূরের কথা। প্রত্যেক মনোবৃত্তিই জীবনীশক্তির উপর, ভালই হোক্ বা মন্দই হোক্, কোন না

কোন প্রভাব বিস্তার করে। তার মধ্যে বোধহয় ভয়ের মত কোন মনোবৃত্তিরই প্রভাব এত বিষাক্ত নয়। ভয়ার্ত্ত প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয়ই সঙ্কুচিত ও ক্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে। আকস্মিক ভয়ের অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী অতীব্র ভীতি অধিক ভয়ানক। এরূপ ভয়ের প্রভাবে মানুষের সমস্ত বীর্য্য ক্রমে ক্ষয় হয়। সাধারণ ভারতবাসীর জীবন কিরূপ ভীতি ও উদ্বেগপূর্ণ, তা' বলাই বাহুল্য। শৈশব ও কৈশোরে গুরুজনের ভয়, চাকুরীজীবীদের প্রভুর ভয়, জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হারানোর ভয়, কুসংস্কারবদ্ধ জাতির অনাগত অজ্ঞাতের ভয় ও হৃদয়হীন অন্ধ অচল সমাজের শাসনের ভয়। এইরূপ ভয়সঙ্কুল উদ্বেগপূর্ণ জীবন যে ক্রমে আমাদের পক্ষে দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠেছে ও চারিদিকে অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠেছে, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই ভয়ের আবহাওয়ার ভিতর যে কোন সুকুমার শিল্পই ফুটতে পারে না, তা আমাদের শ্রীহীন জীবন দেখলেই বুঝতে পারা যায়; কারণ অসীম আনন্দই শিল্পের প্রাণ। এখানে ফুটতে পারে কেবল দুঃখবাদপূর্ণ দর্শন এবং সহজলভ্য মুক্তির অনুসন্ধানে ভক্তিমার্গ ও তন্ত্রশাস্ত্র।

বাধাহীন নিরুদ্বেগ অনাবিল জীবনের আনন্দই সুকুমার শিল্পের প্রাণ। এই আনন্দ আপনার ভিতর থেকে স্বতঃপ্রণোদিত প্রেরণাবশে বাইরে সহস্র আকারে আপনাকে চরিতার্থ করবার জন্য চেষ্টিত হয়। এই চেষ্টা সফল করবার জন্য অবশ্য একে ব্যবহারিক জীবন থেকে উপাদান আহরণ করতে হয়। এই সকল আহৃত উপাদানকে এরূপ-ভাবে সম্বদ্ধ, স্থানন্যস্ত ও বাধিত করতে হয়, যাতে মনোরাজ্যের অন্তর্গত অনবদ্য পূর্ণতার আদর্শটি বাইরে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে পারে। কোন জাতি বা শিল্পকলা বুঝতে হ'লে সেইজন্য প্রথমে সেই জাতির

দার্শনিক মতবাদ জানা বিশেষ আবশ্যক। কিরূপ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবের সংঘাতে জাতির শিল্পের আদর্শ গড়ে উঠেছে, তা' জানতে হ'লে সেই জাতির মনস্তত্ত্বের ইতিহাস অধ্যয়ন করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই; এবং এই আদর্শ না জানলে তার ফলিত শিল্পের উৎকর্ষ বুঝতে পারাও অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে এ কথা ভোলা উচিত নয় যে, জাতির মনস্তত্ত্বের একটা ক্রমবিকাশ আছে, ও সেটি না জানলে যে-কোন যুগে যে-কোন জাতির যে-কোন বিশেষ কৃতকর্ম্মের পরিমাপ করা যায় না। এ বিষয়ে অমনোযোগের জন্য বিশেষজ্ঞদের গবেষণা, একটি বিশেষ যুগে একটি বিশেষ শিল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা, অনেক সময় বালকোচিত ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ দেখা যায়।

কোন জাতির চারুশিল্প বিশেষভাবে বুঝতে হ'লে তার চিন্তাসম্ভার আলোচনা করা আবশ্যক বটে, কিন্তু এই আলোচনায় সকল সময় শিল্প-সৃষ্টির মূলসূত্র পাওয়া যায় না। অবশ্য সে জন্য হতাশ হলে চলবে না। উচ্চশ্রেণীর শিল্পসৃষ্টি জাতীয় মনের ভাবৈশ্বর্য্য ও বিবেকের মধুর সংমিশ্রণের ফল। দর্শন-শাস্ত্র প্রধানতঃ প্রজ্ঞার উপর অত্যধিক জোর দেয়; ফলে, তা' থেকে সকল সময় জাতীয় মনের ঠিক স্বরূপটির সম্যক উপলব্ধি হয় না। সেজন্য সেই জাতির অন্যান্য সকলপ্রকার সাহিত্যের অনুশীলন আবশ্যক—ধর্ম্মগ্রন্থ, নীতিশাস্ত্র, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, সকল দিক দিয়ে তা'র জাতীয় মনের কিরূপ পরিণতি হয়েছে, তা' বুঝতে পারলে তবে জাতীয় শিল্পের সম্যক রস গ্রহণ করা বা বিচার করা সম্ভব। গাছ যেমন ভুমি থেকে রস আকর্ষণ করে' এবং আলোক ও বায়ু থেকে জীবনোপযোগী উপাদান আহরণ করে' পরিণত হয়, ও পূর্ণ পরিণতি পেলে তবে তাতে কুসুমোদ্গম হয়; জাতীয় মনও

তেমনই নানা গবেষণা ও চিন্তায় পরিপুষ্ট এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বর্দ্ধিত হলে তবে তার সঞ্চিত অনুভূতি ও ভাবরাজিকে বাইরে চারুশিল্পের আকারে মূর্ত্ত করে' তুলতে পারে। যখন কোন জাতির মন চিন্তাসম্ভার ও ভাবৈশ্বর্য্যে মেঘবিলম্বী বায়ুমণ্ডলের মত ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, তখনই তা' নানা শিল্পবর্ষণে নিজের লঘুতা সম্পাদন করে।

কোন জাতির শিল্পের মূলসূত্র খুঁজতে গিয়ে তা'র চিন্তাপ্রসূত অন্যান্য ফল দেখে তা'র মনের পরিণতি আমাদের বুঝতে হয় বটে; কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক মত গড়ে' ওঠবার অপেক্ষায় শিল্পসৃষ্টি কখনও বসে থাকে না। শিল্পী তার অন্তরের প্রেরণাবশে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করে যায়। হয়ত তা'র মনে অনেক সময় সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দার্শনিক মত আদৌ স্পষ্ট থাকে না, ও এরূপ মত বাক্যে প্রকাশ করতে গেলে হয়ত পদে পদে তার অসঙ্গতি ধরা পড়বে। প্রকৃত কবি কখনও গুণে'-গেঁথে কবিতা লিখতে পারে না, ছন্দ তার আপনাহতেই আসে। অবশ্য ছন্দঃশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকলে কবির সাহায্য হয়। সেইরূপ সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দার্শনিক মতবাদ ও ব্যবহারিক নিয়মাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে শিল্পীর কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়, তা'র সৃষ্টির বাহ্যিক সৌষ্ঠব সম্বন্ধে আর কোন উৎকণ্ঠা থাকে না, এ কথা সত্য। কিন্তু প্রকৃত প্রতিভা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালেই বাইরের নিয়মাবলীর উর্দ্ধে ও সে বিষয় উদাসীন থেকেই আপনার চরিতার্থতা সম্পাদন করে। কালক্রমে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক মত গড়ে' ওঠে; ও পরবর্ত্তী শিল্পীগণ, অন্ততঃ স্বল্প-প্রতিভা-শালী শিল্পীগণ, এ সকল মতের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

সেই জন্য শিল্প শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে, দার্শনিক মতবাদ ও সেগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ—এই উভয়ের পরস্পরের উপর প্রভাব বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক।

যে সকল উপাদান অবলম্বন ক'রে' শিল্পের অমূর্ত্ত মতগুলি প্রথম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তা' আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক জড় পদার্থ—অশন, বসন, ভূষণ ও বাসস্থান। চিরন্তন মানুষ তা'র দেবতায় পূর্ণতা ও নির্ম্মলতার যে আদর্শ কল্পনা করে' এসেছে, সেই দেবতার কাল্পনিক জীবনের জড় প্রয়োজনগুলিও বাদ যায় না। বরং এইখানে ভাব-প্রাচুর্য্যবশতঃ তার শিল্পেরও বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায়। দৈনিক জীবনের ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি কিন্তু অধিকাংশই বড় নশ্বর। সেই হেতু প্রাচীন জাতিসমূহের শিল্পসাধন অনুশীলন করবার উপাদান খুব প্রচুর নয়। আরও এক কথা এই যে, যেমন একদিকে নিত্য-প্রয়োজনীয় বলে' সেগুলিকে সুন্দর করবার প্রয়াস প্রথমেই স্বাভাবিক, তেমনি সেগুলি নশ্বর বলে সে প্রয়াস বেশী পরিশ্রমসাধ্য বা দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ হ'তে পারে না। এমন কি, যখন কোন জাতি উচ্চতর দিকে আপনার শিল্পাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সুযোগ পায়, তখন নিত্যব্যবহার্য্য ঘট-পটাদিকে সুন্দর করবার চেষ্টা প্রায় লোপ পাওয়াও অসম্ভব নয়। যদি কোন ভবিষ্যৎ যুগে বাঙলা দেশের সাহিত্য বা ইতিহাস সম্পূর্ণ লোপ পায়, ও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ভূগর্ভ থেকে বাঙলায় ব্যবহৃত কুম্ভকারের পাত্রাদি বের করে' তা' থেকে বিংশ শতাব্দীতে বাঙলার শিল্পাকাঙ্ক্ষার বিচার করতে বসেন, তা'হলে এ সময় বাঙলা দেশে শিল্পজ্ঞানের উন্মেষও হয় নি, এ কথা সহজেই বলতে পারেন। শিল্পের ইতিহাস

আলোচনা করতে বস্‌লে প্রতিপদে এইরূপ ভুলভ্রান্তি হবার সম্ভাবনা থেকে যায়, যদি না সেই সঙ্গে জাতির মানসিক বিকাশের অন্যান্য দিক আলোচনা করা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ভূগর্ভ থেকে প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত দৈনিক জীবনের সাধারণ দ্রব্যাবলী বের করে' শিল্প-ইতিহাসের আলোচনায় কিরূপ সাহায্য করেছেন, তা সুধীর শিল্পানুসন্ধিৎসু মাত্রেই জানেন। প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত মৃত্তিকা নির্ম্মিত তৈজস, কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি, লোহা, পিতল, তামা, সোনারূপার অলঙ্কার প্রভৃতি সহস্র নিত্যব্যবহার্য্য বস্তু আবিষ্কৃত হয়ে আমাদের সম্মুখে একটি নূতন জগৎ প্রকাশ করেছে। মিশরদেশে অচিরাবিষ্কৃত তুতআমেনের সমাধিমন্দির থেকে যে সকল দ্রব্য বেরিয়েছে, তাতে মিশরের শিল্পের ইতিহাসে একটি অচিন্তনীয় অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। শিল্পের ইতিহাসের যে সকল উপাদান পাওয়া যাচ্ছে তা অনেক বটে, কিন্তু এখনও কত দ্রব্য যে পাওয়া যায় নি, ও সে সকল দ্রব্য পেলে যে এই ইতিহাস কত পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'ত, তা ভাব্‌লে দুঃখ না করে থাকা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত পরিধেয় সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি নে। প্রস্তরমূর্ত্তি থেকে বস্ত্রপরিধানের প্রণালী কিছু বোঝা যায় মাত্র, ও সাহিত্য থেকে পরিধেয় বস্ত্রের উপাদান সম্বন্ধে কয়েকটা নাম পাওয়া যায়। গ্রীক বা হিন্দু তাঁতির বোনা একখণ্ড বস্ত্র পেলে যে, গ্রন্থে লিখিত অনেক বর্ণনাই স্পষ্ট হয়ে উঠতো, বা সেগুলি নাহলেও চল্‌ত, তা' বলাই বাহুল্য।

ব্যবহারিক জীবনের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপাদান পাই বাস্তুশিল্পে। চারুশিল্প হিসাবে কিন্তু এইটিই

সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও নিম্নশ্রেণীর। একে কেবলমাত্র প্রয়োজন-সাধনোপযোগী দ্রব্যের পর্য্যায় থেকে অমূর্ত্ত সৌন্দর্য্যের বাহনপর্য্যায়ে তোলা বড় সহজ নয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত বোধে গৃহাদির নির্ম্মাণসৌন্দর্য্য বিসর্জ্জন দিতে অনেকেই সঙ্কোচ মনে করেন না। বাসের সুখস্বাচ্ছন্দ্য পেলে লোকে কিরূপ কদাকার গৃহেও সন্তুষ্ট থাকতে পারে, তা' আধুনিক সাধারণ ভারতবাসীর গৃহ দেখলেই বোঝা যায়। এমন কি, দরকার হ'লে সুন্দর সৌষ্ঠবসম্পন্ন গৃহের উপরে আবার একটি নূতন তল সংযোগ করতে বোধহয় খুব কম লোকেরই সৌন্দর্য্যজ্ঞানে বাধে।

আগেই বলেছি শুধু চারুশিল্প হিসাবে বাস্তুশিল্পের স্থান খুব উচ্চ নয়। এর প্রধান কারণ, মনের যে ভাবকে অবয়ব দান করে' বাইরে ব্যক্ত করা শিল্পের উদ্দেশ্য, বাস্তুশিল্প তা'কে প্রবুদ্ধ করে মাত্র, প্রকট করতে পারে না। ফলে বাস্তুশিল্পে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাটা অনেক পরিমাণে অস্পষ্ট ও অতৃপ্ত থেকে যায়। এই অর্দ্ধপ্রচ্ছন্নতার জন্য সেই অন্তর্নিহিত ভাবটিরও বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা হ'তে পারে। রোমের Colosseum দেখলে মনটা একটা বিরাট মহিমায় অভিভূত হয়ে পড়ে; এ যেন অসীম প্রতাপের অচল গম্ভীর প্রতীকস্বরূপ কালের ভ্রূকুটি অবহেলা করে' দাঁড়িয়ে আছে। তেমনই Milanor Duerno যেন মধুর লালিত্যের ও সুকোমল লঘুতার প্রতিমূর্ত্তি। এই সকল বস্তুই আবার দেশকালপাত্র ভেদে মনে অন্য ভাবও জাগাতে পারে।

বাস্তুশিল্প অপেক্ষা ভাস্কর্য্যে ভাব ও আকৃতির সম্মিলন আরও বেশী ঘনিষ্ঠ। ভাস্কর্য্যের উপাদান জড় প্রস্তর বা ধাতু হ'লেও, শিল্প

প্রতিভার প্রভাবে সেই জড় উপাদান এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক মহিমায় মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। বাস্তুশিল্পের মত ভাস্কর্য্যের বেলা দর্শককে আর শিল্পীর অন্তরের ভাবটি বোঝবার জন্য অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হয় না; সেটি সংহত আকারে চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। অত্যন্ত অমনোযোগী দর্শকও Vatican-এর বিখ্যাত Laocoon-এ প্রতিফলিত মুক মর্ম্মন্তুদ বেদনা, বা Louvre-এ Venus de Milo-য় অভিব্যক্ত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের আপনাভোলা ভাব ও নিষ্কম্প স্থিরতা সম্বন্ধে ভুল করতে পারে না।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম্মকথাটি কিন্তু চিত্রে যেমন অভ্রান্তরূপে প্রকাশ পায়, ভাস্কর্য্যে তেমনটি কখনও হয় না। চিত্রে জীবনের এমন একটি উজ্জ্বল উত্তপ্ত আভাস পাওয়া যায়, ও বাস্তবতার ভূমিতে তা' এমন একটি উদার মুক্তি পায়, যার অভাবে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যকীর্ত্তিও অস্ফুট বোধ হয়। চিত্রে বাস্তবজীবনের মত নানা বর্ণের সমাবেশে সজীবতার ভ্রম হয়; ভাস্কর্য্যে একবর্ণের বৈচিত্র্যহীন শুভ্রতা বা ধূসরতায় মৃত্যুর পাণ্ডুরতা বা কালিমা স্মরণ করিয়ে দেয় মাত্র। ভাস্কর যেখানে এই বর্ণ-বৈচিত্র্যের অল্পমাত্রও আনতে চেষ্টা করেছেন (যেমন পারীর লুক্সাঁবুর্গ্ মিউজিয়মে "প্রকৃতি অবগুণ্ঠন মোচন করছেন", "La Nature se dèvoilant" নামক মূর্ত্তিতে) সেখানে তাঁর সৃষ্টি যে অনেক মনোরম হয়ে উঠেছে, তা দর্শকমাত্রেই জানেন। চিত্রকরকে দ্বিমাত্রাপরিমিত (two dimensions) সমতল পটের উপর কায করতে হয় বলে', গভীরতা বা বেধের (depth) সঙ্কেত কেবলমাত্র বর্ণের আপেক্ষিক গাঢ়তা দিয়ে বোঝাতে হয়। এতে একদিকে উপাদানের অসম্পূর্ণতায় যেমন চিত্র-

করের অসুবিধা হয়, অন্যদিকে দর্শকের কল্পনাশক্তিকে স্বল্প প্রবুদ্ধ করে' মনের আনন্দের এমন একটা সুযোগ করে দেয়, যাতে রস গ্রহণের পক্ষে অনেক লাভও হয় সন্দেহ নেই। কারণ মানুষের মনের এমন একটা স্বাভাবিক আত্মসম্ভ্রম আছে, যাতে সে নিশ্চেষ্ট ভাবে আনন্দগ্রহণ করে তৃপ্ত হয় না; একটু চেষ্টা করে' আনন্দ আহরণ করলে তবে পূর্ণ তৃপ্তি পায়। পটে আঁকা চিত্র যে আনন্দ দেয় সেটি যে নিবিড়তর হয়, তার আর একটি কারণ আছে। মানব মনের কোন ভাবই বিশুদ্ধ বা নিঃসঙ্গ নয়, সাধারণ জীবনের সকল ভাবই এক সুরে বাঁধা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবের সমষ্টি। মনস্তত্ত্বের এই স্থূল কথাটি চিত্রকর বোঝেন বলে, ও এই অভাবটি তৃপ্ত করতে পারেন বলে', চিত্রের আকর্ষণ ভাস্কর্য্য অপেক্ষা চিরকালই অধিক। একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আঘাত করে, ও তাদের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের তরঙ্গ তোলে, তা' যে-কোন খ্যাত-নামা শিল্পীর চিত্র (যেমন Raphaël-এর Transubstantiation) দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বাস্তুশিল্প, ভাস্কর্য্য বা চিত্রশিল্প, এ সকল শিল্পই জড় উপাদান নিয়ে কাজ করে, ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করে। এদের প্রতিরূপ কিন্তু অমূর্ত্তশিল্পের মধ্যেও আছে। সঙ্গীত একটি অমূর্ত্ত শিল্প, এবং অপর একটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে (শ্রবণে-ন্দ্রিয়ের) সেই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন করে। এই তৃপ্তি কিন্তু এতটা ব্যাপক বা লোকসামান্য হতে পারে না। হর্ষ, বিষাদ, প্রভৃতি মানবজীবনের খুব সাধারণ অব্যাকৃত (elemental) ভাবগুলির কথা ছেড়ে দিলে, অন্যান্য সকল ভাবই অল্পবিস্তর দেশ,

কাল বা সমাজের প্রভাবে গঠিত, এবং দেশ, কাল, সমাজ বা শিক্ষার পার্থক্যানুসারে বিভিন্ন। যিনি দুইটি ভিন্ন সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন, তিনিই জানেন একই নামে অভিহিত মনোভাবের মধ্যে সেই দুই সমাজে কি বিষম পার্থক্য বিদ্যমান। সেই জন্য একই সঙ্গীত কখনও দুইটি ভিন্ন সমাজের, বা একই সমাজের দুইটি ভিন্ন স্তরের লোকের মনে একই আনন্দ দিতে পারে না। বর্ণান্ধ ব্যতীত প্রায় সকলের দৃষ্টিশক্তি একই রকমের, কিন্তু সঙ্গীতবোধটা সকলের সমান নয়। সেই জন্য একই সমাজের একই স্তরের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাছে একই সঙ্গীতের আবেদন বিভিন্ন হতে পারে, এবং হয়েও থাকে। আরও এক কথা এই যে, ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে প্রতি জাতি তার সঙ্গীতে একপ্রকার ভাবের বর্ণমালা (emotional alphabet) সৃষ্টি করেছে, ও সেই বর্ণমালা প্রয়াস সহকারে আয়ত্ত না করলে সেই জাতির সঙ্গীতের রসগ্রহণ করতে পারা যায় না। সেই জন্য অধিকাংশ ভারতবাসীর কাছে ইউরোপীয় সঙ্গীত মধুর আর্ত্তনাদ (musical howl) বলেই শোনায়; এবং অধিকাংশ ইউরোপীয়ের কাছে আমাদের সঙ্গীত দীর্ঘবিলাপ (long-drawn lament) বলেই বোধ হয়। কলা হিসাবে সঙ্গীতের আরও একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, তা'র আবেদন অধিকাংশ সময় এতই অস্পষ্ট যে, তাকে সহস্র লোক সহস্র আকারে গ্রহণ করতে পারে; এবং এই পরস্পরবিরোধী বিবৃত্তির মধ্যে তা'র সরলতা ও মনোজ্ঞতা লোপ পায়। মূর্ত্ত শিল্পের মধ্যে বাস্তু-শিল্পের যে স্থান, অমূর্ত্ত শিল্পের মধ্যে সঙ্গীতেরও তাই।

এক বিষয়ে কিন্তু বাস্তু-শিল্প, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্প অপেক্ষা সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত। বাস্তু-শিল্প, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্প

জীবনের একটি মুহূর্ত্তকে মাত্র ধরে' রাখে, ও সেই মুহূর্ত্তকে রেখার বেষ্টনীতে অপরিবর্ত্তনীয় করে' সারাজীবনের দ্যোতক করে' তোলে। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ও প্রবহমান জীবন কিন্তু কখনও একটি মুহূর্ত্তের (সে মুহূর্ত্ত যতই গুরুতর হোক্ না কেন) প্রতিচ্ছবিতে প্রকাশিত হতে পারে না। এর স্বভাবই নিয়ত অগ্রসর হওয়া; এ একদিকে বিকশিত, অন্যদিকে সঙ্কুচিত হচ্ছে, ও সহস্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে' পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে। জীবনের এই গতি, লীলা ও ছন্দঃ, মূর্ত্তশিল্প অপেক্ষা অমূর্ত্ত শিল্প অধিক সুন্দররূপে প্রকাশ করে।

অমূর্ত্ত-শিল্পের মধ্যে নৃত্য শুধু এই গতি ও ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। একটি বিশেষ অঙ্গ-বিন্যাস, একটি ভঙ্গী দেখাতে শ্রেষ্ঠ ভাস্করের সকল চেষ্টা নিঃশেষিত হয়; কিন্তু নর্ত্তকী সুন্দর ভঙ্গীর পর ভঙ্গী দেখিয়ে যেন পাষাণ প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, এবং সেই সঙ্গে তার মুখাবয়বে ও অঙ্গের প্রতি রেখায় তদুপযোগী মনোভাব বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে। সুন্দরী নর্ত্তকীর সুন্দর নৃত্য সজীব প্রতিমার সঙ্গে আনন্দের হিল্লোল। তার তালবিশুদ্ধ পদক্ষেপ ও স্বচ্ছন্দ অঙ্গ-স্পন্দন দেখলে মনে হয় যেন সঙ্গীত ভাস্কর্য্যকে প্রাণদান করেছে। মূর্ত্ত চারুশিল্পে ভাস্কর্য্যের যে স্থান, অমূর্ত্ত চারুশিল্পে নৃত্যেরও তাই।

সহস্র জটিলতার ভিতর দিয়ে মানবজীবন যে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ও বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে যে একতার সন্ধানে ফিরছে, সেই ছন্দোবদ্ধ লীলাময়ী গতি সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণভাবে প্রকাশ করে কাব্য, বিশেষতঃ দৃশ্যকাব্য বা নাটক। প্রাচীন জাতির মধ্যে যারা সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল, সেই চীন, ভারতীয় এবং গ্রীকদের মধ্যেই আমরা নাট্যসাহিত্যের সমধিক বিকাশ দেখতে পাই। নাট্য-

শিল্পী অন্যান্য সুকুমার শিল্প থেকে প্রয়োজনানুসারে তাঁর শিল্পের উপাদান গ্রহণ করেন। রঙ্গমঞ্চে বাস্তু-শিল্পী সুন্দর সুন্দর গৃহ, পথ, উদ্যান রচনা করে' দেন ; সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত কুশীলবগণ দেখলে নিপুণ ভাস্করের হাতের অনবদ্য প্রতিমা সচল হ'য়ে এসেছে বলে মনে হয় ; মনোরম নৃত্য এবং মধুর সঙ্গীত, গতি ধ্বনি ও ভঙ্গীর সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে ; ব্যবহারিক জীবনের সহস্র ছোটখাটো শিল্প, বেশবিন্যাস, মাল্যরচনা প্রভৃতির সমাবেশে শিল্পের মেলা লেগে যায় ; আর নাট্যশিল্পী তা'তে অভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠ ও চরম অস্ত্র—বাক্য, সংযোগ করে' এই সকল স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন শিল্পকে একটি মূল সূত্রে গ্রথিত করেন। শ্রেষ্ঠ নাটকের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দেখলে তাই মনে হয় অন্যান্য চারুকলাগুলি মানবচিত্তপ্রসূত এই পরম ও চরম কলার শ্রীবৃদ্ধির জন্যই যেন সৃষ্ট হয়েছিল, আর এর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সহায়তা করেই যেন সেগুলি চরিতার্থ হয়েছে।

শিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দার্শনিক মতবাদের অনুসন্ধান করতে গেলে কিন্তু অনেক পরিমাণে হতাশ হতে হয়। প্রথমত দেখা যায় যে, শিল্প সৃষ্টির অনেক পরে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ গঠিত হতে আরম্ভ হয়েছে। গ্রীকজগতে শিল্প-সৃষ্টি যতদূর অগ্রসর হয়েছিল, তার তুলনায় দার্শনিক মতের উন্নতি খুবই অকিঞ্চিৎকর। তাই দেখে, শিল্প-সৃষ্টি যে স্বতঃপ্রসূত অন্তরের প্রেরণাবশেই হয়, কষ্টলব্ধ জ্ঞান বা মস্তিষ্কচালনার ফলে হয় না—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। গ্রীক দার্শনিকগণ—সক্রাতিস্, প্লাতো, আরিস্ততল্, এমন কি নবপ্লাতো-মতাবলম্বী প্লতিনাস্ প্রভৃতির সৌন্দর্য্যবাদ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রাক মন কখনও

তাদের সৃষ্ট শুভ বা মঙ্গলদায়ক বস্তুর ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। সেই জন্য যা' শুধু সুন্দর বলেই আমাদের আনন্দ দান করে, তা'র মধ্যেও তাঁরা শুভ বা মঙ্গলদায়ক বীজ অনুসন্ধান করতেন।

সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদের ইতিহাস বিবৃত্তি করতে গেলে প্রবন্ধ অযথা দীর্ঘ হয়ে পড়বে, অতএব সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকা গেল। কেবলমাত্র একটি বিষয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম না করলে প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পমতবাদের পার্থক্য বোঝা যাবে না। প্রাচীন যুগে শিল্পীনির্ম্মিত সুন্দর বস্তুর উপরেই তাৎকালিক মতবাদ গঠিত হয়েছিল। সেজন্য প্রাচীনগণ শিল্পের প্রাণের অনুসন্ধান করেছিলেন সৌন্দর্য্যে, অবয়বসৌষ্ঠবে। তাঁরা চেয়েছিলেন সৌন্দর্য্য বা সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠবকে মূল ঐক্যসূত্র ধরে' সৃষ্ট বস্তুতে কত ভাবে বৈচিত্র্য আনা যায়, তাই দেখতে। কিন্তু বাহ্যিক আকৃতির সৌন্দর্য্যকে শিল্পের প্রাণ বলে' স্বীকার করলে প্রকৃতির অনেকখানি অংশ শিল্পের রাজ্যের বাইরে পড়ে থাকে; কারণ প্রকৃতি ত আর সব সময়ে বা সর্ব্বত্র সুন্দর নয়। আধুনিক সৌন্দর্য্যবাদীগণ অনুভব করেছেন যে, অসুন্দরও শিল্পের বস্তু হ'তে পারে, এবং যদি প্রতিভাবান শিল্পীর হাতের স্পর্শ পায় ত অসুন্দরও মনোরম হয়ে উঠতে পারে। এটি আধুনিক সৌন্দর্য্যতত্ত্বের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নয়। প্রাচীনগণ অবিচ্ছিন্নতা, অবিরোধ, অবয়বসঙ্গতিতেই সৌন্দর্য্য দেখতেন। কিন্তু যা অসুন্দর তা'র অংশগুলির মধ্যে সঙ্গতি বা তাল থাকে না, বা তা'দের অবিচ্ছিন্ন বিকাশও দেখা যায় না। অতএব অসুন্দরকেও শিল্পের রাজ্যে আনতে হ'লে, এই প্রাচীন ভূমি ত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। নবীনগণ তীক্ষ্ণতর অন্তর্দৃষ্টিবলে অনুভব

করেছেন যে, কেবলমাত্র যৌবন, সৌন্দর্য্য ও সরসতাকেই শিল্পের উপাদান বলে' গ্রহণ করলে শিল্পকে অযথা পঙ্গু করে' রাখা হয়। বিরাট প্রকৃতির সুন্দর অসুন্দর সকল বস্তুই, জরা যৌবন সকল অবস্থাই, প্রতিভাবান শিল্পীর নিপুণ হস্তে মহিমময় হয়ে উঠতে পারে। তাই তাঁরা মনে করেন বর্ণনীয় বস্তুর বিশেষত্ব প্রকাশ করবার ক্ষমতায়, তার দ্যোতনায়, তার প্রাণশক্তিতে শিল্পের মূলসূত্র নিহিত। শিল্পীর সৃষ্টবস্তু যদি প্রাণের দ্যোতনায় পূর্ণ হয়, প্রাণ-শক্তির রস-সিঞ্চনে পুষ্ট হয়, তবে সুন্দরই হোক্ অসুন্দরই হোক্, তা' শ্রেষ্ঠ শিল্পের আসন পাবার উপযুক্ত। সুকুমার শিল্পের অনুরাগী মাত্রেই জানেন যে, যে সকল দৃশ্য ব্যবহারিক জীবনে অকিঞ্চিৎকর বা কদাকার বলে' আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনা, দক্ষ শিল্পীর তুলিকাস্পর্শে তা'ই কি মনোরমই না হয়ে ওঠে। এর কারণ এই যে, শিল্পী এই সকল দৃশ্যের গোপন সঙ্কেতটি, জীবনের বেদনার আবেদনটি বুঝতে পারেন, ও তা'কে আপনার অন্তরের অনুরাগে রাঙিয়ে দর্শকের চোখের সামনে ধরতে পারেন। চিত্রানুরাগী মাত্রেই অনুভব করেছেন গদ্যময় দৈনিক জীবনের সাধারণ দৃশ্যাবলীকে Flemish শিল্পীগণ কি মধুর রসের উৎসে পরিণত করেছেন। প্রাণের আবেদনটি ধরতে পারলে শুধু যে অকিঞ্চিৎকর দৃশ্য মনোরম হয়ে ওঠে তা নয়, এমন কি ব্যবহারিক জীবনের অনেক অপ্রীতি-কর বস্তুও আনন্দের আধারে পরিণত হয়। মৃচ্ছকটিকের জুয়াড়ী, চোর, শর্ব্বিলক, ও দ্যূতকার; বা Dame aux Camelias-র ভাব-প্রবণা কিন্তু অসংযতস্বভাবা নায়িকা Marguerite বোধহয় জীবনে বিশেষ প্রীতিকর ব্যক্তি হতেন না; কিন্তু কবির নিপুণ তুলিকাপাতে

তা'দের চিত্রগুলি প্রাণের চঞ্চলতায় ও বৈচিত্র্যে এমনই পূর্ণ যে, তা'রা অমর শিল্প-সৃষ্টিরূপে বিরাজ করছে।

শিল্প-শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করে' আমরা দেখতে পাই কেমন করে' তা' প্রাচীন মতবাদের পাশ ছিন্ন করে' ক্রমে পূর্ণতা লাভ করছে। ধর্ম্ম বা নীতির পাশ থেকে তা' অনেকদিনই মুক্তিলাভ করেছে; ক্লাসিক সৌন্দর্য্যবাদের অবয়বসংস্থান ও পরিমাপের সঙ্কীর্ণ নিয়মাবলীর পাশও ক্রমে শিথিল হ'য়ে পড়েছে। এখন যে অসংখ্য সুন্দর অসুন্দর খুঁটিনাটি নিয়ে মানবজীবন, যার গৌরবময় মহত্ত্বের সঙ্গে নানা ক্ষুদ্রতা ও হীনতা অচ্ছেদ্যরূপে সংবদ্ধ,—শিল্পশাস্ত্র সেই বিরাট বিচিত্র মানবজীবনের এক ব্যাপক ভাষ্যের পদবীতে এসে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
M. A. (Cal), Docteur-ès-Lettres.
(Paris)

গাছ।

—০:*:০—

গাছের যে সবসুদ্ধ দশটা খাবারের কথা বলেছি, সে হচ্ছে ডাঙার গাছের খাবার; আর সেই সব জলের গাছের খাবার, যাদের শিকড় থাকে মাটিতে, আর পাতা থাকে জলের উপরে,—যেমন পদ্ম, শালুক। কিন্তু এমন গাছও আছে, যারা একেবারেই জলে ডুবে থাকে। তাদের হয় শিকড় নেই, নাহয় তা জলের তলাকার মাটিতে পৌঁছয় না। কিম্বা পৌঁছলেও মাটির রস টানে,—কেবল স্রোতে ভেসে বেড়াবার ভয়ে মাটি কাম্‌ড়ে ধরে থাকে। এই সব জলে-ডোবা গাছের শুধু ও-দশটা জিনিষ খেলেই চলে না, আরও তিনটে জিনিষ খেতে হয়—(১) সোডিয়ম (২) ক্লোরীন্ (৩) আয়োডীন্। * এই তেরোটা জিনিষই জলের মধ্যে পাওয়া যায়—কেননা কি মাটির জিনিষ, কি হাওয়ার জিনিষ, সবই দিনরাত জলের সঙ্গে গুলে যাচ্ছে। জলে-ডোবা গাছ বিষ-গ্যাস্‌ও জল থেকে টেনে নেয়। †

---

* সোডিয়ম্ একরকম ধাতু। সোডিয়মের সঙ্গে অন্য কোন কোন জিনিষ মিশিয়ে কাপড়কাচা সোডা তৈরী হয়। ক্লোরীন্ হলদে রঙের একরকম গ্যাস্। এই গ্যাস্ দিয়ে রঙীন জিনিষকে সাদা করা যায়। সোডিয়ম্ আর ক্লোরীন্ মেশালে নুন হয়। আয়োডীন্ নামটা তোমরা বোধহয় শুনেছ। আমাদের কোথাও কেটে গেলে, কি ব্যথা হলে, যে টিংচার আয়োডীন্ দিই, তা স্পিরিটে গোলা আয়োডীন্।

† জলে-ডোবা গাছ যে বিষ-গ্যাস্‌ও জল থেকে টেনে নেয়, তা বোঝবার

এখন কথা হচ্ছে এই, জলে-ডোবা গাছ খায় কি করে? ডাঙার গাছের গায়ে যে ছালফুটো আছে, জলে-ডোবা গাছের গায়েও কি সেই ছালফুটো আছে—আর সেই ছালফুটো দিয়েই তারা খাবার টেনে নেয়? না, জলে-ডোবা গাছের গায়ে ছালফুটো নেই। তা যদি থাকতো, তাহলে খাবারও যেমন ছালফুটো দিয়ে ঢুকতো, তেম্‌নি এত জলও ঢুকতো যে, গাছ ভেপ্‌সে পচে উঠতো। জলে-ডোবা গাছের গায়ে আর একরকম সরু সরু ছেঁদা আছে, যা ছালফুটোর চেয়ে সরু—আর যা এমনি কায়দায় তৈরী যে, দরকারের বেশী একতিল জিনিষও ঢুকতে পারে না।

এইবার আবার ডাঙার গাছের কথা। তোমরা জানো, গাছ শিকড় দিয়ে মাটির রস টানে। কিন্তু কি ফিকিরে টানে? আর কি করেই বা সেই রস টেনে তুলে পাতা পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয়? তার শিকড়ের ত ঠোঁটও নেই, জিভও নেই, যে আমাদের মত চুষ্‌বে।

শিকড়ের ঠোঁটও নেই, জিভও নেই সত্য; কিন্তু গাছ তার লোম-শিকড়ে এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে, যাতে লোমশিকড় মানুষের মুখের মতই রস চুষ্‌তে পারে।

এক সোজা উপায় আছে। তোমরা জানো হাঁড়িতে মাছ জিইয়ে রাখলে রোজই হাঁড়ির জল বদলাতে হয়, নৈলে মাছ মরে যায়। এই জন্য মরে যায় যে, মাছেরাও আমাদের মত নিঃশ্বাস ফেলে, আর সে নিঃশ্বাসের গ্যাস্ বিষ-গ্যাস্। বিষ-গ্যাস্ জলের সঙ্গে মিশে জলকে বিষিয়ে তুল্‌লে তার মধ্যে মাছ বাঁচে কি করে?—এখন তোমরা যদি গোটা দুচ্চার জলে-ডোবা সেওলা তুলে এনে হাঁড়ির মধ্যে ছেড়ে দিতে পার, তাহলে জল না বদলালেও মাছ বেঁচে থাকবে—কেন না সেওলাগুলো খাবার জন্য বিষ-গ্যাস্ টেনে নিয়ে জলকে পরিষ্কার করে রাখবে।

একদিকে দুধ আর একদিকে আলতাগোলা জল রেখে মাঝখানে যদি মাছের পট্‌কার মত একটা পর্দ্দা বসিয়ে দাও, তাহলে দেখবে একটু পরেই দুধের খানিকটা গিয়েছে আল্‌তাগোলা জলের মধ্যে, আর আল্‌তাগোলা জলের খানিকটা দুধের মধ্যে। মাঝখানে একটা পাতলা পর্দ্দা, আর দুদিকে দুটো জলের মত জিনিষ থাক্‌লে এইরকম হয়। লোমশিকড়ের চামড়াটা ঐ পর্দ্দার মত। তার ভিতরে থাকে টক রস (এ্যাসিড্‌) আর বাইরে থাকে মাটির রস। কাজেই মাটির রস যায় শিকড়ের মধ্যে, আর টক রস যায় মাটির ভিতরে।

তারপর শিকড়ের মধ্যে মাটির রস ঢুকলেও তা গাছের গা বেয়ে ওঠে কি করে ?

তোমরা যদি একটা খুব সরু আর একটা মোটা কাঁচের নলকে পাশাপাশি জলে ডোবাও, তাহলে দেখবে মোটা নলটার বাইরেও যে পর্য্যন্ত জল, ভিতরেও সেই পর্য্যন্ত জল উঠেছে। সরু নলের তা হয় না। নল সরু হবার এইটুকুই মজা। গাছের গুঁড়ির ভিতর যে সব চোঙা আছে, তা একেবারে চুলের মত সরু; তাই তার ভিতর দিয়ে মাটির রস চোঁ চোঁ করে ঠেলে উপরে ওঠে।

আবার গাছ তার চোঙাগুলোর গা ব্লটিংকাগজের মত করেছে। চোঙার নীচের মুখে একটু জল ঠেকলেই তা টানের চোটে উপরে উঠে আসে। একটা কেরোসীন তেলের ল্যাম্পের পল্‌তে যেমন নীচের তেল শুষে পল্‌তের মুখে এনে দেয়, এও অনেকটা তেম্‌নি।

কিন্তু এ সব শুনেও তোমরা হয়ত বুঝতে পার'ছ না, কি করে গাছ রাশি রাশি জল পাতা পর্য্যন্ত টেনে তোলে। যে সব গাছ দু'

তিনশো হাত উঁচু, তাদের শিকড় থেকে পাতা পর্য্যন্ত রস টেনে তোলা ত যে-সে জোরের কাজ নয়।

আচার্য্য জগদীশ বোস্‌ও ঠিক এই কথাই ভেবেছিলেন। তিনি অনেক যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করে বের করেছেন যে, গাছ শুধু ফিকিরের জোরেই রস টেনে তোলেনা, তোলে নিজের প্রাণের জোরে। যে প্রাণের জোরে আমাদের শরীরের মধ্যে রক্ত ছুটে বেড়াচ্ছে—সেই প্রাণের জোরেই গাছের শরীরে ঝলকে ঝলকে রস ওঠে; ঠিক যেমন করে আমরা একতলার চৌবাচ্ছা থেকে দোতলায় 'পাম্প' করে জল তুলি।

এইবার গাছের রান্নার কথা। শিকড় দিয়ে টানা খাবার-গোলা জল যখন পাতায় গিয়ে পৌঁছল, আর পাতা দিয়ে ঢুক্‌লো বিষ-গ্যাস্‌, তখন সূর্য্যের আলো আর গাছ-সবুজ মিলে কি করে খাবার রাঁধে?

আমরা যা কিছু খাই তা হয় চিনি-জাতের খাবার, না হয় মাংস-জাতের খাবার, না হয় তেল-জাতের খাবার। আলু, ভাত ও গুড় চিনি-জাতের; ডাল, ছানা, ও মাছ মাংস-জাতের; তেল, ঘি, ও চর্ব্বি তেল-জাতের খাবার।

গাছও ঠিক এই তিন জাতের খাবার তৈরী করে। তার চিনি-জাতের খাবারের নাম গাছ-চিনি, মাংস জাতের খাবারের নাম গাছ-মাংস, আর তেল-জাতের খাবারের নাম গাছ-তেল।

গাছ আগেই তৈরী করে চিনি-জাতের খাবার। রোদ আর গাছ-সবুজ বিষ-গ্যাস্‌কে কয়লা-সার আর প্রাণগ্যাসে ভেঙে * আলাদা

* বিষ-গ্যাস্‌ একটা মিশাল জিনিষ,—কয়লা-সার আর প্রাণ-গ্যাস্‌ মিলে তৈরী হয়। কয়লা পোড়ালে যে বিষ-গ্যাস্‌ হয়, তা তোমরা জানো। কয়লা

করে ফেলে। তখন জলের হাল্কাগ্যাস্ আর প্রাণ গ্যাস্ এসে কয়লা-সারের সঙ্গে মেশে। এই হাল্কাগ্যাস্, প্রাণ-গ্যাস্ আর কয়লা-সার মিশে যে মিশাল জিনিষ তৈরী হয়, তারই নাম গাছ-চিনি। বিষ-গ্যাসের প্রাণ-গ্যাস্টুকু আর কোন কাজে লাগেনা, ভাপের মত পাতার ছাল-ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়। * •

গাছ-চিনি বদলেই গাছ-তেল হয়। গাছ-তেলেও কয়লা-সার প্রাণ-গ্যাস্ আর বিষ-গ্যাস্ ছাড়া অন্য কোন জিনিষ নেই। তিল, সরষে, তিসি, নারকোল, বাদাম, ভ্যারেণ্ডা আর ভুলোর বীচি গাছ-তেলে ভরা।

গাছ-চিনি আর গাছ-তেলে যে তিনটে জিনিষ আছে, গাছ-মাংসে তাছাড়া আরো দুটো জিনিষ আছে—বেমিশুক গ্যাস (নাইট্রোজেন) আর গন্ধক। কোন কোন গাছ-মাংসে আবার ফস্ফরস্ও পাওয়া যায়। †

পোড়া মানেই কয়লার সঙ্গে বাতাসের প্রাণ-গ্যাস্ মেশা। প্রাণ-গ্যাস্ যখনই কিছুর সঙ্গে মেশে, তখনই খানিকটা আলো ও তাত জন্মায়।

* প্রাণ-গ্যাস্ যে পাতা দিয়ে ভাপের মত বেরিয়ে যায়, তা এই থেকেই বোঝা যায়ঃ—একটা বাটিতে জল রেখে তার মধ্যে গোটাকয়েক ঝাঁঝি ডুবিয়ে রাখো। বাটিটা রোদে রাখলেই দেখবে ছোট ছোট ভুড়ভুড়ি ঝাঁঝির গা থেকে বেরিয়ে আসছে। ঐ ভুড়ভুড়ি যে একটা গ্যাস্ তা বোঝাই যায়, কিন্তু প্রাণ-গ্যাস্ কি না তা বুঝতে হলে গ্যাস্টাকে কায়দা করে একটা ফুঁকো শিশির মধ্যে ধরতে হবে। ফুঁকো শিশির ছিপি খুলে তার মধ্যে একখানা গন্গনে আঙ্রা ফেলে দিলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবে। প্রাণ-গ্যাস্ ছাড়া অন্য কোন গ্যাসে জ্বলন্ত আঙ্রা এমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে না।

† ফস্ফরস্-আলা গাছ-মাংসে যে ক'টা জিনিষ পাওয়া যায়, একটা

গাছের তিন রকম খাবার তৈরী করতে তাহলে মোট পাঁচরকম জিনিষ লাগলো—বাষ্প, বিষগ্যাস, নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফস্ফরস্। পটাসিয়ম্, ক্যাল্সিয়ম, ম্যাগ্নেসিয়ম্, লোহা আর বালি এ পাঁচটা জিনিষ কোনই কাজে এল না। তবে গাছ এ পাঁচটা জিনিষ টেনেছিল কেন? টেনেছিল তার মানে আছে। লোহা গাছের খাবার না হলেও গাছ-সবুজের খাবার। পটাসিয়ম্ কাছে না থাকলে বিষ-গ্যাস্ আর জল মিশতে চায় না, মিশলেও গাছ-চিনি হয় না। ক্যাল্সিয়ম্ না পিছনে এসে দাঁড়ালে, গন্ধককে গাছ-মাংসের মধ্যে ঢোকায় কে? তেম্নি নাইট্রোজেনও গাছ-মাংসের মধ্যে ঢোকে না, যদি না পিছনে ম্যাগ্নেসিয়ম্ থাকে। বালিগাছের খাবার না হলেও গাছের অনেক কাজে লাগে। এই ধর ধান, বাঁশ, কুলের পাতা যে অত ধারালো, আর খস্খসে, লোকে তুলতে সাহস করে না, সে ঐ বালির জন্য।

গাছ-চিনি জিনিষটা পাতলা আর ছট্ফট্ করে ছুটে বেড়ায়। গাছ ত খাবার রেঁধেই সঙ্গে সঙ্গে সব খায় না, বেশীর ভাগ জমিয়ে রাখে। কিন্তু কি করে গাছ-চিনি জমাবে, যদি তা অমন ধারা পাতলা আর ছট্ফটে থাকে? তাই গাছ তার কোষের ভিতর থেকে এক

কোষের মধ্যেও ঠিক সেই ক'টা জিনিষ আছে। কাজেই অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ফস্ফরস্-আলো গাছ-মাংস তৈরী করতে পারলেই কোষ তৈরী করা যাবে। কিন্তু আর একদল পণ্ডিত বলেন—তা কখনই যাবে না। গাছ-মাংস হাজার হলেও জড় জিনিষ, আর কোষ জীবন্ত। জড় থেকে কখনই জীব হতে পারে না, হয়ও নি। গাছ-মাংস থেকে যেদিন কোষ তৈরী হবে, সেদিন লোকে হাতী ঘোড়াও তৈরী করতে পারবে।

রকম খামি বের করে, গাছ-চিনিকে সম্বরা দিয়ে নেয়—সম্বরা দিলেই গাছ-চিনি জমে দানা দানা হয়ে যায়। এই জমে যাওয়া গাছ-চিনিকে পালো বলে।

গাছের যখন গাছ-চিনি খাবার দরকার হয়, তখন সে আবার ঐ পালোকে গাছ-চিনি করে নেয়। মজা এই যে, গাছ-চিনিতে যে খামির সম্বরা দিলে পালো হয়, পালোতে সেই খামির সম্বরা দিলেই গাছ-চিনি হয়। খেজুর, তাল, আখ, বীট এই সব গাছের মধ্যে পালোর চেয়ে গাছ-চিনিই বেশী। গাছ-চিনির জন্যই গাছের পাকা ফল অত মিষ্টি

গাছের খাবার জমানো।

মানুষের শরীরে যেমন চর্ব্বি জমে, গাছের শরীরেও তেমনি রান্না-খাবার জমানো থাকে। অসুখ বিসুখ হলে মানুষ যেমন তার চর্ব্বির পুঁজি ভেঙে খায়, তেমনি গাছও যখন তার খাবার না রাঁধতে পারে তখন জমানো খাবাবের পুঁজি ভেঙে খায়।

মানুষের চেয়ে গাছকে খাবার জমাতে হয় বেশী—কেননা রাত্রে রান্না হয় না। তখন সে খায় আর বাড়ে। মেঘ্‌লাদিনে খাবার তৈরী হয় কম। শীতকালেও রোদের তেজ কম বলে, বেশী খাবার তৈরী হয় না, তাছাড়া পাতা ঝরে গেলে ত মোটেই তৈরী হয় না।

চারাগাছ বেশী খাবার জমাতে পারে না। তার পাতা কম বলে রান্না হয় কম। সে রোজ রাঁধে, রোজ খায়। একটা চারাগাছের যদি সব পাতা ছিঁড়ে ফেলে দাও, তাহলে সে তাড়াতাড়ি আবার নতুন

পাতা বের করে; কিন্তু সেগুলোও যদি ছিঁড়ে ফেলে দাও, তাহলে বেচারী উপোষ করেই মরে যায়। লোকে যে বলে ছাগলে মুড়োলে গাছ বাঁচেনা, তার মানে ছাগলে শুধু চারাগাছকেই মুড়োয়।

বেশীর ভাগ গাছই গুঁড়িতে খাবার জমায়। ফণীমনসার গুঁড়িতে যে খাবার জমানো থাকে, তা আগেই বলেছি। কিন্তু শুধু ফণীমনসার কেন, সব সেজু-জাতের গাছেরই গুঁড়িতে খাবার জমানো থাকে।

সাবুগাছ তার গুঁড়িতে খুব খাবার জমায়। একটা পনেরো বছরের পুরোণো সাবুগাছকে কেটে ফেল্‌লে দেখতে পাবে, তার মাজ-শাঁসটা সবই দু'ইঞ্চি পুরু পালো দিয়ে ভরানো—ঐ পালো থেকেই সাবুদানা তৈরী হয়।

গুঁড়ি যতই কটাসে হোক্, তার ভিতর দিয়ে কিছু না কিছু আলো ও তাত্ চুঁইয়ে ভিতরে যায়, তাই অনেক গাছ তাদের বাড়্‌তি খাবারটুকু গুঁড়ির সেই দিকটায় জমিয়ে রাখে, যে দিকটা একেবারে মাটির নীচে। মাটির নীচেকার ঠাণ্ডা অন্ধকারে খাবার থাকে ভাল—আর সে খাবার টপ্ করে কিছুতে নষ্টও করতে পারে না। আলু, কচু, আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, ওল, বাঁশ, পদ্ম, শালুক, মাকালষষ্ঠী, কলা, রজনীগন্ধা, কৃষ্ণকলি এই সব গাছের মাটির তলায় যে গেঁড় থাকে, তা আর কিছুই নয়, ঐ সব গাছের খাবার জমানো গুঁড়ি। আমরা আলু, কচু, আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, ওলের তরকারি রেঁধে খাই—তার মানেই গাছ যা অনেক কষ্টে তার চোরা গুঁড়িতে নিজের জন্য মজুত করে রাখে, তাই আমরা চুরি করে খেয়ে মানুষ।

যে সব গাছ খুব চালাক অথচ চোরা গুঁড়ি করতে শেখেনি, তারা শিকড়ের মধ্যেই খাবার জমায়। তাদের এক একটা শাঁসালো

শিকড়, যেন গাছের এক একটা ভাঁড়ার ঘর। রাঙা আলু, শাঁক আলু, শতমূল, কাঁকরোল, পটল এই সব গাছের উপরকার ডালপাতা শীত পড়তেই শুকিয়ে যায়—তখন তাদের প্রাণটুকু গিয়ে ঠেকে শাঁসালো শিকড়ে। ফিরে বছর যেই গরম ফোটে, কি বর্ষা নামে, অমনি গাছ তার শিকড়ের জমানো খাবার খেয়ে সবুজ ডালপাতায় গজিয়ে ওঠে। শালগম, গাজর, মূলো, বীটও শিকড়ে খাবার জমায়, কিন্তু তারা বছুরে গাছ, কাজেই বছর ঘোরবার আগেই নিজেদের জমানো খাবার খেয়ে শেষ করে যায়। সারাটা শীতকাল ধরে তারা জমানো খাবার খায়, আর শীতের শেষে মাঘ ফাল্গুন মাসে ফুল, ফলও বীচি তৈরী করে মরে যায়। আমাদের দেশে মাঘ মাসে যে মূলো খায় না, তার মানে মাঘ মাসে আর মূলোর মধ্যে সার বলতে কিছু থাকে না।

যে সব গাছ চোরা গুঁড়িতে খাবার জমায়, আর যাদের দেখা গুঁড়িটা শীত পড়তেই শুকিয়ে যায়, তারাও রাঙা-আলু শাঁক-আলুর মত নিজেদের জমানো খাবার খেয়ে শীতের শেষে নতুন করে গজিয়ে ওঠে।

দু'এক রকম অর্কিড্ আছে, যারা অনেক বছর বাঁচে, আর শীতের সময়েও শুকোয় না; তবুও তাদের শিকড়গুলো শাঁক-আলুর মত শাঁসালো। যদি কখনো বাইরের খাবারের টানাটানি পড়ে, তখন তারা ঐ শিকড়ের পুঁজি কাজে লাগায়।

গাছ সব খাবারই নিজের জন্য জমায় না—অনেকটা জমায় বীচিতে, তার বাচ্চার জন্য। আগে বলে এসেছি বীচিই হচ্ছে গাছের বাচ্চা, কিন্তু সমস্ত বীচিটা নয়। গাছের বাচ্চা আর তার খাবার, এই দুই

নিয়ে বীচির শাঁস—ঠিক যেমন হাঁসের ডিমের কুসুমটা হচ্ছে হাঁসের বাচ্চা, আর হড়্‌হড়ে নালটা তার খাবার।

ধান কি নারকোলের মত যে সব বীচি এক-বীচিপাত, তাদের ভিতরটা যদি অণুবীন্‌ দিয়ে দেখো, তাহলে দেখ্‌তে পাবে বীচির এক কোণে একটী ছোট্ট দোশুড়ো জিনিষ, আর তার পিঠের উপর একটী কাগজের মত বীচিপাত। বাদবাকি সব ফাঁকটুকুই একরকম নালের মত জিনিষ দিয়ে ভরানো। ঐ নালের মত জিনিষই হচ্ছে গাছের বাচ্চার খাবার, আর ঐ ছোট্ট দোশুড়ো জিনিষই গাছের বাচ্চা। গাছের বাচ্চার যে শুঁড়টা বড়, সেইটাই বেড়ে হয় শিকড়, আর যে শুঁড়টী ছোট, সেইটীই বেড়ে হয় ক'ল বা কচি গুঁড়ি।

একটা ভ্যারেণ্ডার বীচির ভিতরটা যদি অণুবীন্‌ দিয়ে দেখো, তাহলে ঠিক ঐ জিনিষই দেখতে পাবে, কেবল বাচ্চার গায়ে একটী বীচিপাতের বদলে দুটী বীচিপাত লাগানো—যেন মৌমাছির দুটী ডানা কেননা ভ্যারেণ্ডার বীচি দু' বীচিপাত।

কিন্তু আম কি ছোলার মত দু' বীচিপাত বীচির ভিতরে অন্য জিনিষ দেখ্‌তে পাবে। সেখানে খাবারের নামগন্ধও নেই—আছে শুধু দোশুঁড়ো গাছের বাচ্চাটি, আর তার দুটী ডানার মত বীচিপাত; দুটী খুব বড় আর পুরু। কিন্তু এর মানে কি? আম কি ছোলার বীচিতে বাচ্চার খাবার নেই কেন? আছে, বাইরে নেই বটে কিন্তু বীচিপাতের মধ্যেই পোরা আছে। সেই জন্যই ত বীচিপাত দুটী অত পুরু আর শাঁসালো।

এখন কথা হচ্ছে, এই বীচির মধ্যে গাছ তার বাচ্চার জন্য খাবার পূরে দেয় কেন? এইজন্য পূরে দেয়, যে শিকড় দিয়ে চরে খেতে

শেখবার আগে বাচ্চা ঐ খাবার খেয়েই বাড়বে। মায়ের দেওয়া খাবারও ফুরিয়ে যায়, সে'ও চরে খেতে শেখে। মা তার বাচ্চাকে নিঃসম্বলে নিজের কাছ থেকে তফাতে ফেলে দেয় না। ঠিক ততটা খাবার সঙ্গে দিয়ে দেয়, যতটা তার চাই।

বীচি যদি মাটিতেও না পড়ে, তাত্ জলও না পায়, তাহলে কলায় না। * এখন ধর যদি ধান দু' তিন বছর গোলায় তোলা থাকে, তাহলে ততদিন কি ধানের ভিতরকার বাচ্চা উপোষ করে থাকে? পাবোই যখন, মায়ের দেওয়া খাবার যথেষ্ট আছে, তখন সে দুদিনেই তা খেয়ে সাবাড় করে ফেলেনা কেন? এর উত্তর, গাছ কি করে জানিনা তার বাচ্চাকে হওয়ামাত্রেই বীচির মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখে—শীতকালে সাপ কি ব্যাং যেমন গর্ত্তের মধ্যে ঘুমোয়, তেম্নি অসাড় ঘুম। তখন সে কিছু খায়ও না, বাড়েও না। ঠিকমত তাত্ জল পেলেই তবে তার ঘুম ভাঙে, আর যেই ঘুম ভাঙে, অম্নি সে খাবার খেতেও সুরু করে, ও বাড়তে থাকে। †

---

* যদি ঠিকমত তাত্ জল পায়, তাহলে বীচি মাটিতে না পুতে দিলেও কলায়। একটা পাথর বাটিতে গোটা কয়েক মুগ কি ছোলা ভিজিয়ে রাখ, দেখ্‌বে, চার পাঁচ দিনের মধ্যেই তাদের গা ফুঁড়ে ছোট ছোট সাদা গ্যাজ বেরিয়েছে। ঐ গ্যাজগুলোই হচ্ছে মুগ কি ছোলার বাচ্চার শিকড়-শুঁড়।

† না খেয়ে দেয়ে কেবল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেঁচে থাকতে সব বীচির বাচ্চা সমান পারে না। কেউ একবছর, কেউ দু'বছর, কেউ পাঁচ বছর, কেউ বিশ বছর কেউ বা একশো বছরও পারে—তারপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মরে যায়। তখন হাজার তাত্ জল দিলেও আর কিছু হয় না। ধান, গম সাত বছর পরেও কলায়, রুদ্রাক্ষের একশো বছরের পুরোনো বীচি থেকেও গাছ হয়।

গাছ-সবুজ।

গাছ-সবুজ যে, গাছের কত দরকারী জিনিষ, তা তোমরা বুঝেছ। গাছ-সবুজ রোদের তেজ ধরে বটে কিন্তু খুব বেশী রোদের তেজে জ্বলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাই উঁচু পাহাড়ের উপরকার গাছ অনেক সময় পাতার গাছ-সবুজকে একটা নীল রং দিয়ে ঢেকে রাখে। ঐ নীল রং কোন কোন গাছে গ্রীষ্মকালে এত গাঢ় হয়, যে কালো দেখায়। তখন আমরা বলি গাছটা রোদ-পোড়া হয়ে গেছে। খুব ঠাণ্ডাতেও অনেক সময় গাছ-সবুজ নষ্ট হয়ে যায়, তাই খুব ঠাণ্ডার দেশেও অনেক গাছের পাতায় নীল রং। কখনো কখনো গাছ সাদা পশমের মত আঁশটা দিয়েও গাছ-সবুজকে ঢেকে রাখে। সমুদ্রের তলায় অনেক ঝাঁঝি আছে, যাদের রং সবুজ নয়, লাল। এর মানে,

---

আবার তাত্ জল পেলেই যে বীচির বাচ্চার ঘুম চড়াৎ করে ভেঙে যায়, তা নয়। অনেক বীচির বাচ্চা মাটিতে পোতবার পরও খানিকক্ষণ ধরে ঘুমোয়। তাত্ জল পেলে সরষের বাচ্চার ঘুম একদিনেই ভেঙে যায়। তাল, নারকোলের চার পাঁচ মাসে ভাঙে। গোলাপের বাচ্চার ঘুম ভাঙতে বছর দুয়েক লাগে। সারলক্ আর ক্রম্ বলে দুরকম বিলাতী গাছ আছে, যাদের বাচ্চা সময় সময় পাঁচ সাত বছরও মাটির তলায় ঘুমিয়ে থাকে, যদি না কেউ মাটি উল্টে দিয়ে তাদের নাড়া দেয়।

কোন কোন বীচির বাচ্চা আবার মোটেই ঘুমোয় না—হয়ে অবধি জেগে থাকে। গরাণেরবীচি গাছে থাকতেই শিকড় বের করে—সেই শিকড় এক হাত দেড় হাত লম্বা হলে পর, বীচিটা তীরের ফলার মত ব্যাচ করে মাটিতে পড়ে, আর যেখানেই পড়ে সেখানেই গেঁথে যায়। কাঁটালেরও অনেক বীচি গাছে থাকতেই ফলের মধ্যে শিকড় বের করে বসে থাকে।

সূর্য্যের আলোতে যে সাত রঙের আলো আছে, তার মধ্যে কেবল নীল আলোটাই সমুদ্রের জলের ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে তলায় পড়ে—অন্য আলোগুলো জলের মধ্যেই আট্‌কা পড়ে যায়। কিন্তু লাল রঙের আলোটাই গাছের দরকার। লাল ঝাঁঝির গাছ-সবুজ যে লাল রং * দিয়ে ঢাকা থাকে, তা ক'রে কি না নীল আলোকে লাল আলোতে বদ্‌লে ফেলে। তখন সেই আলো গাছ-সবুজের কাজে লাগে।

* লাল ঝাঁঝির লাল রং, সে-লাল রং নয়, যা কচি পাতায় কি ফুলের পাপড়ীতে দেখা যায়। এ কাঁচা লাল রং, পরিষ্কার জলে ধুলেই উঠে যায়।

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক।
ও
শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি।

সাধুমা'র কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরে কন্যার এক বছর বয়সের সময় ভয়ানক বসন্ত হয়, তাতে মেয়েটির একদিন বিকার হয়ে ঠিক মৃত্যুবৎ হয়, আমি ও ঠাকুরঝি দুজনে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাই, অন্য ঘরে শুয়ে "মা, মা" ডাকতে থাকি। মা'র দয়া হয়, তিনি আমাকে আমার সেই স্নেহময়ী দিদি রূপে দেখা দেন। স্পষ্ট দেখি, লালপাড়-শাড়িপরিহিতা তিনি আমার সঙ্গে যেমন স্নেহ-স্বরে কথা বলতেন, সেইমত ঠিক বল্‌ছেন,—কেন কাঁদিস্, কোন চিন্তা নেই; আরোগ্যলাভ করবে, ওর পরমায়ু আছে। আমি চুপ করে মনে মনে তাঁর স্তুতি করতে লাগলাম।

কন্যাটি এবার রক্ষা পেয়ে যায়; আমার ঠাকুরঝি বিস্তর পূজা মানসিক করলেন, বাড়ীতে শীতলা মাতার প্রতিমা নির্ম্মাণ করে পূজা হয়েছিল। এ ছাড়া রামবাগানে মাতার অষ্টালঙ্কারে পূজা আর নিজ পাড়ায় মাতার অষ্টালঙ্কার দিয়ে ষোড়শোপচারে পূজা হয়। আমার স্বামীর অন্তর বড়ই কোমল ছিল; অসুখ, কষ্ট ও যাতনা, এ সকলের নিকট যেতে, দেখতে কি সেবাশুশ্রূষা করতে পারতেন না। ঐ কন্যাটিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। কিন্তু যখন শুনলেন যে তার প্রাণসঙ্কট পীড়া, তখন আর অন্দরমহলেও আসতেন না; বাইরে আহার, শয়ন ও সদাসর্ব্বদা চিন্তাসহচরীকে নিয়ে দিনাতিপাত করতেন। যখন আমার বিবাহ হয় তখন তাঁর শরীর খুব কৃশ ছিল, ও

প্রতি মাসে প্রায়ই চার দিন গলাব্যথা ও জ্বর হত, আর ভাত বন্ধ থাকত। তাঁর খুব কড়া নিয়ম ছিল,—জ্বর সর্দ্দি সব সারবে তবে প্রথম একদিন চিঁড়েভাজা গোল-মরিচের গুঁড়া দিয়ে খাবেন; তার পরদিন পল্‌তার সঙ্গে কাঁচামুগের ডাল দিয়ে বড়া, তার পরদিন সুজির রুটি মুগের ডাল, তার পরদিন খিচুড়ি। এই দিনে যদি শরীর ভাল থাক্‌ল, তবে পরের দিন ভাত খাওয়া হবে। তিনি অতিশয় সাবধানী লোক ছিলেন, ও খুব হাসিতামাসা ভালবাসতেন। দাদা প্রায় সকালে বেড়াতে আস্‌তেন, দেখতেন আমি হয়তো দুর্গানাম লিখছি, নয় তরকারী বানাতে বসেছি, কোনদিন বা আবার বড়ি দেবার জোগাড় করে দিচ্ছি। আমার মাকে কখন ঘর ঝাঁট দিতে দেখিনি; বেহারা ঘর ঝাড়ে ও ঝিয়েরা ঝাঁট দেয়। আমার শ্বশুরবাড়ী এসে দেখলাম ঘরদোর খুব পরিষ্কার। এখানেও বেহারা আর ঝিয়েরাই সব করত, তবে ওর মধ্যে হয়তো কোনদিন বেহারার অসুখ হল, কি ঝি বাড়ী গিয়েছে, তাহলে নিজেরাই সব করতেন। তা' দেখে আমার খুব ভাল লাগতো। আবার বামুন না থাকলে, রান্নাঘরে গিয়ে কেউ রান্না করছে, কেউ ভাতে ভাত মাখ্‌ছে, কেউ ভাত বাড়ছে, আবার কেউ ভাত তুলে উপরে বাবুদের দিয়ে আসছে, এতে আমার বড় আহ্লাদ হত। আবার বৈকালে আমরা কাপড় ছেড়ে হয়তো কোনদিন ছাতে একটু বেড়াতে যেতাম, আবার ঠাকুরঝির মেজাজ ভাল থাকলে হয়তো—খোন্ খোন্ খোন্‌তা খুনী দে, আর একজন প্রতিউত্তর দিলে উস্‌কা বাড়ী যা—এ খেলাও হত। এ ছাড়া কোন কোন দিন তাস খেলাও হত। আবার কোনদিন দশ-পঁচিশ বা গোলক-ধাম খেলাও হত। এ ছাড়া, কোনদিন যদি খেলা ভাল না লাগত, তাহলে

জানলায় বসে পাশের বাড়ীর আত্মীয়দের সঙ্গে গল্প হত। এই রকমে বিকেল কাটানো যেত।

সন্ধ্যার আগে আমার স্বামী স্কুল থেকে ফিরে এলে আর কোন চিন্তা নেই; কত গল্প হত, তিনি কত ছবি ও নতুন বই নিয়ে আসতেন। আমি বই পেয়ে খুব খুসী হতাম ও তখনি নিয়ে পড়তাম। যে-কোন রকমেই হোক্, বেশ আনন্দে সময়াতিবাহিত হত।

পরে রাত্রে ভাত খেয়ে ৯টার সময় শোওয়া যেত। বিকেল ৫টার সময় লুচি খাওয়া হত, কাজেই রাত্রে ভাত খেতে বসামাত্র—কিছুই খেতাম না, কারণ তরকারী ভাল হত না। পাঠকপাঠিকারা আমার বাল্যকালের অল্পাহারের তালিকা পাঠ করেছেন, এখন তার অপেক্ষা অনেক কমিয়ে দিয়েছি; কারণ এখানে সকলে যেমন নিয়মে আহার করে, আমিও তাই করি। তাও বেশ সুনিয়মে হত, তবে সেটাও কম নয়। সকাল সাতটার সময় দুধ, তারপর বাজারের কচুরি, জিলেপি; কিম্বা যদি কোনদিন ঘরে খাবার তৈরী হয়েছে, কি কোন বাড়ী থেকে এসেছে, সেদিন আর বাজারের খাবার খেতুম না। পরে বারোটার মধ্যে ডাল, মাছের ঝোল, মাছ-চড়চড়ি, অম্বল—এইটী বাঁধা রেট ছিল। তারপর বেলা দুটোর সময় বাজারের মিহিদানা কিম্বা রসগোল্লা, কোনদিন খাজা, আমার যেদিন যা ইচ্ছে হত, আর এক বাটি দুধ খাওয়া হত। আমের সময় আম, আতার সময় আতা, গরমিকালে আখ কি অন্যান্য ফল পেতাম। কোন কষ্টই ছিল না। আমার সুখের সংসার, সকলি সুখ, দুঃখ কি? তবে আমার স্বামীর মন একটু বুঝে চল্‌তে হত, তাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু কোন ত্রুটি হলে তিনি আর কথা কইতেন না। কয়েকবার এরকম

ভাব দেখি, পরে সেইমত বুঝে চল্‌তাম। আমার ঠাকুরঝির প্রাণ বড় কোমল ছিল। গরীবের প্রতি দয়া, বয়োজ্যেষ্ঠকে মান্য, সমকক্ষ ব্যক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য ব্যবহার,—কারো অসুখ হলে আহারনিদ্রা ছেড়ে সেবা করা,—সকলি ছিল। তবে তাঁর যখন রাগ হত, তখন আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না।, কি গুরুজন, কি বালকবালিকা, আর ঝি-চাকর বামুনের কথাতো স্বতন্ত্র,—তাঁদের উপর যদি একবার রাগ চড়লো, তবে সমস্ত দিন চল্‌লো। যাহোক, তাঁর এই ক্রোধের জন্য তিনি একটি দিন সুখশান্তি পাননি। আমাকে ভালবাসতেনও বেশী, আবার রাগ ঝাড়তেনও অত্যন্ত। আমার এক একবার মনে দুঃখ ও অভিমান হত, আবার এক একবার গ্রাহ্য করতাম না। তাঁর কিন্তু এ দুই ব্যবহারেই রাগ বৃদ্ধি হয়ে উঠতো। যদি আমাকে কাঁদতে দেখতেন, তাহলে বলতেন—আহা! কি পান্‌সে চোখ গো, অমনি প্যান্‌প্যানাতে বসেছে। তবে রোজ রোজ মিছে কথায় বকুনি হত বলে আমার অন্তঃকরণেও একটা দৃঢ়তা এসে পড়তো। আর গ্রাহ্য বা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম না, আপনার কাজ সেরে নিয়ে একটু তফাৎ হয়ে পড়তাম—একখানা বই কি সেলাই নিয়ে বস্‌তাম। তাতে আরও বেশী রেগে যেতেন, ও বলতেন—আমার কথা আর গ্রাহ্য হয় না, আপনার মদ-গর্ব্বে আছিস্‌, কর্‌ কর্‌ কর্‌, যত পারিস কর্‌—এ অহঙ্কার চিরদিন থাকবার নয়। একপ্রকার তিনি ঠিক কথাই বলতেন, কিন্তু তখন এ কথার এ অর্থ বুঝিনি। শুনে গা রোমাঞ্চিত হত—ওঃ, মনে কি দুঃখই না হত! এই কথাটি মনে হত যে—হে গোপাল, আমার কি অহঙ্কার তা তুমি জান, আমিও কিছুই অহঙ্কারের কাজ করিনি তবে আমাকে কেন এ কথা শুন্‌তে হয়।

প্রভু, তুমি অন্তর্য্যামি, তুমি অন্তরের কথা সকলি জান, দয়াময় হরি! তবে এ অন্যায় বাক্য-বাণ আমাকে কেন শোনাও। আমার কতদিন মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে, রাত্রে আমার স্বামী ঘুমোবার পর, ঠাকুর-দালানে গিয়ে পড়তাম। এ কথা কেউ এ পর্য্যন্ত জানে না, কিন্তু এতেই আমার মনোবেদনা ভগবানের চরণে পৌঁছত, তিনি আমার মনে শান্তি দিতেন।

যাহোক, এতে আমি একদিনের জন্যও ম্রিয়মাণ হইনি, সর্ব্বদাই প্রফুল্লভাবে থাকতাম। পরে আমি অনেক দূরে এসে পড়েছি; আমার কন্যা হয়েছে লিখে তারপর আমার বধূ-অবস্থার কথা এনে ফেলেছি। কন্যাটি বসন্ত হয়ে অনেক কষ্টে বাঁচলো, কিন্তু আমার গর্ভে যে সন্তানটি ছিল, সেটি আটদিনের হয়েই ধনুষ্টংকার রোগে মারা যায়। এক বছর পরে আমার আর একটি পুত্র হয়। এরও বাঁচবার ভরসা বেশী ছিল না। তবে একমাত্র বিশ্বাস আমার গুরুদেব একটী রক্ষা-কবচ দিয়েছেন; ঐ কবচের নিয়ম—যখন তিন মাস, তখন প্রসূতি ধারণ করবে, আর কখনও আঁতুড়ের ধোঁয়া লাগাবে না বা মৃতব্যক্তিকে ছোঁবে না; বালক ভুমিষ্ট হ'বামাত্র গলায় দেবে, লাল সূতো কিম্বা স্বর্ণহারে গেঁথে। বালকটী ক্রমে একটু সবল হ'ল।

এই ছেলেটী হবার ঠিক একমাস পূর্ব্বে আমাদের ছোটদাদা-মশায় স্বর্গগামী হন। আমার স্বামীমশায় তাঁর বড় অনুগত ছিলেন, তিনিও তাঁকে বড়ই স্নেহ ও আদর করতেন। তাঁর মৃত্যুতে আমার স্বামীর ভাবের বড়ই পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল, আর তত আনন্দ, নকল পুতুল কেনা, নানারকম ছবি কেনা নেই—সব কমে গেল। তাঁর খুব গম্ভীর ভাব এল; কি যে ভাবেন, তা তিনি নিজেই বোঝেন না। আমার

জ্যেঠামশায়, শ্বশুরমশায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁরও ঐ শ্রাবণ মাসে মৃত্যু হয়। তিনি আমার স্বামীকে বহু যত্নে প্রতিপালন করেছিলেন, আমার স্বামীও তাঁর সাধ্যমত সেবা করতে ত্রুটি করেননি। সংসার খরচ আমার জ্যেঠামশায়ই চালাতেন, তাঁর অসুখ বেশী হওয়া অবধি তিনি আমার স্বামীকে সব দেখিয়ে দেন, খাতাপত্র হিসেব বুঝিয়ে দেন। সেই অবধি দশ বৎসর কাল আমি ও ঠাকুরঝি সংসার দেখি। ক্রমে ক্রমে আমাদের অনেকগুলি পরিবার বৃদ্ধি হ'ল; ও-বাড়ীতে আর কুলোয় না, বড় কষ্টে সকলে একরকম করে থাকে।

দু'বছর পরে মালিক কর্ত্তাদাদামশায়ের ৺গঙ্গালাভ হয়, তাঁর খুব সমারোহের সঙ্গে বৃষোৎসর্গ অর্দ্ধদানসাগর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

পরে দু'তিন বৎসর একরূপ যায়। তারপর আমি আমার কন্যার কর্ণবেধ করবার অভিপ্রায়ে লোকজনের কাপড় রং করবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় পরামাণিক এসে বল্‌লে—আপনি জানেন না, কাল দাদাবাবুর ভয়ানক অসুখ হয়েছে, তিনি অজ্ঞান অবস্থায় আছেন। আর আমার কাপড় রং করা কোথায় গেল, আমার ঝি ছুটে গিয়ে পাল্‌কী আনলো। আমি গিয়ে সিঁড়িতে উঠেই দালানে এই দৃশ্য দেখলাম—মা দাদাকে কোলের কাছে নিয়ে বসে আছেন, আর চাকরবাকর ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করছে; কেউ বা বরফ ভাঙছে, কেউ বা রক্ত মোছাবার জন্য প্রয়াস পাচ্ছে। সাহেব ডাক্তার দু'জন দেখতে লাগলো। দাদা ছ'দিন জীবিত ছিলেন, পরে সংসারকে কাঁদিয়ে, এ অনিত্য-ধাম ছেড়ে, সেই নিত্য-ধামে নিত্যানন্দের চরণ প্রান্তে পৌঁছলেন। তাঁর জন্য বাড়ীতে হাহাকার পড়ে গেল, পিতামহপিতামহীর অতি যত্নের ধন বৃদ্ধ অবস্থায় ছাড়তে হ'ল, মা

তাঁকে হারিয়ে শয্যাশায়ী হলেন। কেবল আমার আরও দৃঢ়তা এলো, বুঝলাম যে এ সংসার কিছু নয়, দু'দিনের হাসিখেলা। অনন্তধামে গিয়ে দাদা আজ ভবযাতনার হাত হতে নিষ্কৃতি পেলেন। আমার পিতামহ বাতুল, পিতামহী স্ত্রীলোক, তাতে তিন চার পুরুষের পূর্ব্ব দেনা বে-বন্দোবস্তের জন্য ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয়; সেজন্য দাদা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর বড় কষ্ট পেতে হবে। তিনি বড় উত্তম লোক ছিলেন, উত্তম স্থানে শীঘ্র ডাক পড়লো, তাঁকে কেন এই মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা-গর্ব্বময় সংসারে থাকতে হবে। ঐহিকের পক্ষে ধন না থাকলে কিছুই কিছু নয়,—ঐহিক সুখ ধন নিয়ে। যারা বাল্যকালে পরমার্থে পদার্পণ করেছে, তাদের কথা বুঝিওনে অথবা বোঝবার ক্ষমতা বোধহয় আর এ জীবনে হবে না। তবে যারা ঐহিক সুখে প্রতিপালিত, তাদের পরমার্থ চিন্তার নিশ্চিন্ততা যদি পাবার আশা করা যায়, তাহলেও কিছু ধন চাই; নাহলে উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরতে হয়। আবার বিতাড়িত হলে অনেক গৈরিকধারী ও প্রকাণ্ড জটাজুটধারীও মহা ক্রুদ্ধ হন। অতএব এখন দেখছি, বিষয়-বিষ একবার যে পান করেছে, তার দেহ জরে গিয়েছে, তখন ও বিষ যাবৎ জীবন রইবে তাবৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করা চাই; তা' নাহলে অঙ্গ শিথিল হয়ে আসে, পরমার্থ পথ হতেও হটিয়ে দেয়।

আমার দাদার জন্য আমি জপ সঙ্কল্প আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু তাতেও দেখলাম বিঘ্ন। জপ ধরে অবশ্য কিছু অগ্রসর হয়েছি, পরে দেখি নিদ্রা এসে কর ছেড়ে গিয়েছে, তখন চমক্ ভাঙলো। এই রকম পুনঃপুনঃ বাধা পড়লো। যাহোক, দাদা চলে গেলেন, এবারকার

চিন্তার বিরাম লাভ হ'ল। ঠাকুরঝি মাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে খুব কাঁদতে লাগলেন। আমার কান্না নেই, কি জানি ভগবানের ই সৃষ্টিতে আমাকে কি প্রণালীতে গড়েছেন! কান্না না আস্‌লে তো আর কাঁদতে পারিনে। আমার মনের ভাব এই যে—ভগবান তাঁর চিন্তার অবসান করলেন, তাঁর জন্য আমি কেন কাঁদি? বরং দাদা কষ্ট পেলে আমার কান্না আস্‌তো; আমার দ্বারা তাঁর কোন উপকার হ'ত না, বা হবার সম্ভাবনা ছিল না, কেননা আমি পরবশ, গৃহস্থ ঘরে বিবাহ হয়েছে। আর এক কথা, মানুষে নিজ নিজ কর্ম্মভোগ করতে আসে। কর্ম্ম ফুরোলেই চলে যায়, তাতেই বা কান্না কি? তবে এক দুঃখ যে, বৃদ্ধ পিতামহ অতি ব্যাকুল, তাঁর নিকট গেলে বড় কান্না পায়,—মনে হয় যে তুমি বড় মন্দভাগ্য।

আমার উল্টো লেখা হয়েছে। এর দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতামাতা প্রয়াগধামে যান। পরে সেখানে বাবা কোম্পানির ইনস্‌পেক্টারি কর্ম্ম পান। আড়াই শত পর্য্যন্ত হবার কথা, দুই শত মাইনেয় ভর্ত্তি হন। বেশ ছিলেন, হঠাৎ একদিন কলেরা হয়। দাদা সেখানে আনারস ও অন্যান্য ফল নিয়ে গিয়ে শোনেন যে, তিনি জগত হতে বিদায় নিয়েছেন। মা একেবারে অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন। তিনি কিছুতেই কলকাতায় আসবেন না। দাদা অনেক বুঝিয়ে জোর ক'রে নিয়ে আসেন। সে দাদাও আজ চলে গেল, মা'র কি ভাগ্য। এই-সকল চিন্তা একের পর এক এসে আমার হৃদয়খানা যেন ভেঙে চুরমার করতে লাগলো, আবার এক একবার পাঁজরাগুলো কন্‌-কন্ করে উঠ্‌লো—ভাবলাম আর আমার শান্তির আশা নেই। এত মন খারাপ নিয়ে কি সুখ, বেঁচেই বা ফল কি। ওরে মন, তুমি কি জান

না, সকলি তোমার পূর্ব্ব কর্ম্মফলে প্রাপ্ত। ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আবৃত, মানুষের নিয়ম এই—যতদিন যায়, তত সহ্য করবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, হৃদয়ও তত দৃঢ় হয়। আমি এইরকম হওয়াতে আমার স্বামীও একটু চিন্তিত হয়েছিলেন, আর আমাকে সদাসর্ব্বদা অন্যমনস্ক রাখবার জন্য যত্ন করতে লাগলেন।

হঠাৎ আমার স্বামীর কোমরে ব্যথা হয়ে জ্বর হয়, ও তারপর বিকার হয়। তখন আর আমার অন্যমনস্ক থাকা চলে না। আমিও প্রাণপণ শক্তিতে লেগেছি, রাত ও দিন কোথা দিয়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। প্রাতে পথ্য প্রস্তুত থেকে, এদিকে মাথায় বরফ দেওয়া, ঔষধ খাওয়ানো; তা ছাড়া তিনি জোর করে উঠ্‌লে, তাঁকে ধরে রাখা। আর সমস্ত দিনরাত ভগবানের নাম জপ করতাম। তা ছাড়া রাত্রে 'মা' 'মা' করে কাতরস্বরে করুণা ভিক্ষা ক'রতাম। একদিন এমন অসুখ বৃদ্ধি হ'ল যে, সেদিন আর বুঝি রক্ষা হয় না। আমি অন্য একটা ঘরে, যেখানে আমরা পূজা ও আহ্নিক করি, সেখানে গিয়ে আমার দয়াময়ী মাকে ডাক্‌তে লাগলাম—মা! এবার কি করলে, এবার রক্ষা কর্ মা, তুই না রাখ্‌লে কে রাখবে?—এমনি অনেক ডাকলাম ও কাঁদ্‌লাম। পরে এও বল্‌লাম—তমোময়ী ঘোর ত্রিযামা, মা বলে মা ডাক্‌ছি শ্যামা, হররমা দেখা দে মা, মা'তো কঠিন নয়তো কারু। মা'র কোমল প্রাণে ব্যথা লাগলো, মা প্রাণে শান্তি দিলেন। আমার তন্দ্রা আস্‌লো। আমি দেখলাম, মা আমার দশভুজারূপে হাত বাড়িয়ে বলছেন—ওঠ্, আর ভয় নেই, এ যাত্রায় রক্ষা হ'লো। সে মূর্ত্তিটি আমার আজও হৃদয়ে জাগরুক। মা'র কি ভাব, তা আমার মত মূর্খের বর্ণনার অতীত। কিন্তু পাঠক পাঠিকারা বোধহয় দেখে

থাকবেন, যখন সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র অকালে বোধন করে নীল পদ্ম দিয়ে মাতার অর্চ্চনা করেন, তখন মা ছলনা ক'রে একটি পদ্ম হরণ করেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র দৃঢ় ভক্তির পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁর পদ্মআঁখি উৎপাটিত করতে গিয়ে। তখনকার একখানি ছবি আমার আছে, আর্ট ষ্টুডিও-রা ছেপেছেন। আমার দয়াময়ী মা সেই মূর্ত্তি ধরে আমার হৃদয়পটে আস্‌লেন। সে কী রূপ তা যদিও আমি বর্ণনা করতে অক্ষম, তথাপি যতটুকু পারি বল্‌ব। মা আমার সুবর্ণবরণী, স্বর্ণকারুখচিত লাল বস্ত্র পরিধানে, মণিমুক্তার অলঙ্কারে ভূষিতা, দশ করে দশ প্রহরণ, সিংহবাহিনী জননী, ত্রিনয়না, সহাস্যবদনা। মা যেমন করে' হস্ত প্রসারণ করে রামচন্দ্রকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন—রে পুত্র! আর নয়ন উৎপাটন করিস্ না, আমি এসেছি।—আমাকেও তেমনি অভয়া মূর্ত্তিতে দর্শন দেন। মা! এ জীবনে তোমার দয়া বার বার পেয়েছি, তা যেন ভুলিনে মা! যাহোক্, এমনি করে সে রাত জীবন রক্ষা হ'ল।

(ক্রমশঃ)

কাব্য-জিজ্ঞাসা।

শেষ প্রস্তাব।

(১)

হেল্ম্‌হোল্‌ৎস্‌ আবিষ্কার করেছিলেন যে মানুষের চক্ষু, যাকে লোকে প্রকৃতির সৃষ্টি কৌশলের একটা চূড়ান্ত উদাহরণ মনে করে, সেটি যন্ত্র হিসাবে দোষ ও ত্রুটিতে ভরপুর। আলোকরশ্মিকে গুছিয়ে এনে রেটিনার পর্দ্দায় ছায়া ফেলার জন্য চোখের যে সাম্‌নে পেছনে, উপরে নীচে, ডাইনে বায়ে গতি আছে তার সীমা অতি সামান্য। ফলে একটু বেশী দূরের জিনিষও দৃষ্টির বাইরে থাকে, একটু বেশী কাছের জিনিষও দেখা যায় না। চোখকে তাজা রাখার জন্য যে সব নাড়ী তাতে রক্ত সরবরাহ করে, তারাই আবার অবিচ্ছিন্ন আলো প্রবেশের বাধা। দু চোখের দৃষ্টি যাতে দুমুখো না হয়ে একমুখীন হয়, তার যন্ত্রপাতির মধ্যেও নানা গলদ। মোটের উপর এরকম একটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যদি কেউ হেল্ম্‌হোল্‌ৎস্‌ কে বেচতে আস্‌ত, তবে কেনা দূরে থাক তিনি তাকে বেশ কড়া দুকথা শুনিয়ে দিতেন। কিন্তু এ সব সত্বেও মানুষের চোখ মানুষের অমূল্য সম্পদ। কারণ তার নিত্য ঘরকন্নার কাজ ওতেই বেশ চলে যায়; ও সব দোষ ত্রুটিতে কোনও বাধা হয় না। কেন না সেগুলি ধরা পড়ে বীক্ষণে নয়, অণুবীক্ষণে। চোখের মত কাব্যকেও সমালোচনার 'অপ্‌থাল্‌মস্‌-কোপ্‌' দিয়ে দেখ্‌লে, শ্রেষ্ঠ কাব্যেও নানা দোষত্রুটি আবিষ্কার করা

যায়। বিশ্বনাথ বলেছেন, নির্দ্দোষ না হ'লে যদি কাব্য না হ'ত, তবে কাব্য পদার্থটি হ'ত অতি বিরল, এমন কি নির্ব্বিষয়; কারণ সর্ব্ব রকমে নির্দ্দোষ কাব্য একান্ত অসম্ভব। (১) কিন্তু চোখের কাজ যেমন নির্দ্দোষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র হওয়া নয়, মানুষকে রূপের জ্ঞান দেওয়া, কাব্যের কাজ তেম্‌নি দোষহীন শব্দার্থের রচনা নয়, রসের সৃষ্টি করা। সুতরাং দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও যে প্রবন্ধ রসসৃষ্টিতে সফল, তা কাব্য। আর সেখানে যা নিষ্ফল তার রচনার দোষগুণ কাব্যের দোষগুণ নয়, কারণ কাব্যত্বই সেখানে নেই। আনন্দবৰ্দ্ধন কাব্যের দোষ দু ভাগে ভাগ করে' কথাটা বিশদ করেছেন। "দ্বিবিধো হি দোষঃ—কবেরব্যুৎপত্তিকৃতোঽশক্তিকৃতশ্চ।" (২) 'কাব্যের দোষ দু রকমের—কবির অব্যুৎপত্তিকৃত ও কবির অশক্তিজনিত।' ছোট খাটো অসঙ্গতি ও অনৌচিত্য, ভাষার কাঠিন্য, ছন্দের অলালিত্য— কবির অব্যুৎপত্তিকৃত এ সব দোষ কাব্যের পক্ষে মারাত্মক নয়। কারণ,

"অব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্ত্যা সংব্রিয়তে কবেঃ।

যস্ত্বশক্তিকৃতস্তস্য [illegible]।" (ধ্বন্যালোক, ৩।৬, বৃত্তি।) 'অব্যুৎপত্তিকৃত যে দোষ, কবির শক্তি [illegible] সংবরণ করে' রাখে।' অর্থাৎ শক্তি [illegible] থেকে

---

(১) এবং কাব্যং প্রবিরলবিষয়ং নির্বিষয়ং বা স্যাৎ। সর্ব্বথা নির্দোষস্যৈ-কান্তমসম্ভবাৎ। (সাহিত্যদর্পণ।)

(২) ধ্বন্যালোক। ৩।৬।

যায়। (৩) কিন্তু কাব্যের যে দোষের মূল হচ্ছে কবির রসসৃষ্টিশক্তির লাঘবত্তা, সহৃদয় পাঠকের চিত্তে সে দোষ মুহূর্ত্তেই প্রতিভাত হয়।' এবং এই দোষই কাব্যের যথার্থ দোষ। নইলে 'ব্যুৎপত্তির'— অভিনবগুপ্ত যাকে বলেছেন, "তদুপযোগিসমস্তবস্তুপৌর্ব্বাপর্য্যপরামর্শ-কৌশলম্", কাব্যের সমস্ত বস্তু উদ্দিষ্ট রসের উপযোগী কিনা তার পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করে' প্রয়োগ কৌশল,—তার অভাব মহাকবিদের কাব্য-প্রবন্ধেও মাঝে মাঝে দেখা যায়; কিন্তু, যেমন অভিনবগুপ্ত বলেছেন, 'এ নি তাদের কবি-প্রতিভা যে তাদের কাব্যের প্রতি বর্ণিত বিষয় চিত্তকে সেখানেই বন্দী করে' রাখে, পৌর্ব্বাপর্য্যবিচারের অবসর দেয় না। কেমন, যেমন অতি পরাক্রম-শালী পুরুষের অনুচিত বিষয়েও যুদ্ধের বিক্রম দেখে সাধুবাদ দিতে হয়, পৌর্ব্বাপর্য্যবিচারের দিকে মন থাকে না।' (৪) বিপুল রস-নিঃষ্যন্দী, এবং প্রতি কাব্যাঙ্গ যে রসকে উপচিত ও প্রগাঢ় করছে, এমন কাব্য খুব বেশী সৃষ্টি হয়নি। সেইজন্য আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন, 'কাব্যের সংসার অতি বিচিত্র কবিপরম্পরাবাহিনী বটে; কিন্তু মহাকবি বলতে কালিদাস প্রভৃতি দু' তিন, পাঁচ জনকেই গণনা করা চলে।'

---

(৩) "তত্রাব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্তিতিরস্কৃতত্বাৎ কদাচিন্ন লক্ষ্যতে।" (ধ্বন্যালোক, ৩।৬।)

(৪) "......অসৌ বর্ণিতস্তথা প্রতিভানবতা কবিনা যথা তত্রৈব বিশ্রান্তং হৃদয়ং পৌর্বাপর্য্যপরামর্শং কর্ত্তুং ন দদাতি। যথা নির্ব্যাজপরাক্রমস্য পুরুষস্যা-বিষয়েঽপি যুধ্যমানস্য তাবত্তস্মিন্নবসরে সাধুবাদো বিতীর্য্যতে ন তু পৌর্বাপর্য্য-পরামর্শো তথাত্রাপীতি ভাবঃ।" (অভিনবগুপ্ত; ধ্বন্যালোকলোচন, ৩।৬।)

(৫) সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে তাকালেও আনন্দবর্দ্ধনের কথা বেশী বদল করতে হয় না। কালিদাস যখন বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি প্রবৃত্তিকে সমগ্রবিধগুণের পরাঙ্মুখী বলেছিলেন, তখন কবি-প্রতিভার সৃষ্টির কথাও নিশ্চয় তাঁর মনে ছিল।

কাব্যের সঙ্গে কাব্যের বড় ছোটর যে ভেদ, সে ভেদ রসের তারতম্য নিয়ে। কাব্য ও অকাব্যের প্রভেদ সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। কাব্যের রস-সৃষ্টির যা সব উপকরণ,—কথা, ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ—সেই মালমশ্‌লা দিয়ে যে রচনা, অথচ কাব্যের আত্মা 'রস' যাতে নেই, তাই হচ্ছে 'অকাব্য'। আলঙ্কারিকেরা এ শ্রেণীর রচনার নাম দিয়েছেন 'চিত্র-কাব্য'। চিত্র যেমন বস্তুর অনুকরণ কিন্তু বস্তু নয়, এও তেমনি কাব্যের অনুকরণ কিন্তু কাব্য নয়। (৬) এ রকম অকাব্য বা চিত্র-কাব্যের যে রচনা হয়, তার নানা কারণ। প্রধান কারণ—রসসৃষ্টির প্রতিভা যার নেই, তার কাব্য রচনার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার বেগে যা রচনা করা চলে, তা স্বভাবতঃই কাব্য হয় না, হয় কাব্যের বাহ্যিক মূর্ত্তি মাত্র। এই জন্যই প্রতিভাশালী কবির অকবি সমসাময়িক কবি-যশঃপ্রার্থীরা তাঁর ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গীর যথাসাধ্য অনুকরণ করে থাকে। কারণ কাব্যরসের ঐ মূর্ত্তিই তখন তাদের চোখের সামনে সব চেয়ে দেদীপ্যমান। এবং তাদের মনের ভরসা

---

(৫) "অস্মিন্নতিবিচিত্র কবিপরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চষা বা মহাকবয় ইতি গণ্যন্তে।" (ধ্বন্যালোক, ১।৬।)

(৬) "কেবল বাচ্যবাচকবৈচিত্র্যমাত্রাশ্রয়েণোপনিবদ্ধমালেখ্যপ্রখ্যং যদাভাসতে তচ্চিত্রম্। ন তন্মুখ্যং কাব্যম্। কাব্যানুকারো হ্যসৌ।" (ধ্বন্যালোক, ৩।৪২, ৪৩।)

এই যে কতকটা ঐ রকমের মূর্ত্তি গড়তে পারলেই, তার মধ্যে প্রাণ আপনি এসে যাবে। আনন্দবর্দ্ধন লিখেছেন যে, রসতৎপরতাশূন্য বিশৃঙ্খলবাক্ লেখকদের কাব্যরচনার প্রবৃত্তিদেখে তিনি 'চিত্রকাব্য' নামটির পরিকল্পনা করেছেন। (৭) কিন্তু আনন্দবর্দ্ধন এ শ্রেণীর লেখকদের উপর অবিচার করেননি। সূক্ষ্ম বিচার করে' এদের যেটুকু পাওনা, তা তাদের দিয়েছেন। এদের রচনাকে যে নীরস বলা হয়, তার অর্থ নয় যে 'রস' তাতে একবারেই নেই; কারণ বস্তু সংস্পর্শহীন রচনা হয় না। এবং জগতের সব বস্তুই কোনও না কোনও রসের অঙ্গত্ব ধারণ করতে পারে। 'রস' হচ্ছে বিভাবজনিত চিত্তবৃত্তি বিশেষ। এমন কোনও বস্তু নেই, যা কাব্যের আকারে গ্রথিত হ'লে, কিছু না কিছু এ রকম চিত্তবৃত্তির জন্ম দেয় না। যদি থাকে, তবে সে বস্তুকে চিত্র-কাব্যের লেখকেরাও তাদের রচনার বিষয় করে না। (৮) কিন্তু অকবির কাব্যাকার বাচ্যসামর্থ্যবশে যে রসের সৃষ্টি হয়, তার প্রতীতি অতি দুর্ব্বল। এবং এই দুর্ব্বল রস-রচনাকেই নীরস চিত্র্য-কাব্য বলা হয়। ("বাচ্যসামর্থ্যবশেন... তথাবিধে বিষয়ে রসাদিপ্রতীতির্ভবন্তী পরিদুর্ব্বলা ভবতীত্যনেনাপি প্রকারেণ নীরসত্বং পরিকল্প্য চিত্র-বিষয়ো ব্যবস্থাপ্যতে।") অর্থাৎ,

---

(৭) "এতচ্চ চিত্রং কবীনাং বিশৃঙ্খলগিরাং রসাদিতাৎপর্য্যমনপেক্ষ্যৈব কাব্যপ্রবৃত্তিদর্শনাদস্মাভিঃ পরিকল্পিতম্।" (ঐ)

(৮) যস্মাদবস্তুসংস্পর্শিতা কাব্যস্য নোপপদ্যতে। বস্তু চ সর্ব্বমেব জগদ্গতম-বশ্যং কস্যচিদ্রসস্য চাঙ্গত্বং প্রতিপদ্যতে। বিভাবত্বেন চিত্তবৃত্তিবিশেষা হি রসাদয়ঃ; ন চ তদস্তি বস্তু কিংচিৎ যন্ন চিত্তবৃত্তিবিশেষমুপজনয়তি, তদনুৎপাদনে বা কবিবিষয়তৈব তস্য ন স্যাৎ।" (ঐ)

যে কোনও 'রস' যা কিছু পরিমাণে থাক্‌লেই কাব্য হয় না। সহৃদয় কাব্য-রসিকের চিত্তের রসপ্রতীতির প্রথম ধাপেও যা না পৌঁছে; তা কাব্য নয়, চিত্র-কাব্য।

শক্তিহীন লেখকের রস-সৃষ্টির প্রয়াস চিত্র-কাব্য রচনার একমাত্র কারণ নয়। অনেক নিবন্ধ কাব্যের আকার দিয়ে লেখা হয়, রস-সৃষ্টি যাদের লক্ষ্যই নয়। যাদের উদ্দেশ্য—উপদেশ দেওয়া, প্রচার করা, মানুষের বুদ্ধির কাছে কোনও সত্যকে প্রকাশ করা। যেমন পোপের 'এসে অন্ ম্যান', কি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব-শতক'। এ সব রচনাকে কাব্যের আকারে গড়াতে এদের মধ্যে যে দুর্ব্বল রসাভাসের সৃষ্টি হয়, তার উদ্দেশ্য বাচ্য বা বক্তব্যকে কিঞ্চিৎ সরস করা মাত্র। রস এখানে উপায়, বক্তব্যই লক্ষ্য। মহাকবিরাও খেলাচ্ছলে মাঝে মাঝে এ রকম চিত্র-কাব্য রচনা করেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'।

কানা-কড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে,—
তুমি ষোলো আনা মাত্র, নহ পাঁচসিকে!
টাকা কয়, আমি তাই, মূল্য মোর যথা,—
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশী কথা!

এর যা আবেদন তা মানুষের চিত্তের কাছে নয়, মানুষের বুদ্ধির কাছে। কেবল বক্তব্যের চমৎকারিত্বে ও বাক্যের নিপুণতায় একে কাব্য বলে' ভ্রম হয়। কিন্তু কবি যখন লিখ্‌লেন,—

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।

ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য্য উঠি বলে তারে—ভাল আছ ভাই ?

তখন বাচ্য স্পষ্টই বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে রসের ধ্বনিতে চিত্তকে ঘা দিল। অকবির কাব্য সৃষ্টির প্রয়াস চিত্র-কাব্যের রচনা করে। মহাকবির চিত্র-কাব্য নিয়ে খেলাও, কাব্য হ'য়ে ওঠে।

(২)

রসের যোগান্ যথেষ্ট না থাক্‌লে কাব্য হয় না সে কথা ঠিক, কিন্তু রস কি কাব্যের চরম লক্ষ্য ? অনেক লোকের মন এ কথায় সায় দেয় না। তাঁরা বলেন শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তার রসের ব্যাপকতা ও গভীরতায় নয়; ঐ রস-সৃষ্টির ভিতর দিয়ে কবি যে মহত্তর ও বৃহত্তর জিনিষ মানুষকে দান করেন, তারই মধ্যে। সে জিনিষ কি, সে সম্বন্ধে মতের ঠিক ঐক্য নেই। কেউ বলেন, কবি রসের তুলিতে মঙ্গলকে মানুষের চিত্তে এঁকে দেন; কেউ বলেন, কবি সত্যকে রসের মূর্ত্তিতে প্রকাশ করেন। তবে এ সব মতেরই মনের কথা এই যে, রস-বস্তুটির নিজের ওজন খুব বেশী নয়। এবং ঐ হাল্‌কা জিনিষই যদি কাব্যের চরম বস্তু হ'ত, তবে কাব্য হ'ত ছেলেখেলা, জ্ঞানীর উপাদেয় নয়। অর্থাৎ কাব্যের সুন্দরের আড়ালে সত্য ও শিব আছে বলেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব।

সভ্যতার সকল সৃষ্টিই সম্ভব হয়েছে সমাজ-বন্ধন মানুষকে পশুত্ব থেকে যে মুক্তি দিয়েছে, সেই মুক্তির জোরে। মানুষের কতকগুলি চিত্তবৃত্তির বিশেষ বিশেষ প্রবণতার উপর সমাজের স্থিতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। কাব্য-রসের মধ্য দিয়ে যাঁরা মঙ্গলকে চান, একটু

পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, তাঁরা চান যেন কাব্য এই সব সামাজিক চিত্তবৃত্তিগুলির দিকে পাঠকের মনকে অনুকূল করে। কাব্যের কাছে সভ্যতার মূল ভিত্তির এই দাবী আলঙ্কারিকেরা একবারে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাঁরা কাব্য-রসকে 'লোকোত্তর' বলেছেন সত্য, কিন্তু এই অলৌকিক বস্তু লৌকিক জগতের কোনও হিতেই লাগে না, সমাজের বুকে থেকে এত বড় অসামাজিক কথা সোজাসুজি প্রচার করা তাঁরা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। সুতরাং তাঁদের গ্রন্থারম্ভে অনেক আলঙ্কারিক প্রমাণ করেছেন, যে কাব্য থেকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হয়। (৯) কাব্য কবিকে যশ ও অর্থ, সুতরাং সকল কাম্যবস্তু দান করে। কাব্যে যে সব দেবতাস্তুতি থাকে তারা ধর্ম্মের সহায়, এবং ধর্ম্মের শেষ ফল মোক্ষ। কাব্য লোককে কৃত্যে প্রবৃত্তি ও অকৃত্যে নিবৃত্তি দেয়। কাব্য পাঠককে উপদেশ করে, "রামদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং না রাবণাদিবৎ", রামের মত পিতৃ-সত্য পালনের জন্য বনে যাওয়া উচিত, রাবণের মত পরদারহরণ অনুচিত। (১০) তবে এ উপদেশ নীরস শাস্ত্র-বাক্যের উপদেশ নয়, "কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে" (১১), কান্তার উপদেশের মত সরস, অর্থাৎ অম্ল-মধুর, উপদেশ।

---

(৯) চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি। কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে ॥ (সাহিত্যদর্পণ, ।২)।

(১০) চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির্হি কাব্যতো রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবদিত্যাদিকৃত্যাকৃত্যপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপদেশদ্বারেণ সুপ্রতীতৈব। (সাহিত্যদর্পণ ।২)

(১১) কাব্যপ্রকাশ।

কাব্য-রসের এই ফলশ্রুতি যে আলঙ্কারিকদের মনের কথা নয়, সমাজ ও সামাজিক লোকের সঙ্গে মুখের আপোষের কথা, তার প্রমাণ, ও সব কথা তাঁদের গ্রন্থের আরম্ভেই আছে, গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে তাদের লেশমাত্রেরও খোঁজ পাওয়া যায় না। সেখানে তাঁরা বলেন,---

"বাগ্ধেনুর্দুগ্ধ একং হি রসং যল্লাভতৃষ্ণয়া।
তেন নাস্য সমঃ স স্যাদ্দুহ্যতে যোগিভির্হিযঃ॥" (ভট্টনায়ক।)

'কাব্যের বাগ্-ধেনু থেকে যে রস-দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, যোগিরা যে তত্ত্বরস দোহন করেন, সেও তার সমান নয়।' অভিনবগুপ্ত 'রসের' আস্বাদকে বলেছেন, "পরব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ" (ধ্বন্যালোকলোচন, ২।৪), —'পরব্রহ্মের আস্বাদের তুল্য আস্বাদ।' রসের স্বরূপ বল্‌তে গিয়ে আলঙ্কারিকেরা বলেছেন,—

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥" (সাহিত্য দর্পণ।)

'রস এক ঘন আনন্দস্বরূপ চেতনা; কোনও বিষয়ান্তরের সংস্পর্শে এর প্রবাহ বিছিন্ন নয়; যে রজঃ মানুষের কামনা ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তির মূল, যে তমঃ তার চিত্তকে লোভ ও মোহে বদ্ধ ও আবৃত রাখে—তাদের সম্পূর্ণ অভিভূত করে' সত্ত্বরূপে এর আবির্ভাব হয়। সুতরাং এর আস্বাদ ব্রহ্মের আস্বাদের সহোদর।'

বলা বাহুল্য উপনিষদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বর্ণনার অনুকরণে আলঙ্কারিকেরা রসের আস্বাদের এই বর্ণনা করেছেন। তাঁরা যে কাব্যরসিকের রসের আস্বাদকে যোগীর পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের তুল্য

বলেছেন, তার অর্থ সুধু এই নয় যে, রস অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের আর কোনও অন্য ফল নেই। ব্রহ্মসাক্ষাৎলাভে কি লাভ হয়—এটা প্রশ্ন নয়, প্রলাপ। কারণ, "আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে",—আত্মলাভের পর আর কিছু নেই। "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"—পরমপুরুষের সাক্ষাৎকারের পর কিছুই নেই, সীমার সেখানে শেষ, গতির সেখানে নিবৃত্তি। এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সঙ্গে রসের আস্বাদের তুলনা করে' আলঙ্কারিকেরা এই কথাই প্রকাশ করেছেন যে, রসের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ান্তর নিরপেক্ষ। আর কোনও কিছুর উপায় হিসাবে রসের মূল্য নয়। যেমন ব্রহ্ম সম্বন্ধে তেম্‌নি রসের সম্বন্ধে 'ততঃ কিম্‌', এ প্রশ্ন অর্থহীন। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ লাভে মানুষের সামাজিক জীবনের উপকার কি হয়, এ অনুসন্ধানও যেমন, কাব্য সংসার ও সমাজের কতটা কাজে লাগে, এ জিজ্ঞাসাও তেম্‌নি। কাব্যকে উপদেষ্টার পদে দাঁড় না করিয়ে যাঁরা তার মূল্য দেখ্‌তে পান না, 'দশরূপের' সাহসী লেখক তাঁদের বলেছেন, 'অল্পবুদ্ধি সাধুলোক'।

"আনন্দনিস্যন্দিসু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদি বদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাংমুখায়॥" (দশরূপ, ১।৬)।

'আনন্দনিস্যন্দী নাট্যের ফলও যাঁরা ইতিহাস প্রভৃতির মত সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি মাত্র বলেন, সেই সব অল্পবুদ্ধি সাধুদের নমস্কার। রসের আস্বাদ কি, তা' তাঁরা জানেন না।'

(৩)

আজকের দিনের মানুষের কাছে সমাজ-বন্ধন ও সমাজ-ব্যবস্থা খুব বড় হয়ে উঠেছে। এত বড়, যেন মনে হয়, মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও সব সৃষ্টির ঐ হচ্ছে চরম লক্ষ্য। যে সৃষ্টি ঐ বন্ধন ও ব্যবস্থার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনও কাজে লাগে না, তার যে কোনও মূল্য আছে, সে কথা ভাবা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়েছে। এ মনোভাব খুব প্রাচীন নয়। গত শ দেড়েক বছর হ'ল পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা কতকগুলি কলকৌশলকে আয়ত্ত করে' মানুষের নিত্য ঘরকন্না ও সমাজ-ব্যবস্থার যে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে—তাতেই এ মনোভাবের জন্ম। এর আশ্চর্য্য সফলতায় সমাজ ও জীবনযাত্রার কাম্য থেকে কাম্যতর পরিবর্ত্তনের এক অবাধ ও সীমাহীন আদর্শের ছবি মানুষের চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠেছে। লোকের ভরসা হয়েছে এই পরিবর্ত্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থা একদিন, এবং সেদিন খুব দূর নয়, সমস্ত মানুষকে দুঃখলেশহীন সকল রকম সুখ সৌভাগ্যের অধিকারী করে' দেবে। এবং সংসার ও সমাজ থেকে মানুষের প্রাপ্তির আশা যত বেড়েছে, মানুষের 'তন্ মন্ ধনের' উপর এদের দাবীও তত বেড়েছে। কবির রস-সৃষ্টির শক্তি এই সংসার ও সমাজের মঙ্গলে নিজেকে ব্যয় করেই সার্থক হয়, এ কথা আর অসঙ্গত মনে হয় না।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সাম্‌নে আশার এই মরীচিকা ছিল না। তখনকার জ্ঞানীলোকেরা জন্মজরামৃত্যুগ্রস্থ সংসারকে মোটের উপর দুঃখময় বলেই জান্‌তেন। একে মন্থন করে' যে দু এক পাত্র অমৃত উঠেছে, তার অমৃতত্ব যে আবার ঐ সংসারের মঙ্গলসাধনে—এ কথা তাঁরা মান্‌তে চান্‌নি। কাব্যের রসকে তাঁরা সংসার-বিষবৃক্ষের

অমৃতফল বলেই জান্‌তেন। আজ যদি আমরা সংসারকে দুঃখময় বল্‌তে মনে দুঃখ পাই, তবুও এ কথা কি করে অস্বীকার করা যায় যে গাছের ফলের কাজ তার মূলকে পরিপুষ্ট করা নয়। কাব্য মানুষের যে সভ্যতা-বৃক্ষের ফল, তার মূল মাটি থেকে রস টানে বলেই ও গাছ অবশ্য বেঁচে থাকে। এবং মূল যদি রস টানা বন্ধ করে, তবে ফল ধরাও নিশ্চয় বন্ধ হবে। কিন্তু নিতান্ত বুদ্ধি বিপর্য্যয় না ঘটলে, মূলের কাজে ফলের কতটা সহায়তা, তা দিয়ে তার দাম যাচাই-এর কথা কেউ মনে ভাবে না। সেই ফলই কেবল গাছের পুষ্টি-সাধন করে যা মুকুলেই ঝরে' যায়।

লৌকিক জীবনের উপর যে কাব্যরসের ফল নেই, তা নয়। কিন্তু সে ফল ঐ জীবনের পুষ্টিতে নয়, তা থেকে মানুষের মুক্তিতে। লৌকিক জীবনের লৌকিকত্বকে কাব্যরসের অলৌকিক ধারায় অভিসিঞ্চিত করে'।

অন্তর হ'তে আহরি বচন
আনন্দ লোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে!

* * * * *

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্যছায়,
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন্ করিয়া দিব!

সংসার মাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব !

"পুরস্কারের" কবির এই কবি-কথা আলঙ্কারিকদের মনের কথা।

কিন্তু কবি ত কেবল কাব্যস্রষ্টা নন্, তিনিও সামাজিক মানুষ। মানুষের যে সুখদুঃখ, আশানিরাশা, প্রণয়হিংসা তাঁর কাব্যের বিষয়— তাদের কেবল রসসৃষ্টির উপাদানরূপে দেখা, সব সময়ে তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয় না। কবির মধ্যে যে সামাজিক মানুষ আছে, সে মানুষের সামাজিকে ভালমন্দ, আশানিরাশার বিচার থেকে কাব্যকে একেবারে নিরপেক্ষ থাকৃতে দেয় না। রস-সৃষ্টির যেখানে চরম অভিব্যক্তি, সেখানে কবির এই সামাজিকতা ঢাকা পড়ে যায়, যেমন সেক্সপিয়রের নাটকে। যেখানে কবির সামাজিকতা প্রবল, কিন্তু রসসৃষ্টির প্রাচুর্য্যকে ব্যাহত করে না, সেখানে ঐ সামাজিকতাকে একটা উপরিপাওনা হিসাবে গণ্য করা চলে, যেমন টলস্টয়ের 'বিগ্রহ ও শান্তি'। যেখানে উৎকট সামাজিকতাকে রস-সৃষ্টির শক্তি সংবরণ করে' রাখ্‌তে পারে না, সেখানে তা রসের প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন করে' কাব্যত্বের লাঘব ঘটায়, যেমন রম্যাঁ রলাঁর 'জ্যাঁ ক্রিস্‌তফ্‌'।

(৪)

কাব্যের কাজ যে সত্যকে সুন্দরের মূর্ত্তি দেওয়া—এটা উনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার। এবং ঐ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির একটা গৌণফল। বিজ্ঞান তখন নানাদিকে সে সব বিচিত্র সত্যের আবিষ্কার করেছে, ও তার কতকগুলিকে ঘরকন্নার কাজে লাগিয়ে

জীবনযাত্রার যে নূতন ভঙ্গী দিয়েছে—তাতে সত্য ও সত্যানুসন্ধানের উপর মানুষের অসীম শ্রদ্ধা জন্মেছে। সত্যের এই 'প্রেষ্টিজ' দিয়ে সকল রকম মানসিক সৃষ্টির 'প্রেষ্টিজ' বাড়ানের ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক। এবং ঐ ইচ্ছা কাব্যরসিকদের মগ্ন—সুতরাং মূল-চৈতন্যের মধ্যে কাজ করে' এই মতটির সৃষ্টি করেছে। কবি কীট্‌স্ সত্য ও সুন্দরের যে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে এই বৈজ্ঞানিকযুগের কবি-প্রতিনিধি হিসাবে। নইলে শুদ্ধ কবির চোখ থেকে এ সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না যে সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের উপাদান। বস্তু-নিরপেক্ষ রস নেই, এবং বস্তুকে সত্য দৃষ্টিতে দেখার উপর রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। রস ও সত্যের এই সত্য-সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে, বৈজ্ঞানিক মায়ায়। কবি রসের ছলে উপদেশ দেন—এ কথা যেমন অযথার্থ, কাব্য রসের সাজে সত্যকে প্রকাশ করে,—এও তেম্‌নি অসত্য। শিল্পী তার মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে পাথরকে প্রকাশ করে এ কথা কেউ বলে না। কিন্তু কবি কাব্যের মধ্য দিয়ে সত্যের বিকাশ করেন, এ কথা যে কাব্যরসিকেও বলে—তার কারণ এই বৈজ্ঞানিক যুগে 'সত্যের' 'আইডিয়াকে' ঘিরে মানুষের মনে 'ভাবের' সৃষ্টি হয়েছে। এবং এই 'ভাবকেই' রসমূর্ত্তি দিয়ে অনেক কবি কাব্য-রচনা করেছেন। এ ভাব ও রস নূতন। এবং নূতনের প্রথম আবির্ভাবে তাকে মন-জুড়ে বস্‌তে দেওয়া মানুষের স্বাভাবিক মনোধর্ম্ম।

(৫)

যুগে যুগে মানুষের মনে এই যে সব নূতন ভাবসৃষ্টি, কবিরা তাঁদের কাব্যে সেই সব যুগ-ভাবকে রসে রূপান্তর করেন। মানব-

মনের যেগুলি চিরন্তন 'স্থায়ীভাব', সকল যুগের কাব্যের তারাই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু যে সব 'সঞ্চারী' কাব্যের রসকে গাঢ় করে, মানুষের বিচিত্র জীবনপ্রবাহ তাদের নব নব সৃষ্টি করে' চলেছে। যুগে যুগে যে সব 'সঞ্চারীভাব' জন্মলাভ করে, প্রতি যুগের কাব্য-রসিকের মন তাদের রসমূর্ত্তির জন্য উন্মুখ থাকে। যে কবির কাব্যে এই নবীন ভাব নূতন রসে পরিণত হয়, তিনিই সে যুগের 'আধুনিক' কবি। পুরাতন রসও এই নূতন অনুপানে নবত্ব লাভ করে।

কাব্যের বাণী তাতেই প্রাচীন হয়েও পুরাতন হয় না। যুগের পর যুগ রসের নূতন সৃষ্টি চল্‌তে থাকে।

"অতোহন্যতমেনাপি প্রকারেণ বিভূষিতা।
বাণী নবত্বমায়াতি পূর্ব্বার্থান্বয়বত্যপি॥" (ধ্বন্যালোক, ৪।২।)

'পূর্ব্বতন কবিদের প্রাচীন বাণীও নূতন ভঙ্গীমার আভরণে নবীনত্ব লাভ করে।' জীবন যে সব নূতন 'ভাবের' জন্ম দিচ্ছে, তাদের রসের মূর্ত্তি গড়ার শিল্পীর যদি অভাব না হয়, তবে নূতন কাব্য-সৃষ্টিরও বিরামের আশঙ্কা নেই।

"ন কাব্যার্থ বিরামোঽস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ।"
(ধ্বন্যালোক, ৪।৬।)

কারণ,—

"বাচস্পতি সহস্রাণাং সহস্রৈরপি যত্নতঃ।
নিবদ্ধাপি ক্ষয়ং নৈতি প্রকৃতির্জগতামিব॥"
(ধ্বন্যালোক, ৪।১০)।

'যেমন জগৎ-প্রকৃতি কল্প কল্পান্তর বিচিত্র বস্তুপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করে' চলেছে, তবুও তার নূতন সৃষ্টির শেষ নেই, তেমনি সহস্র সহস্র বাণী-

সম্রাট কবির রস-সৃষ্টিতেও রসের নূতন সৃষ্টি শেষ হয় না, কেননা মানব মনের 'ভাবের' সৃষ্টির শেষ নেই।'

কিন্তু জীবন যেমন নূতন 'সঞ্চারী ভাবের' সৃষ্টি করে, পুরাতন 'সঞ্চারী ভাবের' তেমন ধ্বংশও করে। যে সব ভাব মনের মৌলিক উপাদান নয়, জটিল যৌগিক সৃষ্টি—জীবনের বিশেষ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাদের জন্ম হয়, এবং তার পরিবর্ত্তনে এদের বিলোপ ঘটে। এরা হচ্ছে মনের 'আন্‌ষ্টেবল্ কম্‌পাউণ্ড'। সেইজন্য প্রাচীন কবিদের কাব্যের অনেক অংশ আমাদের মনের রসের তারে ঠিক তেমন ঘা দেয় না, যা তা প্রাচীনদের মনে নিশ্চয় দিত। যে ভাবের উপর সে রসের প্রতিষ্ঠা ছিল, আমাদের মন থেকে সে ভাব একবারে লোপ না হ'লেও ঠিক তেমন্‌টি নেই। এ কথা কি অস্বীকার করা চলে যে, মধ্যযুগের খৃষ্টান কাব্য-রসিক দান্তের 'ডিভাইন কমিডিতে' যে রস পেতেন, এ যুগের খৃষ্টান অখৃষ্টান কোনও কাব্য-রসিক ঠিক সে রস পান না! ও কাব্যে যেটুকু 'স্থায়ীভাবের' রসে রূপান্তরমাত্র সেইটুকুর আস্বাদই আমরা পাই। ওর যে 'সঞ্চারীর' আস্বাদ মধ্যযুগের কাব্য-পাঠকেরা পেতো, তা থেকে আমরা বঞ্চিত।

যেমন প্রাচীন যুগের অনেক কাব্য আমাদের মনে আর রস জাগায় না, তেমনি আমাদের নবীন যুগের অনেক কাব্যও আমাদের যে রস দেয়, ভবিষ্যবংশীয়েরা তা থেকে ঠিক সে রস পাবে না। কারণ তাদের ভাব-জগৎ ঠিক আমাদের ভাব-জগৎ থাক্‌বে না। একটা চরম দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্।

মনে হ'লো এ পাখার বাণী
দিলো আনি'

শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

পর্ব্বত চাহিলো হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

* * * * * *

শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

এই অদ্ভুত কাব্য আধুনিক কাব্য-রসিকের চিত্তের প্রতি অণুকে যে রসের আবেশে আবিষ্ট করে, তার একটা প্রধান উপাদান—'গতি' ও 'বেগ' এ যুগের লোকের মনে যে 'ভাবের' আবেগের সৃষ্টি করেছে। "অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা" যে আজ কবিকে "উতলা" করেছে—তার মূলে আছে এ যুগের মানুষের মনে বিশ্ব-প্রকৃতির

একটা বিশেষ রূপ-কল্পনা। এ ভাব ও কল্পনা যে মানুষের মনে চিরস্থায়ী হবে, তা মনে করার কারণ নেই। বিশ্ব-প্রকৃতিকে আজ মানুষ যে চোখে দেখ্‌ছে, সে দেখার যখন বদল হবে, তখন এ ভাব ও কল্পনারও বদল হবে। 'বলাকার' "ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত" পাখার ধ্বনিতে আমাদের চিত্তে যে রসের-বিস্ময় জাগ্‌ছে, সে দিনের কাব্য-রসিকেরা তার অর্দ্ধেকেরও আস্বাদ জান্‌বে না। আমাদের অনাস্বাদিত কোন কাব্য-রসের আস্বাদ তারা পাবে, তা নিয়ে তাদের হিংসা করবো না। এ কাব্যের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতি তাদের পূরণ হবে কিনা কে জানে!

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

একখানি পত্র।

Berlin, 11th Jan. 1927.

—০:*:০—

*   *   *   *   *   *   *

চায়নার খবর কিছু কিছু পৌঁছচ্ছে, তাই নিয়ে য়ুরোপে সর্ব্বত্রই যথেষ্ট উত্তেজনা। এখানে সকলেই দো-মনা, কারুর মন পশ্চিম-মুখো ইংলণ্ডের দিকে, আর কেউ বা পূব-দিকে। আপনি চলে যাবার পরে Greece, Servia, আর Hungary-তে কিছুদিন থাকায় এদের অবস্থাটি আরো বুঝ্‌তে পারছি। Industrialism, Competition, Nationalism-এর বিপদ ক্রমেই এরা বুঝতে পারচে, কিন্তু কি করবে তা জানেনা। রাশিয়ায় যে কাণ্ডটা ঘটে গেলো তাতে সকলেই ভয় পেয়েচে। সব দেশেই একদল তাই এখন Fascism-এর পক্ষপাতী। তাদের বিশ্বাস, ঐ রকম জবরদস্ত শাসন ছাড়া বলসেভিসম্‌কে হটানো অসম্ভব। আর একদলের মত যে, যত ভয়ানকই হোক্ কমিয়ুনিসম্ ছাড়া উপায় নেই—Red Terror সত্ত্বেও তারা Revoluti n চায়। এদের সংখ্যা অবশ্য কম, কিন্তু Economic Condition এই রকম খারাপ চল্‌লে এদের সংখ্যাই বাড়বে। মাঝা

---

* বার্লিন সহর হতে শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখেন। তার কতক অংশ সবুজ পত্রে প্রকাশ করলুম এই কারণে যে, ইউরোপের লোকের বর্ত্তমান মনোভাবের পরিচয় এতে কতকটা পাওয়া যায়।

মাঝি যারা রয়েছে—বেশির ভাগ Intellectuals, আর Professional men—তারা সকলেই দেখচি খুব Perplexed, Industrialism আর Capitalism-এর evils তারা খুবই বুঝতে পারচে, অথচ Red Terror জিনিষটাকেও ঠিক বরদাস্ত করতে পারচে না। Communism-এর মতামত সম্বন্ধে এদের যে বেশি আপত্তি আছে তা' নয়। Industrial organisation রাখ্‌তে হলে (অর্থাৎ machinery-কে পরিত্যাগ না কর্‌লে—এবং অনেকেরই মত যে machines বাদ দিয়ে চরকার যুগে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন Einstein সেদিন বলছিলেন, যে চরকা দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত সুতো তৈরী হবে এ আমি সম্ভবপর মনে করিনে এবং সম্ভবপর হলেও তা ভালো বলে স্বীকার কর্‌তে পারিনে) কোনো না কোনো রকম Communal ownership দরকার, তা' এরা সকলেই বুঝতে পারচে—কোনো লোকের পক্ষে অসম্ভব ধনী হ'য়ে ওঠা ভালো নয় তাও মানচে। (জার্ম্মানিতে ভালো অবস্থার লোকদের এখন ৬০% tax দিতে হচ্ছে। যাদের আয় বেশি, তাদের তুলনায় আরো বেশি। কাজেই কারুর পক্ষেই খুব ধনী হবার উপায় এক রকম বন্ধ হ'য়ে গেচে)—Inheritance সম্বন্ধেও লোকের মত বদ্‌লিয়ে আসচে আর বিবাহের আইনকে সহজ ক'রে ফেলা (যা' নিয়ে ইংলণ্ডে সবচেয়ে হৈচৈ হয়েছে) সম্বন্ধে এদিককার লোকদের কোনো বাধা নেই—শুধু বল্‌সেভিসমের জবরদস্তিটাকে এরা ভয় পায়। রক্তারক্তি না ক'রে যদি আজ Communism প্রতিষ্ঠা হতে পারতো, তাহলে বোধহয় অনেক লোক তাতে খুসী হতো। Non-violence-এর আইডিয়াটা যে এদের দেশে এত appeal করেছিলো—তার একটা কারণ বোধহয়

এই। আমূল পরিবর্ত্তন, তাকে revolution বল্‌লেও দোষ হয় না—লোকে চাচ্ছে, কিন্তু নিরুপদ্রব পন্থায়। লড়াইয়ের re-action-এ এটা হোলো প্রথম অবস্থা। Great War-এ যুদ্ধের চেহারা সকলের কাছেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিলো, Verdun, Ypres-এর যুদ্ধ ক্ষেত্রেই হোক্ কিংবা রাশিয়ার Red Terrorism-এর মধ্যে হোক্— তাই নিরুপদ্রব উপায়ের দিকে সকলের মন পড়েছিলো। কিন্তু এটা একটা re-action-এর অবস্থা। আমার মনে হয়, যে আরো বড়ো একটা movement-এর এটা অঙ্গ। য়ুরোপে Darwin-এর Evolution Theory-এর এক-তরফা ব্যাখ্যাই প্রসিদ্ধিলাভ করেছে, Struggle for existence-এর মধ্যে Struggle-এর দিকটাই এদের রাজনীতি, বাণিজ্য-রীতিকে বেশি influence করেছিলো— Tolstoy তার re-action, মহাত্মাজিও তাই। মহাত্মাজি প্রথম বয়সে য়ুরোপে luxury, industrialism-এর আতিশয্য এইসবের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন, ওঁর শিক্ষা-জীবনের atmosphere-টা ছিলো পুরোপুরি European, তাই যখন এদিক থেকে ওঁর মন স'রে গেলো, তখন Tolstoy-এর মত উনিও philosophy of struggle এবং industrialism এর re-action-এর দিকেই ঝুঁক্‌লেন। Tolstoy-এর সঙ্গে ওঁর যে সাদৃশ্য তার ভিতরকার কারণ এই— ছু'জনেই য়ুরোপে ভোগের হাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন, পরে একেবারে উল্‌টো দিকে ঝুঁকে পড়েন। Tolstoy-এর মত কারুর কারুর মনে এই বিতৃষ্ণা আগেই এসেছিলো, কিন্তু বেশিরভাগ লোকের মধ্যেই এটা ঘটে Great War-এর মধ্যে বা পরে। বল্‌সেভিসম্ হঠাৎ একদিনে রক্তারক্তি ক'রে যা করতে চায়, অনেকে নিরুপদ্রব

revolution দিয়ে তাই পেতে চান, কিন্তু দুটোই হঠাৎ পাওয়া (৩ মাসে স্বরাজ-পাওয়ার জন্য তাগিদের মধ্যে, ৩ মাসটা তাই মোটেই অবান্তর কথা নয়), স্থায়ী ফল-লাভ হয় কিনা সন্দেহ। অথচ Communist-রা বলে যে reformist-এর দল আস্তে আস্তে Capitalism-এর সঙ্গে Compromise করে Communism আন্‌তে চেয়ে তা' কখন পারেনা, সেটা পাগলামি, সে কথাটাও একেবারে ভুল মনে হয় না।

বড়ো সর্দ্দার, মেজো সর্দ্দার, ছোটো সর্দ্দার, সর্দ্দারের দল সব বজায় থাক্‌বে, অথচ মানুষের মন সর্দ্দার হবার দিকে ঝুঁক্‌বে না এও একটা অসম্ভব কথা। তা'হলে উপায় কি? Europe আস্‌বার আগে ভাবতুম যে, হয়তো agricultural civilisation-এ একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু East Europe-এর অবস্থা দেখে আর রাশিয়ার কথা শুনে তা'তে সন্দেহ হ'চ্ছে। রাশিয়াতে শুন্‌চি Communism-এর প্রধান সমস্যা, যে কী ক'রে agriculture-কে industrialise করা যায়, অর্থাৎ টুক্‌রো টুক্‌রো আলাদা আলাদা জমি চাষ না ক'রে, কী করে একসঙ্গে বড়ো বড়ো ক্ষেতের কাজ চালান সম্ভবপর হয়। আমাদের দেশেরও তো ঐ এক সমস্যা। large scale production-এ যে অনেক সুবিধা আছে, তা'তো অস্বীকার করতে পারি নে। Servia-তে দেখলুম—আইন পাশ হয়েছে যে ২০০ একটা-কিছুর বেশি জমি থাক্‌বে না। অনেক গরীব প্রজা জমি পেয়েছে—৪০।৫০।৬০, কিন্তু তাদের হাতে এমন পয়সা নেই যে, agricultural machinery কিন্‌তে পারে বা ব্যবহার করতে পারে। চাষীকে জমি দিলেই হবে না, তা'তে জমি এতো টুক্‌রো হয়ে

যাবে যে দেশের ক্ষতি। একসঙ্গে অনেকখানি জমি চাষ করতে হ'লেই industrial organisation এসে পড়তে বাধ্য। চাষের কাজেও Cottage industry চলা এখন শক্ত হ'য়ে প'ড়েছে। অথচ জমি যদি সকলের একসঙ্গেই চাষ হ'তে থাকে, তবে নিজের "দুই-বিঘা জমির" Psychology বদ্‌লে যেতে বাধ্য। কাজেই কোনো না কোনোরকম Communal property-র ভাব এসে পড়বেই। manufacture-এ যেমন large scale production না হ'লে চল্‌ছে না, agriculture production-এও ঠিক তাই—তা'হলে industrial-এর বদলে agricultural সমাজ গ'ড়ে সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব। কল-কারখানা বা যন্ত্র বাদ দিতে যখন পারছি নে, (মহাত্মাজি বা Tolstoy-এর আইডিয়া টিঁক্‌বে না—ফিরে যাওয়া অসম্ভব) তখন কী ক'রে যন্ত্র মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আসে তাই দেখ্‌তে হবে। Communist-দের মধ্যে একদল বলছে যে এটা সম্ভবপর, যদি exploitation না থাকে, অর্থাৎ একদল মানুষকে আর একদল লোক যদি যন্ত্রের সামিল ক'রে তোলবার সুযোগ না পায়, তবে বড় বড় factory-র মধ্যেও মানুষ আনন্দ পাবে—কারিগর যেমন হাতের কল চালিয়ে আনন্দ পায়, ঠিক তেম্‌নি। এইটেই ভাব্‌বার কথা। এখানকার Zeus optical works-এ এর সূত্রপাত হ'য়েছে, শুনছি বেশির ভাগ share এখন workers-দের—এক হিসেবে একটা co-operative production বলা যেতে পারে, যদিও পুরাণো capital-এর উপর share scrift ইত্যাদি হিসেবেই চ'ল্‌বে। আপনি যে কথাটা বারবার বলেছেন co-operation শুধু industry-তে নয়, জমি সম্বন্ধেও সেটা চলে কিনা দেখা দরকার।

এই দিক দিয়ে একটা পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। Commu-sism-এর ultimate ideals ভালো হলেও Red Terror জিনিষটা যে ভয়ানক, তাতে সন্দেহ নেই। চীনে যা ঘটেছে বা ঘটছে, ভারত-বর্ষেও তাই ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, পোলিটিক্যাল discon-tent-এর সঙ্গে সঙ্গে economic unrest জুটে আমাদের দেশের জন-সাধারণের মন কম্যুনিস্‌মের দিকে ঝুঁকতে পারে, অথচ তাতে রক্তারক্তি ছাড়াও cultural life অন্ততো অনেক দিনের মত চাপা পড়বে।

কল-কারখানা-জমি সর্ব্বত্র co-operative organisation দিয়ে যদি একটা পথ পাওয়া যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে limitation of popu-lation। এবার এদেশে যত লোকের সঙ্গে কথা বলেছি, সকলেই এ বিষয়ে একমত। Einstein-এর মত এই যে, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সমস্যা—Over-population এবং Voluntary limitation of population; প্রত্যেক দেশের পক্ষে এ ছাড়া উপায় নেই। লোকে গালাগালি দিলেও এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে actively কাজ করা দরকার।

* * * * * * *